ময়ূরী এবং ময়ূরী

আবুল বাশার

ও যখন চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে যেত সে চিৎ হয়েই পোকার মতো ঘুরত ; দুর্বল পা টেনে টেনে হিঁচড়ে ঘোরাত নিজেকে। পোকা যেমন চিৎ হলে আর উপুড় বা কাত হতে পারে না, সে-ও পারত না। ক্রমাগত সে ঘুরছে, কিছুতেই সে তার ভঙ্গি বদলাতে পারছে না। একবার উপুড় বা কাত হতে চায় এবং উঠে দাঁড়াতে চায়।...

ওদের বাড়ি থেকে আমি রাগ করেই চলে এসেছিলাম। কিন্তু ভরতপুর আর পৌঁছনো হল না। ভয়ংকর উত্তাল জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ডুকরে কেঁদে উঠতে গিয়ে দেখি গলা দিয়ে কোনও শব্দ বার হচ্ছে না। বুকের উপর পাথর চেপে বসলে বোধহয় এই রকম কান্নারও সাহস থাকে না। অদৃশ্য পাথর, কিন্তু তার ভার ছোট বুকখানির পক্ষে ভয়ানক গুরুভার। এই কষ্টের ভাষা বইতেও লেখা নেই।

ঘাটের কাছে বসে শুধু একটি কথাই মনে হচ্ছিল, এ সংসারে আমার চেয়ে হতভাগ্য সত্যিই কেউ নেই। আমি কেন বেঁচে আছি, বেঁচে থাকার অর্থই বা কী হতে পারে। রাতারাতি সবই তো শেষ হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ মুছে গেছে আমার সর্বস্ব। পদ্মার আর এক নাম কীর্তিনাশা নাকি। নদী আমার সব কেড়ে নিয়েছে। মা বাবা ভাই বোন সব। এক রাতে সমস্ত গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

গ্রামটির নাম ভরতপুর। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার একটি অতি দরিদ্র গ্রাম। মেয়েরা বিড়ি বাঁধত আর লোকেরা জন খাটত। ১৯৭৮ সালের ঘটনা। খবরের কাগজে ছোট করে এই ভয়াবহ দুঃসংবাদ ছাপা হয়েছিল। পরে জেনেছি। আমি ঘাটে পৌঁছে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না আমার আর কেউ রইল না, কিছুই রইল না। আমার গ্রামটিকে আমি আর এ জীবনে একবারও দেখতে পাব না।

সব ক্ষতিই কি মেনে নেওয়া যায়। ক্ষতি মেনে নিলেও স্মৃতি কি মেনে নিতে পারি। স্মৃতি যে আমাকে আজীবন জ্বালাবে। সবাই বলবে, গ্রামটি নেই, আমি বলব আছে। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষ বলবে, মুছে শেষ হয়ে গেছে, আমি বলব সমস্তই অক্ষয়, সবই দৃশ্যমান—ওই তো আমার গ্রাম। কত মানুষের মুখ যে অবিকল উঠে আসছে এখন। ওরা আমাকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরবে, তামাম জীবন কথা বলবে কানে কানে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আমি আমার গ্রামের হুবহু সব দৃশ্য, সব পথঘাট, গাছপালা, মন্দির, মসজিদ, ডিহি, সব দালানকোঠা, বাড়ি দেখতে পাব। জেগে বসে থাকলেও দেখতে পাব।

এই স্মৃতির ভার কীভাবে বহন করব আমি। এর তাড়না কী ক'রে সহ্য করব।

নিজেকেই আর বহন করতে পারছি না। ঘাটে বসে থেকেই বা কী করব! পায়ে হেঁটে সড়কে এসে গাছতলায় বসে থাকি। অনেক লোক হেঁটে চলেছে বাজারের দিকে। আমিও এগিয়ে যাই। যাদের দেখছি, এরা কেউ আমার গাঁয়ের লোক নয়। আমারই মতো কেউ কোন হতভাগ্য কি বেঁচে নেই কোথাও? সে-ও কি আমারই মতো গাঁয়ে ফিরতে চেয়েছিল, পারল না। তেমন একজন মানুষকে মনে মনে খুঁজি।

পিছনে পড়ে রইল ভয়ংকরী পদ্মা, সর্বগ্রাসী মৃত্যু। একবার মনে হয়েছিল ওই স্রোতে ঝাঁপ দিই, শেষ করে দিই তুচ্ছ এই জীবনটাকে। সম্পূর্ণ একা, আত্মীয় পরিজনহীন, মা নেই, বাবা নেই, ভাইবোন নেই, পাড়ার মানুষরা নেই, বন্ধু নেই, এত একা—এই পৃথিবী এতই অচেনা হয়ে গেল রাতারাতি। ওই পদ্মা আমাকে একটুও চিনতে পারল না।

আমি কখনও ওই সর্বনাশীকে ক্ষমা করব না, কখনও ওর মুখ দেখব না। ছেলেবেলা থেকে, জন্মের পর থেকেই ওই নদীকে দেখে আসছি, কখনও কি মনে হয়েছিল ও এত নিষ্ঠুর, এতই ভয়ংকরী, ও কি জানে, সত্যিই ও আমার কী করেছে। মানুষ ঘুমিয়ে ছিল, বুঝতেও পারেনি। বিরাট বিরাট স্তম্ভের মতো জল তেড়ে এল গ্রামের দিকে, স্ফীত উচ্চ ভয়ংকর জলস্তম্ভগুলি থাবা বাড়িয়ে রাক্ষুসীর মতো পেটে ভরে নিল ঘুমন্ত মানুষজন, পশুপাখি, বাড়িঘরদোর, সাজানো সংসার, শিশুকে, মাকে। মা আর শিশু কীভাবে ঘুমিয়ে ছিল তখন। স্তন্য পান করতে করতে শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে স্তন্য দান করতে করতে, কী ভাল সেই ছবিখানি। ভরতপুরের সেই মা, ভরতপুরের সেই শিশু কখনও আর এই পৃথিবীতে আসবে না।

পা চলছে না আমার, তবু হেঁটে চলেছি ; নদীর গর্জন আর সইতে পারছি না। রাক্ষুসীর ডাক আর সহ্য হয় না, ওর উচ্ছলতা, ওর নৃত্য আর দেখতে পারি না দু' চোখে।

রাগ করে চলে এসেছিলাম ওদের ওখান থেকে, আবার কি সেখানেই ফিরে যেতে হবে। রাগ করে আসা নাকি অপমানিত হয়ে আসা, ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি আমি নিজেই চলে এসেছি ঠিক বলতে পারি না। রাগ, অপমান এবং তাড়ানো আর চলে আসা সবই ছিল সেই ঘটনায়। আর এমনই ঘটনা যে, নিজেকেই শোনাতে ভাল লাগে না।

বাজারে এসে শ্রীকণ্ঠ দাসের চাঁচের বেড়ার হোটেলের সামনে দাঁড়াই। খোপরার চাল, উনুনের ধোঁয়ায় কালো। ঝাঁপ ওঠেনি। তা হলে শ্রীকণ্ঠ কি আর নেই ? হোটেল কথাটি দোরের কপাটে ছোট টিনের পাতে অতি ক্ষুদ্র করে লেখা। কিন্তু বাইরে বড় টিনের একটা বিজ্ঞাপন আছে, মাটির উপর কাঠের কাঠামোয় বসানো। 'ভাত আছে'।

অদ্ভুত কথা। শ্রীকণ্ঠ দাস ভরতপুরের একমাত্র ব্যাপারি, যার হল ভাতের ব্যবসা। মানুষকে এতবড় আশ্বাস আর কে দিতে পারে। হাটমারা লোকেরা তার ওখানেই খায়। আশ্বাস রইল, কিন্তু মানুষটা রইল না। গরিব দেশে মানুষ 'হোটেল' কথাটি লেখার চেয়ে 'ভাত আছে' কথাটি লোককে জানানো অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

আমার খিদে পেয়েছে, তা ছাড়া আমি কাঁদতে পারছি না। না কেঁদে উঠতে পারলে আমি যে পাগল হয়ে যাব। মনে হচ্ছে, ভাত খেয়ে দেহে বল এলে আমার চোখের পাতা আপনা থেকে ভিজে উঠবে। দৃশ্যটি আমি কল্পনা করতে পারি, ভাতের রসে পেট ভর্তি হয়ে আসা মাত্র চোখে জল এসে গেল। কাকে বোঝাব সেকথা যে, আমি এখন কাঁদতেও পারি না।

শ্রীকণ্ঠ ছিল একমাত্র ব্যবসায়ী এই বাজারের মহল্লায়, যার ছিল ভরতপুরে বাড়ি। ভরতপুরের লোক খাটনে লোক, ব্যবসাপাতি বোঝে না, মূলধনও নাই কারও। কিছু কারিগর, ছুতার মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ঘরামি আর চাষবাসের নিড়ানখুটান করা লোক। এরা কেউ ব্যবসা করার কথা ভাবতেই পারে না। কেবল শ্রীকণ্ঠ এখানে এসে ভাতের ব্যবসা খুলেছিল। 'ভাত আছে' কথাটি ওরই আবিষ্কার।

আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব এখানে। বাজারে মানুষজনও খুব অল্প। গাছপালার ছায়াগুলি শোকের ভারে অতি সামান্য নড়ে ওঠে।

হোটেলের কাছে অত্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে একটি কালো কুকুর কী সব শুঁকতে শুঁকতে যাচ্ছে। হোটেলের পাশের চায়ের দোকানটাও বন্ধ। আধভাঙা বেঞ্চিতে কে একটা লোক বসে আছে। মাথায় সাদা ফেত্তা মতন কি একটা জড়ানো, সন্ন্যাসী গোছের লোক। মুখে কালো কুচকুচে গোঁফদাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে পিছন থেকে। লোকটা স্থির হয়ে বসে আছে। আমি এক পা দু' পা করে চলে আসি তার কাছে।

লোকটির কপালে সিঁদুরের তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, একে আমি চিনি। শিবু 'বৈষ্ণব'। বাউল, ফকিরদের আস্তানায় একে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। মাধুকরী করে না, ও ঘরামি। ওর ছেলের একটা ছোট ডিঙি আছে, নহরে খেয়া পারাপার করত। সেই নহরও পদ্মার থাবায় হারিয়ে গেছে। মূল পদ্মা থেকে একটি স্রোত ভেঙে এসে ফসলের মাঠের দিকে বয়ে গেছিল, চাষীরা সেটা পেরিয়ে ওপারে আবাদ করতে যেত। এই নহরে ডিঙিটা ছিল। ফসল উঠলে শিবু বাৎসরিক 'তোলা' নিতে বার হত এদিক ওদিক। প্রত্যহের পারানি চায় না সে, ষাণ্মাষিক বা বাৎসরিক গেরস্ত যা 'হাততোলা' দেবে তাইতেই শিবু সন্তুষ্ট। নিজে গৃহী বাউল, খুব সরল তার জীবন। ভরতপুর একটি সরল গ্রাম। সহজ তার জীবনধারা। পৃথিবীর শত উন্নতির সঙ্গে এই গ্রামের কোনও দূর বা নিকট সম্পর্ক ছিল না। সম্পর্ক ছিল পদ্মার। সেই ভয়ংকরী তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিল পৃথিবী থেকে।

শিবুর চোখে মুখে ঘাম, চোখের নীচের পাতায় একটা ফোঁটা চোখের তলে। গর্তে বসে আছে শিশিরের মতো।

একটুখানি চোখ তুলে সে আমার দিকে চাইল, অত্যন্ত নিরাসক্ত সেই দৃষ্টি। বৈষ্ণব আমাকে চিনতে পারল না। চেষ্টাও করল না।

—কাকা।

—ক্যা।

আসলে 'কে' বলাটাই বুঝি ও রকম। ও ওইটুকু উচ্চারণ করেই চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঝাঁপের খুঁটিতে, যার মাথায় চালা মতন থাকে দোকানের সামনে, টিনের চাতালের ঠেকনো খুঁটিতে মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকল লোকটি। গ্রামের মানুষ তবু আমায় চিনতে চাইছে না কেন। এই মানুষটি কি আমারই মতন একা? কোথা থেকে আসছে এই অপরাহ্নে? ও বোধহয় কথা বলতে চায় না?

—শিবুকাকা।

—উম্।

—আমি রঞ্জন। আমি এসেছিলাম। হামরাকো দেকবা না কাকা।

—নাই। নাই। কিচ্ছু নাই। কে খাবে, কে পরবে, কিসের কী। সব ফাঁকি, সব ফক্কা। মিচ্ছা। স-অ-অ-ব মিচ্ছাকথা। জীবন একডা মিচ্ছাকথা।

কাপড়ের ব্যাগে আনাজপাতি মুখ বাঁধা অবস্থায় কোলে বসিয়ে রেখেছে শিবুকাকা। 'হাতভোলা' জিনিস। চলতি মুর্শিদাবাদী ভাষায় যাকে পাঁজা বলে। ব্যাগের মুখটা ফেঁসে পাকিয়ে নরম করে বেঁধে নিয়েছিল কাকা। আর তার গাঁয়ে ফেরা হল না। কাকা চোখ খুলল না। ধপ্ করে ব্যাগটা কোল থেকে মাটিতে পড়ে গেল, একটা ধাক্কা খেয়ে খুঁটিটা সরে গেল, একদিকে কাৎ হয়ে গেল টিনের চালা, বেঞ্চি থেকে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

তার আগে বাড়ির সকলের নাম ধরে ধরে ডেকে উঠেছিল শিবু বৈষ্ণব। ওর গলা শুকিয়ে উঠেছিল।

—বউ?

—খোকা?

—মা?

পরপর। ওরও চোখের পাতায় ভেসে উঠেছিল তার সুখের সংসার, তার একটা গাইগরু ছিল।

—ধবলি?

তার নামটাও উচ্চারণ করেছিল মানুষটা। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর কাকার হাত-পা সটান হয়, শক্ত হয়ে স্থির হয়, কেঁপে উঠে থেমে যায়। আমারই চোখের উপর মরে যায় শিবু বৈষ্ণব। হঠাৎ ওর হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। 'জীবন একডা মিচ্ছাকথা'—শুধু এই ভাবনা ওকে মেরে ফেলে দিল।

আমি তবে বাঁচব কী করে ময়ূরী? তোমারই জন্যে আমি তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। তোমাকে বলেও আসেনি। তুমি জানতেও পারনি, আমি চুপচাপ চলে এসে ভরতপুর পৌঁছতে চেয়েছিলাম। আমার শুধুই মাকে মনে পড়ছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এল। শোকের গাঢ় ছায়া ঘিরে ধরল আমাকে। পাকা সড়ক দিয়ে গাড়িঘোড়া, বাসলরি লাল বিন্দুর আলো জ্বেলে চলেছে, চলেছে উধাও দিগন্তের দিকে। গোল একটা রক্তমাখা চাঁদ উঠছে পুবপারে, কালো গাছপালার গ্রামরেখা ঠেলে।

আমি আর কিছুতেই সইতে পারছিলাম না। জীবনটাকেই এখন আমার কেমন ভয় করছিল। ভয় করত না, যদি না শিবুকাকা অমন করে বলত। কী আশ্চর্যজনক, কী বিচিত্র, কী সকরুণ তার মরে যাওয়া। কাকা আমাকে চিনতেও চায়নি। ওর কোল থেকে পড়ে গিয়ে ব্যাগের নরম বাঁধন ছিঁড়ে যায়। সব খাবার মাটিতে পড়ে যায় না বটে, কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে অনেক। চাল আর সবজি। —কী করব এখন ? কোথায় যাব ?

মা আমাকে ময়ূরীদের বাড়ি রেখে এসেছিল বেশ ছেলেবেলায়। আমি ওদের কাজের ছেলে।

মা বলেছিল—অঙন আমার ভারী কাজের ছেলে। ওর ঘেন্নাপেত্ত কম। যা করাবেন তাই করবে। একটু শিখিয়ে পড়িয়ে লেবেন, দেকবেন সব করে দেবে। আপনার রোগা মেয়েকেও দেখবে, ফায়ফরমাশ খাটবে, কাচার কাজও দিবেন, করে দেবে। তবে ওর নেকাপড়ার নেশা, এট্টু দেকবেন দিদি।

—নিশ্চয় দেখব। আমার মেয়েকে যে দেখবে, আমি তাকে মায়ের মতো করে দেখব। তুমি ভেবো না হরিমতী। আয় অঙন কাছে আয়।

বললাম—আমি রঙ্গন। অঙন নই। মা 'র'-কে 'অ'- করে বলে। মুখে আসে না। অঙ্গন বলতেও বাধে।

—তোর তো আসে বেশ।

—আসবে না ? আমি সিক্সে পড়ি।

—ঠিক আছে, আমি তোকে পড়াব। সব করব তোর জন্যে। তুই থাকবি তো আমার কাছে।

—তুমি রাখলেই আমি থাকব মা।

—রাখতেই তো চাই রে। এত ভালবাসি, তবু তো পালায়। বুঝি, ভালবাসাই সব নয়, অবিশ্যি পয়সাও তোকে দেব আমি। মা বলে ডেকেছিস, দরদাম করব না। পয়সা দিয়ে তো ভালবাসা কেনা যায় না বাছা। আয়।

আয় বলে অত্যন্ত কাছে নিবিড় করে টেনে নিয়েছিলেন দেবপ্রিয়া, মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে পাশে চৌপায়ার উপর পড়ে থাকা চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন—তুমি দেখতেও সুন্দর। আগে ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে এসো, তারপর ভাল করে চুল আঁচড়াবে কেমন ?

রঙ্গন নামটা কী করে যে গাঁয়ের পথে উড়ে এসেছিল। উড়েই বা আসবে কেন। পাঠশালার পণ্ডিতমশাই আমায় ওই নামটা দিয়েছিলেন। মা কত কষ্ট করেও আমার নাম মুখে আনতে পারেনি। অঙ্গন বলেও ডাকতে পারত

না। আগেই বলেছি ডাকত অঙ্গন। **আমাকে** স্পষ্ট, একেবারে গোটা করে ডেকেছিলেন দেবপ্রিয়া। প্রথম একজন মা আমাকে ওভাবে ডেকেছিলেন।

যে মা আমার নাম সম্পূর্ণ করে ডাকতে পারেনি কোনও দিন, তারই বুকে মুখ গুঁজড়ে দেব বলে ছুটে এসেছিলাম ঘাটে। কী করে ভাবি, জীবনটা শুধু কতকগুলো মিথ্যাকথা।

মায়ের মতো করেই কি দেবপ্রিয়া আমাকে দেখেননি। আর ভালবাসা তো উনি কিনতে চাননি, আমি নিজে থেকেই ভালবেসেছিলাম। উনি ভালবাসা দিলেও কাজের লোক কেন থাকে না, কাজের জন্য উপস্থিত হওয়ার ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলাম।

নীচের তলার বড় ঘরটিতে ময়ূরী হুইল চেয়ারে গাড়িতে শুয়ে হিসি এবং পায়খানা একসঙ্গে করে ফেলল।

দেবপ্রিয়া ডাকলেন—আয় রঙ্গন এদিকে। তোকেই এবার সামলাতে হবে। লক্ষ্মীর মা আজও এল না।

হরিমতী বসে আছে বাইরে ড্রয়িং কাম ডাইনিংয়ের চত্বরে, টেবিল চেয়ারের কাছে, মেঝেয়। ছেলে ঢুকেছে দেবপ্রিয়ার ডাকে, প্রকাণ্ড ঘরটির মধ্যে। যখন বেরিয়ে এল, হাতে ঝুলছে মল মাখা প্যান্ট। গরিব মা বোকার মতো সেই দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখল।

রঙ্গন বাথরুমে ঢুকে গেল।

ময়ূরী, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এভাবে। তুমি বড় বড় চোখ মেলে আমাকে দেখছিলে আর ভাবছিলে... হায় ভগবান, তোমার কি ভাববার শক্তি আছে। কথা বলতে চাইছিলে তুমি। তখন কি জানতাম, তুমি একটুও কথা বলতে পার না।

এখন যেমন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার গ্রামটি নেই, সেদিনও বিশ্বাস করিনি, তুমি নির্বাক। তোমার কাজলটানা চোখে চেয়ে দেখে, অপূর্ব মুখশ্রী দেখে, বারবার মনে হচ্ছিল তুমি কথা বলে উঠবে।

রঙ্গন মলমূত্র মাখা ময়ূরীর পরিত্যক্ত প্যান্টি বাথরুমে রেখে আসে। রাত্রে দেবপ্রিয়া হঠাৎ শুধালেন—কেচে দিয়েছ?

—না।

—ঠিক আছে, থাক। লক্ষ্মীর মা নিশ্চয়ই কাল ভোরে এসে পড়বে। কেচে দেবে। তুমি খেয়ে নাও।

রঙ্গন বুঝেছিল দেবপ্রিয়া তাকে কাচতে বলতে সংকোচ বোধ করছেন।

লক্ষ্মীর মা কাজের মেয়ে, জীবন্তী চলে গেছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই। রঙ্গন আর কোন কথা না বলে ওই রাত্রেই বাথরুমে ঢুকে সাফ করেছিল ময়ূরীর প্যান্ট, সাবান দিয়ে পরিষ্কার করেছিল।

রাত্রে খেতে বসে খেতে পারে না রঙ্গন। নিজের গু-মুতকেই মানুষ ঘৃণা করে, ময়ূরী সুন্দরী, জড়পিণ্ডের মতো ভাষাহীন, অসহায়। তবু রঙ্গন সামলাতে পারল না, পেটের ভাত দ্রুত ছুটে গিয়ে বেসিনে উগরে ফেলল। লজ্জা। লজ্জা। তুমি ঠিক বুঝবে না ময়ূরী রঙ্গন অতি সঙ্কোচে কেমন কাতর হয়ে পড়েছিল। ওর চোখের দিকে চেয়ে দেবপ্রিয়ার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, এ বাড়িতে রঙ্গন টিকবে না। পালিয়ে যাবে। সবাই তো গেছে, রঙ্গন তো মেয়ে নয়, পুরুষের এমনিতেই ঘেন্না বেশি, তা ছাড়া গরিবেরও তো রুচি থাকতে পারে। অপমান বোধ করতে পারে।

—চোখেমুখে জল দাও।

—দিয়েছি।

—মনের বিরুদ্ধে তোমাকে করতে হল রঙ্গন!

—তুমি তো বলনি মা। আমি নিজেই করেছি।

হরিমতী মেঝেয় শুয়েছিল। বলল—ওব্যেস তো নাই দিদি। তাই। ওইটুকু বলে চোখবুঝে চুপ করে রইল হরিমতী। কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় চাপা ক্ষীণ অসন্তোষ লুকিয়ে রয়েছে বুঝতে পারেন দেবপ্রিয়া। খুব গরিব না হলে এরা মা-ছেলে ওই বিকেলেই 'কাজ করব না' বলে চলে যেত।

—তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও হরিমতী। পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছি। অনেক।

—থাক দিদি। আর ব'লো না। কলের পাখাটা আর এট্টু বাড়িয়ে দাও। খোকার গায়ে হাওয়া লাগুক।

হরিমতী আবার চুপ করে রইল। পাখার স্পিড বাড়ানোর প্রস্তাবেই ছিল মায়ের হৃদয়ে লুকনো অব্যক্ত কষ্ট। আমি বুঝেছিলাম।

আমার বাপ জনখাটা মানুষ, মা ধানভানানি, সুতা কাটনি দাসী। মুরগি পালা, লতানে সবজি করা, ছাগলপোষা মেয়ে, গরিব কতটা, কতটা অভাবী—দুঃখী বাংলা ভাষায় লেখা কঠিন। আমাদের বসতভিটা ছাড়া জমিজিরাত ছিল না। ছিল তেরো কাঠা ভিটার গালাগা ভুঁই। বাপ কোদাল চালিয়ে ফসল করত, ওকে ঠিক চাষ বলে না। ফসল বলতে সবজি করত বাবা। পরে বাপের ব্যাধি হয়, অসুখের নাম জানতাম না। কেমন শুকিয়ে

গিয়েছিল, খালি বিছানায় শুয়ে থাকত। আমার ছিল দুইটা বোন, একটা ভাই। বাপ তাদের মানুষ করার, বিয়ে শাদি দেওয়ার সামর্থ্য হারিয়েছিল। ময়ূরীর মা আমার দু'শো টাকা মাইনের ব্যবস্থা করেছিলেন। টাকাটা পরিমাণে এতই বিস্ময়করভাবে লোভনীয় ছিল যে, গুমুত ঠেলতে আমার বাধেনি। মা মাসে মাসে এসে সেই টাকা নিয়ে যেত।

আমি বাঁধা পড়লাম অদ্ভুত জীবনে, আশ্চর্য চাকরিতে। আমি হলফ করে বলতে পারি, আমি বলেই পারতাম, ওই চাকরি অত্যন্ত কঠিন। ঘেন্নাপেত্ত কম হলেই ও চাকরি করা যায় না। ঘেন্নাপেত্ত কম লাগবে, মান-অপমান বোধ কম হতে হবে। তা ছাড়া চোখে চোখে রাখতে হবে মাংসের ওই সপ্রাণ পিণ্ডটাকে, দৃশ্যত যে রূপমতী, যার সঙ্গে কখনও তোমার মন বিনিময় হয় না। কথা হয় না।

সে কেবল তোমার দিকে চেয়ে থাকে। একটি পাখিও চেয়ে থাকার অভ্যাস জানে, তাই বলে পাখি কি আর মানুষ! পাখি কথাটি মনে এল এই জন্যে যে, ওর নাম ময়ূরী।

একটি দাঁড়ে পোষা পাখির কাছে যাও, সে নেচে নেচে তোমার কাছে এগিয়ে আসবে, খাঁচার ভেতর থেকে ঠোঁট এগিয়ে দিয়ে ক্রো করে কথা বলতে চাইবে, খাঁচার তার ঠোঁটে কামড়ে ধরে পাখা ঝাপটাবে; তোমার নাম ভোলা, পাখিটা তোমাকে ডাকবে, ভোলা, ভোলা!

কিন্তু ময়ূরী, সে তো আমায় রঙ্গন বলে ডাকবে না। আমাকে দেখে এগিয়ে আসবে না, ও পাখি বটে, কিন্তু ওর কোন ডানা নেই, ও কোনও দিন ভাষা শিখবে না—ভাবলেই বুকটা কেমন মোচড়াতে থাকে।

কিন্তু প্রথম দিনই মনে হয়েছিল, ময়ূরী কথা বলতে চাইছে।

একটি নিরীহ বকনা সেও তো তোমার দিকে চেয়ে থাকে, তোমার হাত চেটে দেয়। কাছে এগিয়ে এসে বলে, হ্যাঁ গো, কেমন আছো। ওর গোঁ-ও-ও করা, ওটাই হ্যাঁ গো! কিন্তু ময়ূরী তেমন কথা কখনও বলে না। ও একটি পতঙ্গও নয়। পতঙ্গ আলো চেনে।

লোডশেডিংয়ের সময় একদিন ওর নিঃসঙ্গ বড় ঘরটির মধ্যে মোমবাতি হাতে করে ঢুকি। অবাক হই, ও আমার দিকে চেয়ে আছে। সত্যিই চেয়ে আছে কিনা বোঝার জন্য আমি পায়ে পায়ে ঘরের এক কোণে চলে যাই। দেখি, তখনও ময়ূরী দরজার দিকেই মুখ করে রয়েছে, ঘাড় ফেরাচ্ছে না এদিকে। আলোও তার কোনও অনুভূতি সৃষ্টি করছে না। ঘাড়টা কেঁপে

কেঁপে উঠছে বটে, কিন্তু সে বুঝতেই পারছে না আলোটা কোন্‌দিকে সরে গেছে। ঘরের কোণে আলো হাতে করে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলাম—ময়ূরী। এদিকে চাও।

ও শুনতে পেল না। কতবার ডাকলাম, ও ঘাড় ফেরালো না। ডাকতে ডাকতে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। আলোও তাহলে ওর কাছে কিছু নয়। তবে ও কেন আছে। অন্ধকার এবং আলোর তফাতও যে বোঝে না সে বেঁচে থাকে কেন?

ময়ূরী তো বিশাল বিপুল বিরাট প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি তার কোন ক্ষুদ্রতম অংশকে এভাবে নিশ্চেতন নির্বিকার রেখে প্রাণের এমন বিমূঢ় খেলা খেলে চলেছে, আলোতে আঁধারে এত নিশ্চুপ সেই প্রাণ কী কারণে বেঁচে থাকে। এমনই একটা ভাবের কথা মাথায় আসে রঙ্গনের।

এই বাড়িতে এসে বইটই পড়ার অনেক সুবিধা ছিল। ময়ূরী রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে রঙ্গন বই পড়ার অভ্যাস করেছিল। স্কুলের খাতায় নাম ছিল তার, সেকথা সে দেবপ্রিয়া এবং অর্জুনবাবুর মুখে অনেকবার শুনেছে, কিন্তু কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ তার ঘটেনি। সেই সব ঘটনা পরে লিখছি। একটা কথা কেবল বলি, নিজের প্রবল আগ্রহে আমি বাংলা ভাষাটি খুব চমৎকার আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম। সাহিত্যের অনেক পুস্তক, অনেক গল্প উপন্যাস এখানে আছে, যা আমার কাছে গভীর এক নেশার বস্তু, খেতে না দাও ও ভি আচ্ছা, লেকিন কিতাব? ও ছাড়া আমি বাঁচব না, ওটি চাই।

পড়াশুনা করে-একটা জব্বর পাশ দেওয়ার বাসনা কি মনের মধ্যে ছিল না। ভেবেছিলাম, এখানে সেই সুযোগ পাব, প্রথমে এঁরা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু অর্জুনবাবুর স্কুলের খাতায় আমার নাম উঠেছিল, বৎসরান্তে পরীক্ষা দিয়ে পাশও করেছিলাম দু'তিন বার, কিন্তু ওই স্কুলের গন্ডি ডিঙোবার আগে অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে জব্বর পাশ আর হয়নি। ও আমার ভাগ্যে ছিল না। তবে ওই যে বললাম, বইটই পড়ার বিস্তর সুযোগ ছিল এখানে, তাই বা কম কিসের।

আমার একটা লাল রঙের মস্ত ডায়েরি আছে, সেখানে আমি নানান ভাবের কথা লিখে রাখি। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত এই নিশ্চেতনার কথা আমি লিখেছি। নিশ্চেতনা একটি ভারি কথা, কিন্তু বাক্যে তাকে প্রয়োগের ক্ষমতা আমার আছে। আছে কি নেই তা বুঝে নেওয়ার জন্য ওই কথাগুলি একদিন একটি কাগজে লিখে দেবপ্রিয়ার সামনে হাজির করে বলি—দ্যাখোতো মা। আমি ঠিক

লিখেছি কিনা ! উনি তো অবাক। অবাক হয়েছেন, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি। ভেবেছেন, আমি অমন গাঢ় কথাগুলি কোন দামি বই থেকে সংগ্রহ করেছি। অবশ্য একথাও ঠিক, ওই কথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবের শুধু ভঙ্গিটি, ভাব নয়, ভঙ্গিটুকুর ছায়া এসে পড়েছে। তা হোক, তবু তো আমি লিখতে পেরেছি।

দেবপ্রিয়া বলেছেন—কবিরা এমন লেখে। তুই নকল করেছিস বুঝি।

আমি আর কথা বলতে পারিনি। একজন চাকর কি কখনও কবি হতে পারে। আমার এই ক্ষমতা হয়ত উনি পছন্দ করেননি। কিংবা বিশ্বাস করতে পারেননি। তাতে অবশ্য আমার কিছুই যায় আসে না। ময়ূরীকে ঘিরে আমার একটি ভাবনার পৃথিবী গড়ে উঠেছিল, যেখানে কোনও মানুষ কখনও প্রবেশ করতে পারেনি।

ময়ূরীর আলোর অনুভূতি নেই, একথা ভেবে আমার কষ্টের কি কোন দাম আছে !

ডাকলাম—ময়ূরী। এদিকে চেয়ে দ্যাখ। এই দ্যাখো, আলো। সমস্ত প্রাণ এই আলো থেকে এসেছে ! একটা সামান্য লতাও তো আলোর দিকে হাত বাড়ায়।

টবের একটি লতানো ফুলগাছ নিয়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষা আছে। আমি ক্লাশের বইতে ওই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা খুব সাগ্রহে পড়েছি। জানলার কাছে ছায়ায় রয়েছে গাছটি। খোলা জানলার শিক আঁকড়ে ধরে লতাটি জানলার বাইরে আলো আর বাতাসের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে, শুধু তাই-ই নয়, নিজে আমি প্র্যাকটিক্যালি ওই পরীক্ষা করেছি টবের উদ্ভিদ নিয়ে, একটি লতা নিয়ে, লতাটি আলোর মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়ে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়েছিল।

প্রাণের স্বাভাবিক লক্ষণ কি এই হতে পারে যে, সে আলোর দিকে চাইবে না ?

ময়ূরী চেয়েও দেখল না। সেই রাত্রে সারারাত আমার ঘুম হয়নি। জেগে থেকে ছটফট করেছি।

নীচের ঘরগুলি সবই আমাদের দখলে। স্বামীস্ত্রী ওঁরা সমস্ত ঘরগুলিই আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। লক্ষ্মীর মা একটি ঘরে তার ছেলে রতনকে নিয়ে থাকে। ময়ূরীর ঘরটির পাশেই ওদের থাকবার জায়গা। রতনের বয়েস তিন চার বছর। মায়ের আঁচল ধরে সর্বক্ষণ সুর করে নাকে কেঁদে যায়। মা

রান্নার কাজে ব্যস্ত, ছেলেও আঁচল ধরে কাঁদতে ব্যস্ত।

আর লক্ষ্মীর মা ললিতা এক আজব মানুষ। ওকে আমি বুঝতে পারি না। ময়ূরীকে নিয়ে ও বিস্তর ঝামেলা করতে ভালবাসে। ও আমার সঙ্গে একটা কাজের ডিভিসন করে নিতে চায়। আমি যখন আসিনি, ও নানান ছুতোয় জীবন্তী চলে যেত বটে, কিন্তু দু'দিনেই ফিরে আসত। আমি আসার পর ওর ছুতোর বহর আরও বেড়ে যায়। গেলে আর সহজে ফেরে না।

একদিন প্রিয়ামায়ের সামনে ললিতা এক অদ্ভুত ডায়ালগ পেশ করে বসল। মা তখন ব্যাঙ্কের চাকরিতে বার হয়েছেন, সকাল নটা, বাবু বার হবেন আরও এক ঘণ্টা পরে, তাঁর স্কুলের চাকরি। হেড মাস্টার উনি। দেবপ্রিয়া যাবেন ডোমকল বরোদায়। অর্জুন যাবেন শেখপাড়ার দিকে এক হাইস্কুলে। ইসলামপুর পর্যন্ত একটি রাস্তা, সোজা। ইসলামপুরে রাস্তা দু'ভাগ হয়েছে, দু'দিকে। একটি শেখপাড়ার দিকে, অন্যটি ডোমকলের দিকে। ব্যাঙ্ক দশটায়, প্রিয়ার পৌঁছতে আধঘণ্টা প্রায়ই লেট হয়। ময়ূরীর জন্য তাঁর কিছুটা রেহাই আছে। বাবু পৌঁছবেন বারোটায়। কোনদিন বা অনেক আগে।

ওঁরা প্রায়ই একসঙ্গে সন্ধ্যার বেশ পরে বাড়ি ফিরতে পারেন। ওঁরা থাকেন উপর তলায়। ওঁদের বড় মেয়ে কেকা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। পরপর দুই মেয়ে কেকা আর ময়ূরী। কেকার কথা যথা সময়ে বলব।

ললিতা বলল—রান্নার হাতে গুমুত ঘাঁটতে ভাল লাগে না বউদি, কী বলব আপনাকে, আপনি একটা অন্য লোক দেখুন।

একথা শুনে দেবপ্রিয়ার দুই ভুরুর মধ্যিখানে সঙ্কুচিত ত্বক ব্যথায় ভরে উঠল, সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন উনি একটা চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আশ্চর্য বিহ্বল হয়ে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। ধীরে ধীরে দেবপ্রিয়ার চোখ দুটি সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে থাকা আমার উপর এসে পড়ল। অমন অসহায় মুখচ্ছবি কোথাও দেখিনি। ফর্সা মুখটা ছাই হয়ে গেছে।

দেবপ্রিয়া দণ্ডভর চুপ করে রইলেন। রঞ্জন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দৃষ্টি আবার ললিতার উপর এনে ফেললেন তিনি।

কোমল স্বরে বললেন—হঠাৎ তুমি একথা বলছ কেন লক্ষ্মীর মা। তোমাকে সাহায্য করবে বলে নতুন লোক নিয়েছি।

—লোক। লোক কোথায় পেলেন আপনি, ওইটে লোক! এক বালতি জল এদিক থেকে ওদিক করতে যার কোমর বেঁকে যায়।

—বাচ্চা ছেলে। কতই বা বয়েস।

—তাই বলুন। লোক তবে বলছেন কেন খামোকা। আসল কাজ তো সে কিছুই করে না।

—আসল কাজ !

—হ্যাঁ, আসল কাজ কী, আপনি বোঝেন না ! খুব বোঝেন। আমি রান্নার কাজে আছি, রান্নার কাজে থাকব। ঝাঁট দেব, বাসন মাজব, যদি বলেন বাজারহাটও করে দেব। কিন্তু কাচার কাজ অন্য লোককে দিন, আমি পারব না। আর একটা কথা দিদি, আমি রাত জাগতে পারব না। দরকার হলে আমার মাইনে বিশ টাকা কমিয়ে দ্যান, আর কী বলব আপনাকে।

গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়, দেবপ্রিয়া বলেন—কাজের তুমি ভাগ করতে চাইছ লক্ষ্মীর মা।

—করব না ! লোক আলাদা, কাজ আলাদা হবে না ! এতকাল তো এক হাতেই করলাম, কিন্তু কত আগের থেকেই বলছি আপনাকে, গুমুত ঠেলে রান্না চড়াতে আমার ঘেন্না হয় বউদি। রান্না ভাল হয় না, দাদাবাবু রাগ করেন। বলেন, কী রেঁদেছ। আমি বলি, কী রাঁদব বলুন দিনি। উনি বললেন, সোয়াদ হয়নি।

—কখন বলেছেন উনি ?

—বলেছেন। বলে ললিতা চোখের পাতা এমন করে টেপে যে, ওর বক্তব্যে যে কোনওই গলতি নেই, চোখের টিপুনি তারই ইংগিত। বা সে যদি বানিয়েই বলে, চোখে ওই যে সুনিশ্চয় ভঙ্গিমা তা দেখে সন্দেহ প্রকাশ অবান্তর হয়ে যায়, কেউ তখন সাহসই করবে না কথা বলার। ও যা বলছে, তাই-ই ঠিক।

—সোয়াদ তোমার কাছে চাইনে ললিতা।

—চাইলেই কি পাবেন।

—আমরা দু'মুঠো কোনমতে যাতে খেতে পাই, তাই ভাবি।

—দাদা শুদু ধনে পাতা দিতে বলেন এতে তাতে। বুঝি, রান্না ভাল হয়নি।

—যা পার, রাঁধবে তুমি।

—হ্যাঁ, বউদি তাই রাঁদব। স্বাদ সোয়াদ তুলবেন না, ঘরে আপনার অমন একটা বালাই রয়েছে অক্ষম মেয়ে...

—বালাই ! কী বলছ তুমি ললিতা। ময়ূরী আমার সন্তান, আমি তাকে বালাই মনে করি ! তুমি তাই ভাব ? কথা বল, চুপ করে থেকো না।

ললিতা আর কোনও কথা না বলে সরে যায়। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুতভাবে কেঁপে ওঠেন দেবপ্রিয়া। দু'টি চোখ ছলছল করতে থাকে। আর তিনি নীচে নামতে পারেন না। উপরে উঠে যান। উঠতে গিয়ে তাঁর পা যেন উঠতে চাইছে না, টেনে টেনে তুলতে হচ্ছে তাঁকে। দেহের বল যেন মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে উনি পিছনে উল্টে পড়ে যাবেন। সিঁড়ির রেলিঙ আঁকড়ে ধরে সামলানোর চেষ্টা করেন, দাঁড়িয়ে পড়েন সিঁড়িতে, আবার ঠেলে তোলেন নিজেকে, মুখ উপরের দিকে তুলে শ্বাস নেবার চেষ্টা করছেন বলে মনে হয়। উপরে গিয়ে ইংলিশ খাটের বিছানায় পড়ে যান দেবপ্রিয়া।

রঙ্গন উপরে উঠে এসে দেখে দেবপ্রিয়া কপালে হাত ফেলে দু'চোখ আড়াল করে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছেন খাটের উপর, ওঁর দেহ কান্নার চাপে থরথর করে কেঁপে চলেছে।

—মা!

সেই ডাকে চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে ফেলে দেবপ্রিয়া ভেজা চোখে রঙ্গনকে দেখে শাড়ির আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ মোছেন।

—যাবে না?

—আমার আর ভাল লাগে না রঙ্গন। কতদিন ভেবেছি এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে মেয়ের কাছে থাকব। দেখলি তো, কেমন করে বলল ললিতা। খাওয়ার সুখ কবেই ঘুচে গেছে জীবন থেকে। মাছই বা কি মাংসই বা কি, কোন জিনিসের কী স্বাদ আমার মনেও থাকে না। কী খাই, কী পরি, তাই নিয়ে ভাববার মেয়ে আমি কোনও দিনই ছিলাম না। ওর একটু ভোজন-বিলাসী স্বভাব, কিন্তু জীবনে সেই বিলাসও আর নেই, যত দিন গেছে, বুঝেছি ময়ূরী সব স্বাদ কেড়ে নিয়েছে। লক্ষ্মীর মা কি এসব জানে না? ওইভাবে খোঁটা দিল আমাকে! আমরা কি স্বার্থপর রঙ্গন।

এই প্রশ্নের সামনে রঙ্গন বড়ই অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

—তুমি এখন যাও মা, দেরি করো না। বলল রঙ্গন।

কিছুক্ষণ থম মেরে খাটে বসে থাকার পর দেবপ্রিয়া আবার সরু ফিতের চামড়ার ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নামেন। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাঁর।

বড় ঘরটি থেকে ডাক পড়ে—এসো বউদি। রেডি করেছি।

এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য আমি দেখেছিলাম। প্রথম প্রথম এটাকে কী বলব বুঝে পাইনি। মায়ের মন বলব একে, নাকি মায়ের মন নয় বলব ঠিক করতে

পারিনি। সকালে ব্যাঙ্কে যাওয়ার তাড়া, হাতে সময় থাকে না। ন'টার মধ্যে রান্নার একটা প্রাথমিক পাট শেষ করে দেয় লক্ষ্মীর মা। নিজে স্নান খাওয়া করে নিয়ে উপর থেকে নীচে নামেন দেবপ্রিয়া তৈরি হয়ে, তখন ওই একই সংলাপ শুনি—এসো বউদি। রেডি করেছি।

একটা ছোট দুধকাঁসার থালায় মাছের কাঁটা ছাড়ানো শাঁস দিয়ে চটকানো ভাত, কিছুটা চটকানো, আবার কিছুটা মাখামাখা অথবা ভর্তাসেদ্ধ কিছুতে মাখানো, একটু আধটু কিছু একটার ঝোলে মাখিয়ে নেওয়া ভাত, পাতে একটা চামচ। লক্ষ্মীর মায়ের কাঁধে সাদা ধবধবে মোটা তোয়ালে ঝুলছে, সে থালা ধরে ময়ূরীর হুইল চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

দেবপ্রিয়া ঢুকে এসে চামচে তুলে দু'চামচ মেয়েকে খাইয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান বাস ধরবার জন্য, বাইরে রিকশা হাঁকে, তাড়া লাগায় তখন। তারপর চামচ ফেলে দিয়ে ললিতা হাতে তুলে ময়ূরীকে খাইয়ে দেয়।

সেদিন বলেছিল—তোমার তো দু'চামচ মাত্তর। আমার দশ গরাস।

—মানে !

—অত চমকালে কেন বউদি, নতুন নাকি ! তুমি তো চামচ ঠেকিয়ে খালাস, চলে যাবে আর দেখতেও হবে না, লক্ষ্মীর মা কী করে খাওয়ায় না খাওয়ায়। শুধু ওই দু'চামচই ভাল করে নেয়, তারপর

ভেবে দেখেছিলাম, এ কি খুব ছোট ঘটনা ছিল ? দেবপ্রিয়া মেয়েকে বসে বসে খাওয়ানোর সময় কোথা পাবেন ! চামচ বোধহয় এই জন্যে ব্যবহার করেন যে, খাওয়ানোর পর আর হাত ধোয়ার হাঙ্গামা করতে হয় না, দ্রুত তিনি বেরিয়ে চলে যেতে পারেন। কিন্তু ললিতার বলা 'খালাস' শব্দটি লক্ষ্য করবার মতো, যেমন লক্ষ্য করেছিলাম 'বালাই' শব্দটিকে। কত চেনা শব্দ, কিন্তু কী তার তির্যক বহুমাত্রিক প্রয়োগ। 'চামচ' শব্দটিকেও কেমন নতুন লাগছিল।

আবার দেখলাম দেবপ্রিয়ার চোখ চিকচিক করে উঠল। সরু হয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল। তাঁর চোখের মণিতে একটি দূরত্ব ঘনিয়ে আসে, তাঁর চলে যাওয়ার দূরত্ব ; ব্যাঙ্কে গিয়ে তিনি হিসেবের কাজ করতে করতে মেয়ের কথা ভাববেন। দু'চামচ হলেও তিনি খাইয়ে যেতে পেরেছেন, মায়ের সঙ্গে মেয়ের এই সংযোগ এবং দিনমানের বিচ্ছেদই কি চোখের তারায় ফুটে ওঠেনি। আবার যদি দেখি ওই দূরত্বটি হাত এবং চামচের দূরত্বগত বেদনা জাগায়, মায়ের সঙ্গে মেয়ের দেহকে আলাদা করেছে এই দৃশ্য। চামচ নয়, হাতে তোলা গরাসে হতে পারত প্রকৃত সংযোগ। আসলে মুখ থেকে লালামিশ্রিত ভাত মায়ের কোলের কাপড়ে

ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে গরাসে তুলে দিতে গেলে। ঝোলমাখা শাড়ি ব্যাঙ্কের পক্ষে শোভন হবে না। কিন্তু রতনের মা বা লক্ষ্মীর মা দেহের এই সংযোগের মধ্যে অধিক মাতৃত্ব খুঁজে পেলে আমরা তাকে দোষ দিতে পারি না। কেননা রতন তখনও, ময়ূরীকে খাওয়ানোর সময়ও মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

গরাসে দিতে গেলে দৃশ্যটা বদলায় একটু : চেয়ারের কাছে হাঁটু মুড়ে নেমে নীচে থেকে একটু উপরে ময়ূরীর মুখে হাত এগিয়ে দিতে হয়, এইভাবে করে ললিতা। দেবপ্রিয়ার খাওয়ানোর মধ্যে একটা আলগোছের ভাব থাকে। চামচ তাঁকে আলগোছে রেখে দেয়। খোঁটা পড়েছে সেইখানে।

আমি কী একটা তাড়ায় বলে ফেললাম—আমাকে দাও রতনের মা, আমি খাইয়ে দেব !

সামান্য কিশোরের এমন প্রস্তাবে দেবপ্রিয়া কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলেন। হাতের থালা আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে দিয়ে বললেন— তুমিই খাওয়াও রঙ্গন। লক্ষ্মীর মা আর পারছে না।

ওইটুকু। আর কিছুই বললেন না দেবপ্রিয়া। সেই মুহূর্তে আর কোনও ভাষা তাঁর মুখে জুটে এল না বোধহয়। তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভদ্রতাও তখন এবং অনেক সময় যোগ্য জোরালো ভাষার অভাব সৃষ্টি করে। ভাষা সম্পর্কে আমার একটা মোক্ষম উপলব্ধি আছে, তা হল, অত্যন্ত ভাষাসচেতন মানুষ যখন ভাষা হারিয়ে ফেলেন তখন বোঝা যায়, ভাষা শুধু প্রকাশ করে না, ভাষার বোধই মানুষকে কথা বলতে দেয় না। কথা না বলে চলে যাওয়াও ভাষা। দেবপ্রিয়াকে তখন খুবই দুঃখী দেখাচ্ছিল।

কিন্তু এই ঘটনাটা আমি ডায়েরিতে লিখেছিলাম অন্যভাবে। চামচ ব্যবহার আমার ভাল লাগেনি, এখানে কী একটা ফাঁক দেখি, কিন্তু বর্ণনা করতে পারি না। আবার লক্ষ্মীর মা গরাস গুণে খাওয়ায়, ময়ূরীর পাতে ভাতের পরিমাণ কখনও বাড়ে না। সে কাজের পরিমাণ দেখে, ভাতের পরিমাণ দেখে না।

আমি খাওয়াতে শুরু করার পর ময়ূরী তোমার খাওয়ার পরিমাণ বাড়ে। একটা কথা তোমাকেই বলি ময়ূরী, ওরা তোমাকে শিশু করে রেখেছিল, আমি তোমাকে কিশোরী করেছি। তোমার বয়ঃসন্ধির প্রতিটি রোমোদ্গম দেখেছি আমি। একটি অতি সুন্দরী বালিকার দেহে একটি একটি রোমকুসুম মৃদু আলোর মতো ফুটে উঠতে দেখা এক স্বর্গের অভিজ্ঞতা।

অত খাওয়াতে দেখলে মামণি পর্যন্ত আপত্তি করতেন। উনিও ভাবতেন,

তুমি শিশু, তুমি অত খাবে কেন। তোমার অপরিণত, পরিমাণহীন বুদ্ধিকে বলা হত শিশুজ্ঞান, তুমি শিশুতে থেকে যাবে চিরকাল সবাই তাই জানত, কিন্তু তোমার শরীর সেকথা শুনতে চায়নি। বুদ্ধি বাড়ে না, শরীর বাড়ে—এই রকমই একটি জীবের কাহিনী এটি ; কিন্তু তারও একটা জীবন ছিল। জীবন ছিল জীবের মতো, তার বেশি তো নয়, সেকথা ভুল। আমি দেখেছি তুমি একটা আস্ত মেয়ে, সব আছে তোমার। কিন্তু দেখতে চাইলেই কি হয়।

—এত খাওয়ালে ও বাঁচবে না রঙ্গন!

—ও চাইছে, আমি দেব না?

—দাও, কিন্তু তোমাকেই সামলাতে হবে।

—ও কিন্তু সব স্বাদ বুঝতে পারে। আমি লালবাগ গিয়ে ওর জন্যে ল্যাংড়া আমের আমসত্ত্ব এনেছি।

—কেমন?

—ভাল।

—খেয়ে দেখেছ?

—না।

—তাহলে কী করে বুঝলে ভাল?

—ওর মুখ দেখে।

—তুমি খেয়ে দেখলে না কেন?

—কী যে বল তুমি। ওর জিনিস আমি কেন খাব!

—লক্ষ্মীর মা তো সবকিছুই আগে খেয়ে দেখে তবে আমাদের দেয়। তারও আগে রতন খেয়ে দেখে। তুমি কেন দ্যাখ না।

—ও আমি পারব না।

—কেন?

—ও যদি জানতে পারে। লজ্জা করবে না বল?

রঙ্গনের এই কথা শুনে দেবপ্রিয়া একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। চোখে অশ্রু এসে পৌঁছায়। উনি ছাদের রেলিঙের দিকে সরে চলে যান। রঙ্গন তখন স্টোভে দুধ ফুটিয়ে নিয়ে তাতে আমসত্ত্ব ফেলে দেয়। অতঃপর তাপ জুড়োলে বাটি হাতে ময়ূরীর দিকে এগোয়।

এই দৃশ্য ললিতা সহ্য করতে পারত না। ওর মনে হত, এ সবই আদিখ্যেতা! একদিন অদ্ভুত একটা কথা বললে— রয়ে সয়ে বাপু, মেয়েটা বড় হচ্ছে! ফের ও মেয়ের দৃষ্টি হয়েছে, তোর দিকে হ্যাংলার মতো তাকায়।

আমি খুব আশ্চর্য হয়ে রতনের মায়ের দিকে চেয়ে রইলাম। কী বলব বুঝেই পেলাম না। এত অশ্লীল কথা মানুষ ভাবতে পারে! ওই দৃষ্টির এই মানে করল লক্ষ্মীর মা। একটি অবুঝ জীবপিণ্ডের চোখে যদি সত্যিকার দৃষ্টির উদয় হয় রামধনুর মতো বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ আকাশে, সেখানে কেন ওভাবে কালি ঢেলে দেয় শতবুদ্ধির সুকৌশলী মানুষ। মানুষের সব বুদ্ধিই কি ভাল। বুদ্ধির জোর পেয়েছে বলেই কি একজন যা খুশি ভাববে। অমন স্বচ্ছ, নিষ্পাপ চোখের দৃষ্টিকে এভাবে ভর্ৎসনা করতে ওর একটুও আটকালো না।

একথা আজও যখন মনে করি কষ্ট হয়। কথার মধ্যে এত বিষ থাকে কে জানত। লক্ষ্মীর মা নিজে থেকে রান্নার স্বাদসোয়াদের কথা তুলে, গুমুতের ঘেন্নার কথা বলে, মামণিকে গভীর যাতনা দিয়ে ময়ূরীকে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল। পরনের প্যান্ট নোংরা করে ফেললে আমি প্রথম প্রথম খুবই অসহায় বোধ করতাম। মা নেই বাড়িতে। বাবু নেই। রান্না করে খেয়ে খাইয়ে, চান করে ভেজা চুল শুকোচ্ছে বালিশে ছড়িয়ে মেলে, পাখার ফুল স্পিড দিয়ে ঘরকে শনশন শব্দে ভরে ফেলে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে লক্ষ্মীর মা, একেবারে বুঁদ হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় ময়ূরী কাপড় নোংরা করেছে, ওকে ডাকি কী করে?

ভয়ে ভয়ে ডাকি—রতনের মা।

—দিদি বলে ডাকতে পার না? বল, কী হয়েছে!

—দেখবে একটু দিদি।

—ও তুমি নিজেই সামলাও ভাই, গতর আর পারে না রে। কী করেছে, পায়খানা?

—না। জাঙিয়া ভিজে গেছে। ধরবে একটু?

—না।

—তুমি এত নিষ্ঠুর কেন গো।

—ওই ফ্যাচাংয়ের কথা আর কত শুনব। দয়ামায়া আছে নাকি, ও আমি মূলে খেয়ে বসে আছি। যাঃ, যাঃ।

আমার কান্না পেয়ে যায়। এ আমার কাছে শুধু নিষ্ঠুরতাই ছিল না, বড়ই বিস্ময়করও ছিল। আশ্চর্য, লক্ষ্মীর মা আর গতর তুলল না।

বলল—খাইয়েছ নিজে হাতে, এখন সাফ কর নিজে হাতে, আহ্লাদ আর সইতে পারি না।

—আমার বুঝি লজ্জা করে না!

—করে তো আমি কী করব ! ওটাও মানুষ না, তুমিও চাকর। যাও, মনে কর বোনের কাজ করছ।

—তাহলে সেদিন যে অমন করে বললে ?

—ও মা ! কী বলেছি তোকে ! সব কথা ধরতে হবে নাকি, তাহলে সংসারে টিকতে পারবি ! ময়ূরীর দৃষ্টি অন্য রকম হয়েছে, মনে হয়েছিল বলেছি। তোর দোষ কোথা !

ময়ূরীর দৃষ্টিটা কি সত্যিই বদলেছে ? সে কি বিশেষ দৃষ্টিতে কাউকে দেখতে জানে ? ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল, লক্ষ্মীর মা সবই কল্পনা করেছে ; ময়ূরীর বয়েস হচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধি হচ্ছে না। নইলে ঘরে আমি আবার দু'দিন আলো হাতে করে ঢুকলাম, ও বুঝতে পারল আমি ঢুকেছি, মোম হাতে ঘরের কোণের দিকে চলে গেলাম, ও রইল তেমনি নির্বিকার, ঘাড় ফেরালো না আলোর দিকে—কেন ? ওর দৃষ্টি কোথায় হয়েছে আর।

লক্ষ্মীর মায়ের কথা যে আমার সহ্য হচ্ছিল না। হ্যাংলার মতো চাইতে শিখেছে ময়ূরী, এ যে কত বড় অপবাদ ! আমার মন বলছিল, মামণিকে লক্ষ্মীর মায়ের ওই বাজে কথাগুলি বলে দিই। বলে দিলে প্রিয়া মা কী মনে করবেন। প্রথমে দুঃখ পাবেন, তারপর ভাববেন, মেয়ে সত্যিই বড় হচ্ছে, ওর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা দরকার। লক্ষ্মীর মা করবে না, কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যে কিনা টাকার লোভে করবে। বুঝি, তা হয়ত সম্ভব। কিন্তু তেমন মেয়ে জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। দু'দিন এসেই পালাবে।

গাঁ থেকে মা যতবার মাইনের টাকা নিতে এসেছে, টাকা আঁচলে বেঁধে চলে যাওয়ার সময় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছে, চাপাসুরে—ভাল না লাগলে বাড়ি চলে যাস, তিরুপতির দোকানে কাজের লোক লাগবে, আমি তোর কথা বলে রেখেছি।

বুঝি একথা যে, টাকা দিতে চাইলেই লোক জোটে না। সাধারণ কাজের মেয়েই জোগাড় হয় না, ময়ূরীর জন্য দরকার এমন মানুষ যে তার মুখে গুনে গুণে গ্রাস তুলবে না। কী পরিমাণ ধৈর্য, কত মমতা লাগে তা যে করেছে সে-ই বুঝবে। রাত্রে সতর্ক থাকতে হয় কখন ময়ূরীর কষ্ট হবে, কষ্টের ভাষাও তো ওর এত সূক্ষ্ম, এতই অস্ফুট যে মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখতে হয়। লক্ষ্মীর মা ঘুমিয়ে পড়লে কাদা হয়ে যেত, সাড় থাকত না। এমনকি পাশে শোয়া রতন ওর বিছানা ভাসাত, আঁচল ভেজাত প্রায় প্রতিরাতে, লক্ষ্মীর মা নিঃসাড়ে পড়ে থাকত, শীতের রাতে ভেজা কাপড়ে শীত করলেও উঠি উঠি

করে শুয়ে থেকে যেত। মামণি হঠাৎ অনেক রাতে উঠে এসে দেখতেন আমি ময়ূরীর গা থেকে সরে যাওয়া লেপ ঠিক করে তুলে দিচ্ছি গায়ে। আমার উপর মামণির নির্ভরতা এসে গিয়েছিল।

ময়ূরীর এক ধরনের অদ্ভুত কষ্ট হয়। চোখেমুখে কষ্টের চিহ্ন ফুটে ওঠে। চৌকি থেকে পড়ে গিয়ে অনেক দিন তাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখেছি। দোলনাটা বড়, কিন্তু তাতে ওকে আর আঁটে না। তাছাড়া দোলনা কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ওর জন্যে নীচু চৌকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঠিক শিশু যেমন বুঝতে পারে না কোন্ দিকে ঘুমের মধ্যে সে গড়িয়ে যাচ্ছে, পড়ে গেলেও বুঝতে পারে না, ময়ূরীও তাই করত। দেখা যেত চৌকি থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেয় গড়িয়ে গিয়েছে। ওর গায়ে লেপ নেই। হিম মেঝেয় পড়ে আছে বেচারি। বাচ্চাদের যেমন সহজে সর্দি ধরে যায়, ওর তাই হত।

সপ্তাহান্তে ডাক্তার এসে অনেক কথা বলে যেতেন ওর সম্পর্কে। শুনতে শুনতে আমি অবাক হয়ে যেতাম।

ডাক্তার সামন্ত একদিন বললেন— ময়ূরীর বডি ডেভেলপড হচ্ছে, কারণ শরীরের দিক থেকে ও সম্পূর্ণ সুস্থ, দেহে ওর কোনও রোগ নেই, যথেষ্ট স্বাভাবিক ওর ফিজিক। ওর গণ্ডগোল মাথায়। অবশ্যি ওর শরীর স্বাভাবিক, বাড়বৃদ্ধির দিক থেকে স্বাভাবিক, সবলতার দিক থেকে নয়।

বললাম—আমি বুঝতে চাই ডাক্তারবাবু।

পরিমল সামন্ত বললেন—নিশ্চয় বোঝাবো তোমাকে। কঠিন নয়, বুঝতে পারবে তুমি। সহজ ভাষায় বলে দেব, তুমিই তো ওর মাস্টার।

এই 'মাস্টার' শব্দটি আমাকে অবাক করে দিল।

ডাক্তার বললেন—তুমি ময়ূরীর সব কথা আমাকে বলে শোনাও। ওর দেহের কথা তো বলই, মনের কথাও বলতে চেষ্টা কর, তাই না ? সেই জন্যই তুমি ওর মাস্টার। ওকে খাওয়ানো পরানোর কর্তব্য দায়িত্বটা তোমারই উপর বর্তেছে। মা-বাবা রোজগার করেন, এত ব্যস্ত ওঁরা যে, তুমি না হলে ময়ূরীর একেবারেই চলে না। ঠিক কিনা ?

—আজ্ঞে !

—তোমাকে তাহলে বলি, ময়ূরীর একটা সত্যি মন আছে। ইট ইজ ফ্যাক্ট, বুঝলে ? ও নিশ্চয় তোমাকে রেসপন্স করে। করে না ?

—ঠিক বুঝতে পারি না।

—পারবে।

আমি ধীরে ধীরে অনেক কথাই বুঝে নিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুর কাছে থেকে। উনি আমার বোধগম্য করে বলে দিতে কোনওই কার্পণ্য করেননি। এমন সহজ, প্রাণবান ডাক্তার আমি এই প্রথম দেখলাম। ভরতপুরে তো ডাক্তার নেই। গঞ্জে একজন ক্যাম্বেল ডাক্তার ছিল।

ময়ূরীর মাংসপেশী সবল না হওয়ার কারণ ও দাঁড়াতে শেখেনি। বাংলার ছয়ঋতু জানলা দিয়ে হাওয়ায় মিশে ওর কাছে আসে, ঝড়জল বাদলা, শীত, গ্রীষ্ম ওকে স্পর্শ করেছে দূরের হাওয়ায়, শরীরের সঙ্গে আমাদের যেমন অতি প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে, তা তার ঘটেনি।

প্রথম দিকে অতি শৈশবে যে কাজের মেয়ে ওকে দেখত, সে তাকে ঘুমিয়ে রাখতে ভালবাসত। এটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ওকে বসানো, দাঁড় করানোর কোনও চেষ্টাই তেমন করে হয়নি। ভেবেই নেওয়া হয়েছিল, এ মেয়ে কথা বলবে না, এ জড়বুদ্ধি।

ডাক্তার বলেছিলেন—ওর মস্তিষ্কের দোষ কোথায় বলি। ধর, একটি পিঁপড়ে, একটা ডেঁয়ো তোমার পায়ের পাতায় কামড়ে ধরেছে। তুমি এখন কী করবে।

—মারব।

—কী ভাবে মারবে ?

—হাত দিয়ে।

—হাত দিয়ে। ও. কে.। হাত দিয়ে মারবে তুমি। হাতটা মুহূর্তে, এক সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে বা তারও আগে হাতটা ডেঁয়োর গায়ে গিয়ে পড়বে। দ্রুত হাত সঞ্চালিত হয় কীভাবে! ডেঁয়ো কামড়েছে, এটা একটা সংবাদ। শরীরের পক্ষে। শরীর সেই সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্ক বুঝে যায় শরীরের প্রত্যঙ্গের কোথায় কী ঘটেছে, মজাটা হল এই যে, মস্তিষ্ক তখন হাত বা চোখকে সতর্ক করে তোলে, সংকেত পাঠায়। পিঁপড়ের কামড়ের অনুভূতি, মশার কামড়ের অনুভূতি সবই ব্রেন গচ্ছিত করে রাখে। যদি তা রাখতে না পারে তাহলে সে যথাসময়ে হাত বা চোখ বা অন্য যে-কোন নড়নশীল প্রত্যঙ্গকে সক্রিয় করতে পারবে না। তোমার হাতটি যে ঘুমের মধ্যেও গায়ে বসা মশার উপর গিয়ে পড়ে, তা ওই মস্তিষ্ক সংকেত দেয় বলে।

বলতে বলতে একটুক্ষণ থেমে পড়েন ডাক্তারবাবু। তারপর চোখ দু'টি সামান্য বিস্ফারিত করে বলেন—এবার তোমাকে একটা মারাত্মক কথা শোনাব। ভয় পেও না। মস্তিষ্ক যখন ভুল সংকেত পাঠায় শরীরে, শরীরের

প্রত্যঙ্গে, তখনই গোলমাল হয়ে যায়। কথাটা এই যে, মানুষের কোনও কোনও মস্তিষ্ক সংকেত পাঠাতে ভুল করে। কেন করে? ওর গচ্ছিত তথ্য বা সংবাদকে সে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে না।

—ময়ূরী?

—ওর মস্তিষ্ক সংকেতহীন নয়। তোমাকে বলছি। ভুল তথ্য পাঠানোর একটা উদাহরণ তোমাকে বলি।

একটু থেমে ডাক্তার সামন্ত আবার বলতে শুরু করেন—কোনও নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়ে বা কাজে গিয়ে আমরা পথ ভুল করি কেন। তখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধানত বা একমাত্র আমরা চোখকে তথ্যসংগ্রাহক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আমরা দেখতে দেখতে যাই, এটা সরু গলি, এটা ডাইনে, ওই চৌমাথা, ওইটে দোকান, এটা ডাক্তারখানা ইত্যাদি এত সব নতুন জিনিস একসঙ্গে এত দ্রুত চোখকে দেখতে হয় যে, মস্তিষ্ক চটপট সব তথ্য ধরে রাখতে গিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। তখন একটা গলি দেখে ভাবি, এটা বোধহয় সেটা। এই পথেই তো এসেছিলাম, তাহলে পথ ভুল করছি কেন। গোলক ধাঁধায় পড়ে যাই। ক্রমশ মনে হয়, এটাই সেই গলিটা, সব এক রকম লাগে। মস্তিষ্ক তখন ভুল সংকেত পাঠাতে থাকে। আমরা তখন আমাদের বোধবুদ্ধিকে সকাতরে বলি, আমাকে সঠিক পথটা বাৎলে দাও। ভাবি, কেউ একজন এসে বলে দিলেই তো পারে, ও মশাই আপনি ভুল করছেন। তাই না? ময়ূরীর মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই এরকম হয়।

আমি সেই প্রমাণ পেয়েছিলাম। ঈশ্বর জানেন, আমি ময়ূরীর কষ্ট অনুভব করেছি। ডাক্তার যদি কষ্টের কথা না তুলতেন আমার কষ্ট হত না। আমি তো জানতাম, ময়ূরীর মধ্যে আলোর অনুভূতি পর্যন্ত নেই।

আজ মনে পড়ে সেদিনের কথা, ডাক্তারবাবু আমাকে বলেছিলেন ময়ূরীর মস্তিষ্ক সংকেতহীন নয়। ময়ূরী মানুষকে চেনবার চেষ্টা করে, আপ্রাণ মনে রাখার চেষ্টা করে এবং ওর মানুষী প্রবৃত্তি আছে, ও জিহ্বায় স্বাদ পায়, খাদ্যের ভালমন্দ বোঝে। মনে হচ্ছিল, সে আমাকে চিনতে পারে। মামণিকে দেখে হাসে। কিন্তু ভাবি, ওর মস্তিষ্ক যখন ওকে সঠিক সংকেত দেয় না, তখন ওর কেমন কষ্ট হয়।

আমি লোডশেডিংয়ের সময় আবার ওর ঘরে ঢুকেছি। আমার হাতে মোমবাতি। আলোয় দেখি ময়ূরী আমাকে দেখছে। চেয়ে চেয়ে দেখছে। পলক ফেলছে না। আমি ঘরের কোণে চলে যাই। ওর ঘাড় একটুখানি নড়ে

উঠে অনড় পড়ে থাকে চেয়ারের গাড়িতে। দরজার দিকে চেয়ে থেকে যায় ময়ূরী। আলো সরে যাচ্ছে, অথচ সে দেখছে না। তার দৃষ্টি আলোকে অনুসরণ করছে না। শিশু যেমন তার দৃষ্টিকে একটি বিষয়ের উপর স্থির করে রাখতে পারে না, ময়ূরীর অমন মায়াময় চোখ কি সেই রকম ? হা ঈশ্বর। ওর কি এখন কোনও কষ্ট হচ্ছে!

—ময়ূরী এদিকে। এইদিকে চাও, আমি এখানে। এই দ্যাখো, আলো। এটা মোমবাতি।

বারবার বলি। কতবার বলি। ও যখন কিছুতেই চেয়ে দেখল না, আমার সেদিন খুব রাগ হয়ে গেল। আমি যাকে এত ভালবাসি সে আমার কথা শুনবে না কেন! আমি কি ওকে ভাল না বাসলে এ বাড়িতে থাকতাম। প্রথম দিন থেকেই ওর সৌন্দর্য, ওর অসহায় নিষ্পাপ মুখ, ওর সতেজ লতার মতো দেহ, ওর কাঁচা সোনার গা, রূপকথার রাজকন্যের মতো ছোট মেয়েটি, তাকে ভালবেসে আমি যেন মনে মনে এক রাজপুত্র হয়েছি। রাজকন্যের পায়ের কাছে রুপোর কাঠি, ওর মাথার কাছে সোনার কাঠি। আমি ওকে জাগিয়ে তুলি, ওকে আমি ঘুম পাড়াই। আমি খাওয়াই, পরাই, সব করি। ও কি আমার স্পর্শ বুঝতে পারে না। ও কি আমার পায়ের শব্দ টের পায় না। একটা সামান্য শিশুও যদি অত বোঝে, ও কেন বোঝে না। মায়ের পায়ের শব্দে দোলনা থেকে শিশু মাথা তুলে দ্যাখে, মা এসেছে। গায়ের গন্ধে বোঝে, মা এসেছে। তুমি কি তা-ও বোঝো না!

আবার ডাকলাম—আমি রঞ্জন। এদিকে চাও ময়ূরী। একটিবার তাকাও।

খুব রাগ হতে লাগল। আমারই বা কী এমন বয়েস তখন। আমি চাকর বলেই কি রাগতে পারি না। তখনই আমার অনেক পাকা পাকা বুদ্ধি হয়েছে, তা বলে সত্যিই তো আর পাকা লোক নই, আমি কি রাগতে পারি না। আমার কথা না শুনলে আমি কেন এভাবে পড়ে থাকব ওর কাছে। টাকা পাই বলে। ওরকম টাকায় আমার কোনওই আগ্রহ নেই। মা জানে টাকা পয়সার কথা, আমি ওসব বুঝি না। অবশ্যি খুব গরিব বলে পড়ে আছি, মায়ের এবং ভাইবোনের আর বাবার মুখ চেয়ে পড়ে আছি। তুমি দ্যাখো ময়ূরী, আমার সঙ্গে অমন আড়ি করে থেকো না, আমিও তাহলে আর ভাব করব না তোমার সঙ্গে। আমি জানি, তোমার মাথায় সংকেত কাজ করে। তুমি মনে করার চেষ্টা কর, আমি কীভাবে ঢুকে এলাম, আমার হাতে মোমবাতি রয়েছে।

—টুকি। টু-উ-উ-কি-ই। কানামাছির সুরে ডাকি ময়ূরীকে। ও চেয়েও

দেখে না।

আমি হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওর গালে একটা আস্তে করে চড় মেরে বসি। ওর চোখ কেমন অভিমানে রেগে আমার দিকে স্থির হয়ে যায় পলক হারিয়ে ফেলে। দেখি, ওর গালে অশ্রু, গণ্ডে অশ্রুর দাগ। ও মুখ ফিরিয়েছিল দরজার দিকে, কিছুতেই সে আমায় খুঁজে বার করতে না পেরে কেঁদে ফেলেছে। এতটা কান্না তো শিশু সহজে কাঁদতে পারে না। অনেক কষ্টে এতটা জল গড়িয়ে পড়ে। বুঝতে পারি, মস্তিষ্ক তাকে কতখানি বিভ্রান্ত করেছে। ও মনে করেছে, আমি দরজার ওদিকেই রয়েছি, আমি নেই দেখেও মস্তিষ্ক তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করেনি। ওর মাথার মধ্যে হঠাৎ গোলকধাঁধা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একটু পর ভাল করে একটি অদ্ভুত ঘটনা, একটা সংবাদ লক্ষ্য করি।

দরজার বাইরে ডাইনিংয়ের ওদিকে সানমাইকার টেবিলে আমিই একটি মোমবাতি খাড়া করে এসেছি। আমি যখন মোম হাতে ওর সামনে দিয়ে ঘরের কোণে চলে যাচ্ছি, মাত্র নিমেষে ভুল করে ওর চোখ ওই বাইরের আলোয় গিয়ে আটকে যাচ্ছে, একটি মোমবাতি সরে গেলেও আর একটি মোমবাতি ওর চোখে থেকে যাচ্ছে, আসলে ময়ূরী বাইরের মোমবাতিটাই দেখছে, কেননা অন্ধকার হওয়ার পর ডাইনিং-টেবিলে মোম জ্বলতে দেখেছে এবং আলো ফুটে ওঠামাত্র ওখানে আমাকে দেখতে পেয়েছে।

এবার বলি, লোডশেডিং হলে দোতলা থেকে মোমবাতি খুঁজে বার করে আনতে অনেকটা সময় চলে যায়। তখন বাড়িটা অন্ধকারে অনেকক্ষণ ডুবে থাকে। ময়ূরী তার হুইল চেয়ারের গাড়িটায় সেই অন্ধকারে একা চেয়ে থাকতে থাকতে কেঁদে ফেলে কিনা জানি না, অন্ধকারে থাকা, হঠাৎ অন্ধকারে—শিশুরই মতো তার পক্ষে কষ্টকর। রাত্রে সে আলোরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে একটা ডিমলাইট জ্বলে সারারাত। এভাবে সে থাকে। অন্ধকার হয়ে গেলে অনেক সময় সে মুখে একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে ওঠে।

প্রথম সবচেয়ে মোটা মোমটা জ্বালি ডাইনিং ওরফে ড্রয়িং চত্বরের টেবিলটায়, মোমের আলো ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। সেই আলোয় আমার মুখটা ভেসে ওঠে খোলা দরজার পথে, ময়ূরী দেখে। আমি অপেক্ষাকৃত সরু একটা মোমবাতি হাতে করে ওর ঘরে ঢুকি এবং ওর সমুখ দিয়ে চলে যাই ঘরের কোণে।

যখন সরু মোমসহ আমি সরে যাচ্ছি তখনই গোলযোগ হচ্ছে মোটা কিন্তু কিছুটা দূরবর্তী বাতিটার কারণে, ওখানে সে আমাকে দেখেছে অনেকক্ষণ

অন্ধকার শেষে, এই তথ্যটা ওর মাথা থেকে নড়ছে না ; ও আমাকে কাছে দেখেও ভাবছে সরু মোম সরে যাওয়া মানে, আমি টেবিলের ওখানে চলে গেলাম। যেহেতু সরু মোম সরে যাওয়া মাত্রই চোখটা তার সেটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে স্ফীত দূরবর্তী শিখাটির দ্বারা বাধা পাচ্ছে, একটি মোটা রশ্মি তাকে টেনে নিচ্ছে টেবিলের ওদিকে, তাই ও আমাকে খুঁজছে ঘরে বাইরে ড্রইংয়ে। ঘটনা অদ্ভুত ! দু'টি বাতির অস্তিত্বই সে আলাদা করতে পারছে না।

আমি ওর অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টি দেখে এবং ওকে মেরেছি ভেবে এবং সানমাইকার মোমটা দেখে সমস্ত বুঝতে পেরে তীব্র আক্রান্ত বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ি। বুকের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট হয়। শিশুকে মেরে মায়ের যেমন কষ্ট হয়। ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। পারি না এই জন্যে যে, ও বড়লোকের মেয়ে, আমি গরিব ; আমি চাকর। তাছাড়া, লক্ষ্মীর মা বলেছে, ওর দৃষ্টি হয়েছে।

আমি বলি, ওর দৃষ্টি যেন সত্যিই হয়। অপবাদ দিক, অপবাদ মাথায় নেব, তবু সে যেন তেমন করেই দেখে, ওর চোখ যেন মানুষের মতো কথা বলতে শেখে। সানমাইকার টেবিলে পোঁতা মোমটা নিবিয়ে দিয়ে এসে পরীক্ষা করি ময়ূরীকে। এবার ও অত্যন্ত সহজে আমাকে, আমার হাতের বাতিটাকে অনুসরণ করতে পারে। আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু আরও অধিক আনন্দ আমার চাই। হাতের মোম নিবিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকি, ওর কাছে। হঠাৎ দেখি ও আমার হাতটাকে ধরতে চাইছে, শিশু যেমন ধরতে চায়। সবলে নয়, ক্ষীণ স্পর্শে। ওর হাতদু'টি শিশুরই মতন কাঁপতে কাঁপতে আমাকে ধরতে চায়।

ড্রইংয়ে এসে মোটা মোমটা আবার জ্বেলে দিই।

ডাক দিই—দেখতে পাচ্ছ !

ওর ঘরের তাকে একটা মিহি, কড়ে আঙুলের চেয়ে মিহি মোম বসিয়ে দিই, যাতে ওকে দেখা যায়। দেখি এত দূরেও সে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটু একটু সরে যাই এদিক ওদিক, ওর চোখ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ও খুঁজছে বুঝতে পারি, ও দেখতে না পেয়ে বিচলিত হচ্ছে বুঝতে পারি।

তারপর ওর একটি কঠিন পরীক্ষার প্রস্তাবনা করি নিজের বুদ্ধিতে।

—ও মা। তুমি কেমন করে চেয়ে আছো গো। নাও, এবার দ্যাখো।

মোমবাতি হাতে করে সামনে দাঁড়িয়ে বাতিটা নাড়তে নাড়তে একটু একটু সরে যাই কোণের দিকে, এত ধীরে এবং সন্তর্পণে যে, ওর চোখ আর ভুল করে

না। কিন্তু আবার ভুল করে। ভুল করে ঘাড় ঘোরাতে পারে না, ডাইনিংয়ের আলো দেখে। দু'বার ভুল এবং একবার ঠিক করে। এভাবে আলো দেখাতে দেখাতে ওর মস্তিষ্ক সঠিক সংকেত দিতে থাকে। ওর মস্তিষ্ক ওকে বুঝিয়ে দেয়, আলো দু'টি, একটি দূরে, অন্যটি কাছে। একটি মোটা, অন্যটি সরু। ওর কাছে নিকট এবং দূর প্রতিভাত হয়। আলো নয়, ও দ্যাখে তার সবচেয়ে কাছে রয়েছে রঙ্গন। মা নয়, বাবা নয়। লক্ষ্মীর মা তো নয়ই। আলো চিনতে চিনতে সে আমাকে চিনতে শিখে যায়।

এই আনন্দের কি সীমা আছে! এ আমি কাকে বলে বোঝাব! ও কেঁদে ফেলেছে গণ্ডদেশ প্লাবিত করে, ও হেসে ফেলেছে আকর্ণ বিস্তার করে, ওর আনন্দ আমি বুঝি, ওর কষ্টের সীমা আমি স্পর্শ করেছি।

যেদিন আমি প্রথম ধ্রুবতারা দেখেছিলাম আকাশে, আমার এক পাড়ার দিদি আমাকে দেখিয়েছিল, ভরতপুরের শাহডিহির উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে, চিরল নিমপাতার ফাঁকে, সেই যে   আর সে কি বিস্ময় মা গো, কী আশ্চর্যের নিবিড় আলো দেবতার স্নিগ্ধ চোখের মতো আমার দিকে চেয়ে থেকেছে কতক্ষণ মনে নেই। সারারাত জেগে থেকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। নিমপাতার ঝরোখা সন্নিবেশ করে আছে চোখের উপর, স্থির সেই আলো কেঁপে কেঁপে আসছে বাতাসের দোলায়।

ময়ূরী দু'টি আলোক বিন্দুকে আলাদা করতে পেরেছে দেখে সেই এক অপূর্ব নবীন আনন্দ আমাকে সমস্ত রাত্রি পাগল করে তুলেছিল। ওর অমন গাঢ় অশ্রু এই প্রথম দেখলাম, আমি জানি ও কেঁদেছে আমারই জন্যে। ও আমাকে ধ্রুবতারার মতো চিনতে পেরেছে। ওর হাসি নক্ষত্রবীথিকার দুগ্ধ, অত শুভ্রতা মানুষকে আস্ত রাখে না, আজ আমার সেই কথা মনে হয়। পৃথিবীতে সব জিনিসের দূষণ আর ভেজাল আছে, শিশু বা ময়ূরীর হাসিতে দূষণ নেই, পাপ লাগে না। আজ এমনই উপলব্ধি হয়, সেদিন বুঝিনি, এত ভাল লাগছে কেন আমার! প্রথম ধ্রুবালোক দেখার বর্ণনা, তার আনন্দের ভাষা আমার গরিব বাংলা বাক্যে সাজাতে পারি না ময়ূরী। তোমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তর কক্ষগুলিতে, ত্রিস্তরে নক্ষত্রখচিত সহস্র আকাশ ঘুরতে ঘুরতে ভেসে চলেছিল, আকাশের পর আকাশ এবং নক্ষত্রমণ্ডলী আর তোমার আনন্দ।

তুমি আমাকে ডেকেছিলে—'মা।'

সত্যি করে বল ময়ূরী সেই রাতে কী হয়েছিল তোমার। বিশ্বাস করতে পারি না। ওই ডাক বিশ্বাস করতে পারি না। প্রথমে ভাবি, ভুল শুনেছি। কান ভুল

শুনছে, আমারই মস্তিষ্ক-সংকেতে কোথাও ভুল হয়ে গেছে, শ্রুতিকে ধোঁকা দিচ্ছে আমার বুদ্ধি। কেন তুমি 'মা' বলে ডাকবে আমাকে। মামণি এখনও ফিরতে পারেননি কাজ সেরে। বাবা আসেননি। আমি তোমাদের কাজের ছেলে, খিদমদ্গার আমি, হুকুমবরদার আমি, দাস আমি। আমি চাকর। আমি কী করে 'মা' হতে পারি।

ওই একটা ডাক তোমার প্রথম স্বরবর্ণ। একটি শব্দই তোমার একমাত্র আহ্বান, তীব্রতম অভিব্যক্তি। সুন্দর কী, তুমি বলবে, 'মা'। কষ্ট কী, তুমি বলবে 'মা।' ঈশ্বর জানেন, প্রকৃতির নিশ্চেতন অংশও কেন কোনও ভাষা, কোনও ধ্বনি, কোনও সংকেত জাগিয়ে তুলতে না পারলেও, পারে— একমাত্র 'মা'। ময়ূরী নারী এবং পুরুষ বোঝে না, মা বোঝে। প্রকৃতি কীভাবে তার কণ্ঠে একটি ক্ষুদ্র ধ্বনিকে, শব্দকে, বাক্যকে এবং একমাত্র সংকেতকে, যার নাম 'মা'— বাক্য মা, শব্দ মা, ধ্বনি মা, কিছু নয় শুধু মা, মাত্র মা, এই স্ফুটিত ভাষাকে লীলায়িত করে। কেন করে। আমাকে কেন সে মা করে তোলে ?

প্রকৃতি যেন ওর মধ্যে ভাণ করে লুকিয়ে থেকে মজা করছে, আছে সে সম্পূর্ণরূপে, কিন্তু প্রকাশ করছে একটি ধ্বনি, মা। হায় রাম, তুমি শুনেছি রত্নকণ্ঠ ডাকাতের গলায় 'মরা' থেকে উৎপন্ন হয়েছিলে, কিন্তু নিশ্চেতন প্রকৃতির অতল অন্ধকার মা থেকে কী উৎপন্ন করতে চাইছে। আমাকে কেন 'মা' বলে ডাকলে ময়ূরী। আমি তো চাকর।

আমার বুকের ভেতরটা তখন তোলপাড় করে উঠেছিল, আর সেই আন্দোলন থামতেই চাইছিল না। সেদিন তত বুঝিনি, হয়ত আজকার মতন ভাবতেও পারিনি, কেননা ভাষা দিয়েই তো মানুষকে ভাবতে হয়, সেই ভাষা বই পড়ে, ডায়েরি লিখে, ভেবে ভেবে আমি আয়ত্ত করেছি ধীরে ধীরে, আজকার অনুভূতি আমি অতীতের সেই উপলব্ধির ভিতর সঞ্চালিত করে চলেছি। অজস্র বার আমি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছি, তাছাড়া বিভূতিভূষণ পড়েছি, মানিক পড়েছি, আরও কত পড়েছি একা একা। আমি পাশের বাড়ির রাঙাবউদির কাছে থেকেও বই এনে পড়েছি। আমার স্কুল পড়া হল না, পাশ দেওয়া হল না, কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে গিয়ে দেখলাম, আমার ভাবের মধ্যেও অনেক ক্ষীর তোয়ের হয়ে যায় অনেক সময়।

যেমন প্রকৃতি মুখর, বাঙ্ময় আবার কোথাও সে অদ্ভুত বোবাও বটে। কিন্তু যাকে আমি নিশ্চেতন অথবা বোবা বলছি, তারও অতলে ভাষা থেকে যায়, মা ডাকটা সেই রকম। এই যে ভাবছি এখন, কেউ যদি এই ভাবের ঘনতা না

বুঝতে চায়, আমার আক্ষেপ থাকবে না। এ আমি নিজের জন্য ভাবি। বলি ওইটুকু যে, ময়ূরী আমাকে মা বলে ডেকে অবাক করে দেয় সেই রাতে, তখন বিদ্যুৎ এসে লাগে সিলিংফ্যানে আর বালবের অন্তরে। কিন্তু ওই ডাকের মধ্যেও আমার ভাগ্যের পরিহাস ছিল বুঝেছিলাম খুবই শীগগীর।

॥ দুই ॥

অর্জুনবাবুর মতন গম্ভীর মানুষ আমি দেখিনি। ওঁর মুখের রেখা ভারি এবং কঠিন। সেই কাঠিন্য অনেকটা নির্মম, পাথরকে মোটা দাগে কুঁদলে যেমন হয়। থুতনির মাঝখানে গভীর খাঁজ, দুপাশের মাংস ঈষৎ ঝুলেছে, চোখ দু'টি বড় বড় এবং বাইরে কিঞ্চিৎ ঠেলে এসেছে, ফলে দৃষ্টিও কঠিন। ভুরু রোমশ, কাঁধ রোমশ, হাতদু'টি রোমশ, বুক অধিক রোমশ, পা লোমপূর্ণ, স্বাস্থ্য ভাল। ছ' ফুটের চেয়ে এক ইঞ্চি বেশিই লম্বা, কপাল প্রশস্ত, নাক উন্নত এবং নাকের টিকে টিয়ার মতন বাঁকানো, একটুখানি। বুকের ছাতি চওড়া।

লোকটি হেডমাস্টার ভাবতে যে কেউ ইতস্তত করবে। গলার স্বরও কঠিন, কড়া খরতা আছে এবং গম্ভীর। কথা বলেন অত্যন্ত কম। হাঁটাচলায় দাপট দেখি, পায়ের জুতো মচমচ করে। শুধু ময়ূরী ওঁর কণ্ঠস্বরকে খানিক যা নরম করেছে, ধীরে ধীরে তাঁর মেরুদণ্ডকে ঈষৎ বাঁকিয়ে দিয়েছে। কাঁধ একটু সামনে ঝুঁকে পড়েছে। গায়ের রঙ কালো, তবে চকচকে। ঠোঁটে অত্যন্ত সিগারেট খাওয়ার ছেঁকোলাগা দাগ, দেখে শ্বেতি বলে ভ্রম হয়। ওঁকে কখনও হাসতে দেখিনি। তাঁর হাসি অবশ্যই বিরল ঘটনা।

এই মানুষ যখন খেতে বসে সোয়াদ হয়নি বলেন, তখন যে রেঁধেছে তার বোধহয় একটু বেশিই লাগে।

প্রথম দিনই উনি আমাকে বলেছিলেন—থাকো। টাকা পাবে। স্কুলে ভর্তি করে দেব। খারাপ কাজ, কিন্তু টাকা অনেক বেশি হরিমতী। ভেবো না ছেলেকে জলে ফেললে, আমরাও মানুষ।

এই বাক্যগুলি আজও আমার কানে ধ্বনিত হয়। মানুষটিকে আশ্চর্য লেগেছিল আমার। টাকার কথা ওভাবে তিনি না তুললেই পারতেন। প্রথম প্রথম খারাপ কাজ, কিন্তু টাকা বেশি ভাবতে ভাবতে দম বার হয়ে যাওয়ার জোগাড় হত। মনে হত সব ফেলে ভরতপুর ফিরে যাই। আশঙ্কা তাঁদেরও ছিল, আমি চলে যেতে পারি।

আমরা গরিব মানুষ, আমাদের পক্ষে টাকার লোভ আর ভালবাসার লোভ দুই-ই মারাত্মক হয়।

মামণি হামেশা বলতেন—আমার ময়ূরীকে তুই ভালবাসবি তো রঙ্গন।

স্বামী স্ত্রীর কথা একসঙ্গে যোগ করে একদিন অনেক পরে আমি চমকে উঠেছিলাম।

ওঁরা আমার কাছে ভালবাসা চাইছেন কন্যার জন্য, নির্বোধ প্রাণটির জন্য, বিনিময়ে দেবেন টাকা। অবশ্য গরিব এই প্রস্তাবে কিছু মনে করে না, আমিও করিনি। টাকা কী তা আমরা জানি না, ভালবাসা কী তা-ও যে বুঝি না। ওই দু'টির নিকট সম্বন্ধ কল্পনা করা গরিবের পক্ষে কঠিন।

ওঁরা বললেন ভালবাসা দাও, টাকা দেব। অনেক ভেবে দেখেছি, এই নোংরা প্রস্তাব তাঁরা বাধ্য হয়ে করতেন। ময়ূরীর জীবন ওঁদের ওই কথা বলিয়ে নিয়েছিল।

মা টাকা নিতে এলে মামণির চোখমুখের চেহারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত। এই বুঝি আমি মায়ের সঙ্গে চলে যাব। উদ্বেগের সেই চূড়ান্ত চেহারা বর্ণনা করা যায় না। মা আড়ালে ডেকে কথা বলতে চাইলে মামণির সতর্ক চক্ষু তাড়া করে এসে কাছে দাঁড়াত সঙ্গে সঙ্গে, কী বলছে হরিমতী তার ছেলেকে!

বড়লোকের বাড়িতে এসে সঙ্কোচ লাগত বলে মা চাপা সুরে কথা বলত। দেবপ্রিয়া ভাবতেন, গোপন মন্ত্র দিচ্ছে মা। ভাঙাচ্ছে। কাজের পরিমাণ নিয়ে কথা তুলছে, টাকার দর কত কম বোঝাচ্ছে। এত কেন করবি, সবই কেন তোকে করতে হবে। লক্ষ্মীর মা কেন করে না। ওর নাকে গন্ধ লাগে, তোর লাগে না।

কিন্তু মা বলত সম্পূর্ণ অন্য কথা। বলত—এখানে হাওয়া বাতাস পাস?

বলতাম—পাই বইকি।

মা বলত—তুই খুব বইকি শিখেছিস। আলো আসে? এখানে নদী নাই, আকাশ নাই। মাঠ নাই, বাগান নাই। পথ নাই, দূরে যাবি কখনও তা-ও নাই। খেলা নাই। শুদু ঘর।

—এ বছর বৃষ্টি পড়েছে পথে। ধুলোর ওপর। গন্ধ উঠেছে মা? কী গন্ধ।

—যাবি?

—না।

—কেন রে?

—একদিন যাব। এবার যাও।

সেই পথ, ভরতপুরের পথটি সারাজীবনের মতো মুছে শেষ হয়ে গেছে। আমার কৈশোরকে কেড়ে নিয়েছিল ময়ূরী। কেড়ে নিয়েছে পদ্মা, এখন পথটি আর দেখতে পাব না। পথের উপর বৃষ্টির ফোঁটা, মাটির ঘ্রাণ কেউ আমাকে দেবে না। আমি একজন কিশোর-শ্রমিক মানুষের সেবা করে একদিন বড় হয়ে উঠি। ঘরে বন্দী আমার জীবনটা ময়ূরীকে দিয়ে বিনিময়ে কী পেয়েছি কাকে প্রশ্ন করব। ভালবাসা কি মানুষকে দাস বানায়?

কৈশোরেই যাকে বুড়ো হয়ে যেতে হয় সেই তো আমি। অর্জুনবাবুর টাকা আমার সুবর্ণ কিশোরবেলাটিকে খরিদ করে গৃহে আটক করেছিল। মামণি দিয়েছিলেন ভালবাসার দুয়ো। এখন বুঝি, মানুষের টাকার ছলনা-শক্তি নেই, আছে ভালবাসার। টাকা ছলে না, ছলে প্রেম। ভালবাসার গুঁড়ো মাখিয়ে বিষ দিলেও মানুষ খেয়ে ফেলে ওইটে আমার বিশ্বাস।

শুধু অর্জুনবাবু যদি বলতেন—থাকো। টাকা পাবে। আমি থাকতাম না।

একবার পালাব বলে স্টেশন পর্যন্ত চলেও গিয়েছিলাম। ট্রেন আসতে তখনও দেরি আছে, ভেবেছিলাম আগে লালবাগ চলে যাব রেলগাড়ি চেপে, তারপর ওখান থেকে বাস ধরব।

টিকিট কাউন্টারে দাঁড়াতে গিয়ে থতিয়ে গেলাম, দেখি কলকাতার ট্রেন এসে লাগল, হুড়হুড় করে লোক নামছে, গেট পেরিয়ে স্রোত ছুটছে স্টেশনের নিম্ন চাতালে রিকশার দিকে, ব্যাগ কাঁধে করে বাবা আর মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিঁড়ির কাছে। কেকা আর তার বাবা। কেকা দেখতে অবিকল ময়ূরী। ঈশ্বর জানেন তখন আমার বুকের মধ্যে কী হচ্ছিল।

এই লেখার একটিই অসুবিধা, এর কখন কোন্ অংশ কীভাবে লিখছি, তার কাল-পরম্পরা নেই। যা অনেক পরে ঘটেছে, তা হয়ত অনেক আগে লেখা হয়ে যাচ্ছে, আবার অনেক আগের ঘটনা পরে সন্নিবেশিত হওয়াও বিচিত্র নয়। যখন যে অংশ মনে আসছে বলছি। লিখছি তা মনে মনে। কেউ শুনছেও না, কেউ জানছেও না। যে উপলব্ধি আমার অনেক পরে ঘটেছে, তা অনেক আগের ঘটনায় জুড়ে যাচ্ছে, এখনকার চোখে আমি তখনের সময়কে দেখছি।

যেমন কেকা ওর বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরছে পূজার ছুটিতে। আসছে কলকাতা হয়ে ট্রেনে। কেকা ময়ূরীর চেয়ে দুবছরের বড়। একই শরীর ওদের, আদল একেবারে এক। একজনের সঙ্গে অন্যজনকে বদলে নেওয়া যায়, মনে করে নেওয়া যেতে পারে, যাকে দেখছি সে ময়ূরী, শান্তিনিকেতন থেকে বাবার সঙ্গে পূজার ছুটি কাটাতে বাড়ি ফিরে আসছে।

বাবা ওকে আনবার জন্য শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি অনেক পরে ঘটেছিল।

রেসিডেন্সিয়াল হস্টেলে থাকে কেকা। বাবা মাসে মাসে টাকা পাঠান। মাঝে দু'একদিনের ছুটির ফুরসতে দেখতে যান মেয়েকে। মায়ের তেমন সুযোগ কমই ঘটে, ব্যাঙ্কের চাকুরিতে ছুটি বাঁধাধরা। তবে বাবার ব্যস্ততা মায়ের চেয়ে প্রকট। উনি হেডমাস্টার বলে স্কুলের অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়, তাছাড়া ওঁর আছে গানের নেশা আর সামান্য পলিটিক্‌সের ঝোঁক। ক্লাব করেন, শ্রমিকমঙ্গল সমিতি করেন, নাইট স্কুল চালান। প্রাপ্তবয়স্কদের পড়ানোর ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ আছে। তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই সব করে চলেন আপন মনে।

সন্ধ্যার পর ওঁরা কাজ থেকে ফিরে এসে মামণি ঘরে থেকে যান, কিন্তু বাবুটি বার হয়ে যান, মাঝ রাতে ফেরেন। অধিকাংশ দিন এই একই ঘটনা দেখতে পাই। কোথায় ক্লাব, কোথায় নাইট স্কুল আমি জানি না। তবে কথাবার্তা থেকে বুঝি, ক্লাবটি শহরের এক প্রান্তে, কিন্তু নাইট স্কুল আরও দূরে গঙ্গা পেরিয়ে গ্রামের দিকে। গান করেন কোথায় গিয়ে জানতে পারিনি। কোথাও ঠেক রয়েছে নিশ্চয়। বাড়িতে ওঁর গলায় কখনও গান শুনিনি। মানুষটিকে বরাবর কেমন রহস্যময় ঠেকেছে আমার।

তিনতলায় অর্জুনবাবুর একটি ছোট ঘর আছে জানি। ওখানে কারও ওঠা বারণ। মাঝ রাতে ফিরে আসার পর উনি ওই ঘরে উঠে যান। কখন নেমে আসেন জানতে পারি না। তেতলার ঘরে অর্জুনবাবু কী করেন একদিন লক্ষ্মীর মাকে প্রশ্ন করে হতবাক হয়েছি, ও মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছে—যা না, উঠে গিয়ে দ্যাখ না।

—যাব ?

—মরতে চাস তো যা। ধড়ে ক'খানা মুণ্ডু আছে হিসেব করে দ্যাখ আগে। ওখানে বউদি অবদি যায় না।

—কেন ?

—কী করে বলব বাছা, বড়লোকের ব্যাপার।

—তুমি জানো নিশ্চয়।

—জানলেই কি বলতে হবে নাকি। বলি, বলে মরি আর কি। মানুষ বাইরে এক আর ভিতরে আর এক, বুঝলি। যা, কাজে যা।

লক্ষ্মীর মা আমার মনে সেদিন এমন এক ধাঁধা তৈরি করে দিয়েছিল যে

অর্জুনবাবুকে চোখের সামনে দেখতাম আর কেমন ভয় ভয় করত। তেতলায় গভীর রাতে সত্যিই তিনি কী করেন জানার অদম্য কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু সাহস করে উপরে উঠে যেতে পারিনি সেদিন। রোজই ভাবতাম উঠে গিয়ে দেখি, রোজই কৌতূহল দমন করতাম। পরে একদিন উঠে গিয়েছিলাম তিনতলার ছোট ঘরখানির জানালার কাছে। সেটি কিছু পরের ঘটনা। অবশ্য সে ঘটনা আগে লিখলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তার আগে লক্ষ্মীর মাকে কত দিন প্রশ্ন করেছি—বলই না দিদি।

দেখলাম কেকার দৃষ্টি আমার উপর পড়েছে, সে বাবাকে চোখের ইশারায় আমাকে দেখাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে বাবা আমাকে অনুসন্ধানী ব্যস্ত চোখে খুঁজে বার করার জন্য এদিক ওদিক দৃষ্টি চালনা করছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। আমার আর বাড়ি পালানো হল না।

কেকা, আমি এক রিকশায়, বাবা পিছনে অন্য রিকশায় ফিরে এলাম। আমার মনে তখন চরম বিস্ময়বোধ।

চোখ কান থুতনি গাল নাক গ্রীবা কাঁধ বুক পেট পিঠ কোমর সব এক রকম। পা পায়ের আঙুল, হাত হাতের আঙুল, চোখ চোখের পল্লব হুবহু মিলে যায়। মাথার চুলের রঙ পর্যন্ত এতটুকু পৃথক লাগে না। সমস্ত ছাঁদ, গায়ের রঙ এতই এক যে কেকা আর ময়ূরী যে দু'জন বালিকা তা ভাবতে ভাবতে অন্তরে ক্রমাগত বিস্ময় ঠেলে ঠেলে ওঠে, খুব বিমূঢ় লাগে।

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা কথাটি অনেক শুনেছি, কিন্তু তার এমন দৃষ্টান্ত দেখে প্রকৃতির উপর কিছুতেই প্রসন্ন হতে পারি না। রাগ হয়, ক্ষোভ হয়, কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। অবাক হয়ে কেকার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। পলক পড়তে চায় না। একটু বোধহয় অবুঝের মতো চেয়েছিলাম।

কেকা ভারিক্কি গলায় বলল—কী দেখছ অমন করে?

—তোমাকে।

—এত দেখার কী আছে! বড্ড হ্যাংলার মতো তাকাও।

—তুমি জানো না?

—কী?

—তোমরা দুই বোন দেখতে ...

—মোটেও না।

—তুমি তাহলে ঠিক বুঝতে পার না।

—বাজে কথা বলবে না। একদম বাজে কথা বলবে না।

—আশ্চর্য। দেখতে একরকম হলে দুই রকম বলা যায়।

—আমরা একরকম নই রঙ্গন। আবার যদি বল সেকথা, আমি এখানে থাকব না, চলে যাব। এই জন্যে আসতে চাই না। ইচ্ছে করে না। লোকে ওই কথা বলে আর খুব আনন্দ পায়।

—আমি পাই না।

—তুমি কি পাও না পাও আমি জানতে চাইছি না। বলবে না, ব্যস।

—এইভাবে বলছ।

—হ্যাঁ, বলছি।

বলে রাগে ফুঁসতে থাকল কেকা, নিঃশ্বাসে ওর নাসিকা স্ফীত হয়ে উঠল ঘন ঘন। এত কম বয়েসের ওর মুখে অমন ধারালো কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। প্রবলভাবে সে অস্বীকার করতে চাইছে ময়ূরী আর কেকা দেখতে এক।

মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন। ক্লাস এইটের ছাত্রী কেকা, কিন্তু সে প্রায় মাস্টারনির মতো কথা বলেছিল। ওর তীব্র ঝাঁঝ আমাকে একেবারে বিমূঢ় করে ফেলেছিল। রিকশায় বসে সারাপথ আর একটি কথাও উচ্চারণ করার সাহস হয়নি আমার।

কিন্তু এই ঘটনার আরও একটি জটিল মাত্রা ছিল, ঘটনা ঘটল অদ্ভুত। এক মাসের পুজোর ছুটিতে কেকা এসেছে, এই একমাস বাবা আর মামণির জীবনধারাই বদলে গিয়েছে। অত গম্ভীর বাবুটিকে মাঝে মাঝে হাসতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী মেয়েকে সঙ্গে করে হাজারদুয়ারি দেখে এলেন দুদিন আগে। তিনজনে মিলে 'এক ফুল দো মালি' নামে একটি হিন্দি সিনেমা দেখে ফিরলেন নাইট শো। অর্জুনবাবুকে কখনও সিনেমা দেখতে দেখিনি। ওঁরা ফরাক্কা বাঁধ দেখতেও চলে গেলেন একদিন।

বেরিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা, মামণিকে ডেকে বললাম—মা। রেডি করেছি।

মামণিকে এত সাজতেও কখনও দেখিনি। শাড়ি ব্লাউজ থেকে আলো বার হয়ে মেঝেয় পড়েছে। কাপড়ের রঙ ছড়িয়ে এসে আগুনের ছায়ার মতো লেগেছে মায়ের গলায়, মুখে। মায়ের মুখে একটু চড়া প্রসাধন, কপালে টকটকে লাল বড় টিপ। পায়ে অবধি আলতা। এই দেবপ্রিয়া আমার অচেনা। অলংকার পর্যন্ত পরেছেন গলায়, হাতে।

মামণি সিঁড়ির শেষধাপে নেমে আমার ডাকে থমকে দাঁড়ালেন। ভাবছিলাম, বেড়াতে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, দু' চামচ অন্তত খাইয়ে যাবেন ময়ূরীকে। হাসতে হাসতে নেমে আসছিলেন তিনি, আমার ডাকে ওঁর মুখ ম্লান হয়ে

গেল। ওই মালিন্য একটা ছবি, যা দেখে নিজেকেই অপরাধী মনে হয়।

এক আশ্চর্য অসহায়তা এবং লঘু বিরক্তি ফুটে উঠল সেই ম্লান মুখটায়।

মামণি বললেন—তুমিই ওকে হাতে করে খাইয়ে দাও রঞ্জন। চামচ রেখে দাও।

—তুমি?

—দেখছ না, আমরা যাচ্ছি এক জায়গায়। রাত্রে আসি, তারপর...

এই সময় পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কেকা মাকে স্বল্প ধাক্কা দিয়ে বলল—চল না। দাঁড়িয়ে পড়লে আর নড়তে চাও না। দেরি হয়ে যাচ্ছে না।

—হ্যাঁ, চ। বলে একটা ক্ষীণ শ্বাস একটু স্পষ্ট করে ফেলে মামণি সিঁড়ির শেষধাপ শেষ করে মেঝেয় নামলেন। চলে গেলেন তারপর। বাবু চললেন পিছু পিছু কোঁচা শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে।

ওরা বেরিয়ে চলে গেলে লক্ষ্মীর মা এক চোরা সতর্কতার ভান দেখিয়ে সদরের দোর বন্ধ করে আমার কাছে ছুটে এসে বলল—দেখলি, মায়ের কেমন শখ। খুব চাগিয়েছে।

—কী?

—আহ্লাদ। বলতে যাও, বলবে সব সাধ গেছে লক্ষ্মীর মা। যেই কেকা এল আর অমনি সব সাধ উথলে উঠল। বাইরে বাইরে চেপে চেপে রাখে, বুজলি। মানুষকে দেখায় ওদের কোন সুখ নাই, ঘরে বালাই। ইদিকে মেটাবার বেলা ষোল আনা মিটিয়ে নেয়, গয়না পরা, ঠোঁট রাঙানো, রুজ পর্যন্ত দিয়েছে গালে, পায়ে আলতা, তারপর পথে নেমে হি হি হাসি, সবই করে। বাবুটি গম্ভীর, এদিকে রুমালে সেন্ট ঢেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

—কেকা মাকে জোর করে গয়না পরালো, মামণি পরতে চাইছিল না।

—তুই কী করে জানলি?

—তাই নিয়ে অনেকক্ষণ কথা কাটাকাটি, মুখ ভার করা সবই হল। কেকা চাইলে বাবা মা...

—সেই কথাই তো বলছি তোকে। এখন ওদের মনেও নেই, ওদের আর একটা মেয়ে আছে। মেয়ে চাক ওটা বউদি চায়। কেকা চাইবে আর উনি করবেন। খাও বললে খাবে, পর বললে পরবে, নাচো বললে নাচবে, মাখো বললে মাখবে। নিজে তো করছে না, মেয়ে করাচ্ছে বলে করছে। মানুষ অনেক শখ অন্যের দোহায় দিয়ে করে। যদি ভাবতে বসবি তো ঘেন্নায় মরে

যাবি।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দিদি।

—কী রে?

—আচ্ছা। কেকা আর ময়ূরী, ওরা তো দেখতে শুনতে...

—শুনতে কোথা। দেখতে বল, হ্যাঁ, দেখতে এক রকম। একজন কথা বলে পাঁচ মুখে, অন্যটা পাষাণপ্রতিমে। তাছাড়া তফাত কিসের। এক ছাঁদ, একই আড়া...

—কিন্তু কেকা তা মনে করে না।

—ঘেন্না। বুঝলি? ঘেন্না করে। এক রকম দেখতে হয়েছে বলে কেকার দুঃখের শেষ নেই।

—কেন?

—তা কী করে বলব ভাই। একেবারে সহ্য করতে পারে না।

—ময়ূরীর তো দোষ নেই লক্ষ্মীদিদি।

—সে কথা তুই বলছিস। ওরা বলবে তবে তো।

শুনতে শুনতে মনটা খুবই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। আবার ভয় করছিল, বলতে বলতে লক্ষ্মীর মা ফের বেফাঁস কিছু বলে না বসে। ওর মুখে কোনও আগল নেই জানি। আগল নেই, কিন্তু গুমোর আছে। বলছে সবই, অথচ যেন কিছুই বলছে না, এই রকম একটা ভাব বজায় না রাখতে পারলে ওর যেন কথা বলে সুখ হয় না। তাছাড়া বলতে বলতে এসে আসল কথাটি চেপে যাবে যথাসময়ে, ওইটে ওর গুমোর।

সেদিন ওঁরা তিনজনে ঠাকুর দেখতে বার হয়েছিলেন। লক্ষ্মীর মা রান্নার কাজে ব্যস্ত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে অনেকক্ষণ। আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ে। চাকাওলা গাড়িটা জানালার কাছে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ময়ূরীকে চাঁদ দেখাই। হাঁ করে শিশুরই মতন বিস্ময়মৌনে অপলক ময়ূরী আকাশে চেয়ে থাকে নিবিড় চোখে। ও হাসে, আমার দিকে দেখে আবার আকাশে চোখ মেলে, আনন্দের চাপে ডেকে ওঠে—মা।

—বল, চাঁদ। চাঁদ বল, চাঁদ।

ময়ূরী বোঝার চেষ্টা করে, আমার হাত ধরে, উচ্চারণ করতে পারে না। ও পারছে না বলেই আমার হাত জড়িয়ে ধরতে চাইছে। সারাটা দিন আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। আমার কেন যেন ধারণা হয়েছিল, পাখিকে যেমন বার বার বলে শেখাতে হয়, ওকে একটি কথা সহস্রবার বলে শেখাতে পারি বোধহয়।

পারি আর না পারি আমি চেষ্টা করে যাব। আমার কেমন যেন অনুভূতি হয়, ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে।

এত কাছে, প্রায় সর্বক্ষণ কেউ থাকেনি ওর। এত কথা কেউ বলেনি ওকে। ও শুনতে পায় না ভেবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিছুই শোনানোর চেষ্টা করা হয়নি। দাঁড়াতে পারে না দেখে কেউ আর দাঁড়িয়ে ওঠানোর চেষ্টা করেনি। ওকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে, কত রকমের ডাক্তার দেখেছেন ওকে। নার্সিংহোমে রাখাও হয়েছিল কিছুদিন, ওর জন্যে কিছুই করা হয়নি, তা নয়। তারপর এক সময় অর্জুনবাবুর মনে হয়েছে, ময়ূরীর জন্যে কিছুই আর করার নেই। পরিমল সামন্ত এ বাড়ির ডাক্তার, ওঁর পরামর্শ এখনও নেওয়া হয়। ইদানীং আমিই ওঁর কাছে যাই।

—বুদ্ধির জড়তা কি কখনও দূর হয় না ডাক্তারবাবু ?

—হলে তো হতই রঙ্গন। আবার একেবারে কিছুই হয় না, তা বলা যায় না। তোমার চেষ্টা থাকলে ময়ূরীর বুদ্ধি একটু আধটু খুলবে। ওকে কথা শোনাবে, গান শোনাবে। নানা রকম দৃশ্য দেখাবে। চাই কি খাড়া করে দাঁড় করানোর চেষ্টাও করবে। ও পারবে না, কিন্তু তুমি চেষ্টা করবে, তুমি চাইলে, সে-ও হঠাৎ কখনও চেষ্টা করতে পারে। দ্যাখই না কী হয়।

—ও আলো চিনতে শিখেছে ডাক্তারবাবু। আমাকে সুন্দর চিনতে পারে। কী কথা জানেন, ও আমাকে 'মা' বলে ডাকে।

—তাই নাকি। তাহলেই বোঝো, ইতিমধ্যে ও কথাও বলেছে। মা বলে ডেকেছে মানেই তো ময়ূরী অনেক কথা বলে ফেলেছে। কিন্তু...

—বলুন।

—তোমায় যে মা বলে ডেকেছে ময়ূরী, একথা তোমাতে আমাতে হল। মামণির সামনে কখনও বলবে না একেবারে।

—কেন ?

—ওঁর সারাজীবনের দুঃখ, মা বলে মেয়ে কখনও ডাকল না। উনি কতদিন এই বলে দুঃখ করেন। মায়েদের এটা অনেক বড় দুঃখ রঙ্গন।

—আচ্ছা, বলব না।

—তুমিই ওর মা। মা হল একটা অনুভূতি, সেটা কোনও কোনও পুরুষের মধ্যেও থাকে।

—আমি বুঝতে পারি না।

—যে মা সে কি আর ঠিক ঠিক বোঝে তার অনুভূতি কী, না বুঝেই করে।

ভালবাসার এক একটা ধরন আছে। আমরা গাছপালা ভালবাসি, পাখি ভালবাসি। কারও কারও মধ্যে পাখির প্রতি, গাছের প্রতি বিশেষ ভালবাসা থাকে, প্রকৃতিই তাকে সেই বিশেষ ভালবাসার ক্ষমতা দিয়ে থাকে, এটাকেই আমি ভালবাসার একটা ধরন বলছি। ময়ূরীকে তুমি ভালবেসেছ, ময়ূরী তোমার।

—আমার ?

—হ্যাঁ, আর কারও নয়। যাকে যে ভালবাসে সে তার, যাকে বাসে না, সে তার নয়। ময়ূরী পাখি দেখতে শিখেছে বলে তুমি আনন্দ পাও, চাঁদ দেখতে শিখেছে বলে তোমার আনন্দের সীমা থাকে না। এটাকেই বলে মায়ের ভাব। একে বলে পর্যবেক্ষণের আনন্দ, মায়েদের থাকে। তোমার আছে আর তাই ময়ূরী তোমাকে মা বলে ডেকেছে।

—ময়ূরীর মন আছে, আপনি বলেছেন।

—আছে বইকি। না থাকলে ও কেঁদে ফেলল কেন ? হাসে কেন ! তাই না ?

—আজ্ঞে।

—আলো ! আলো দেখতে পাচ্ছে। সরু মোমবাতি, মোটা মোমবাতি।

—হ্যাঁ।

—আমসত্ত্ব খেয়েছে।

ময়ূরী আমার, আর কারও নয়, এ কথা এত অজস্র উচ্চারণে ক্রমাগত কানে গুঞ্জিত হতে থাকে যে, এক অপার বিস্ময়ে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমি আর কিছুই দেখতে পাই না, শুনতেও পাই না, কিভাবে পথ হাঁটছি দিশা করতে পারি না। ডাক্তারের চেম্বার থেকে হেঁটে আসি একটা ঘোরের মধ্যে। ময়ূরীকে জানালার কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি, শুধু এইটুকু মনে আছে। কিন্তু আর কিছুতেই মনে এল না যে, চাঁদটা জানালার আকাশ থেকে সরে গেলে ময়ূরী কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, আমি লক্ষ্য করি ময়ূরী কষ্ট পাচ্ছে। তখন ওকে চাকাঅলা চেয়ার থেকে নামিয়ে চৌকিতে শুয়ে দিই। এখন সেকথা একদম ভুলে গেছি, মনে হচ্ছে ও এখনও জানালার কাছে বসে আকাশে চেয়ে আছে।

বাড়িতে পৌঁছে দেখি লোডশেডিং হয়ে গেছে। বাড়ি অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। একটা মোম জ্বলছে ডাইনিংয়ে। ময়ূরীর ঘরে সরু একটা মোমবাতি মোমদানিতে টিকটিক করছে। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে ঘরে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই মনে হল, এই বাতাস গায়ে লাগলে ময়ূরীর অসুখ করতে পারে, ওকে জানালার কাছে থেকে সরিয়ে আনা দরকার। ডাক্তারবাবু যে বলেছেন, ময়ূরী চাঁদ দেখতে শিখেছে, ওই একটা কথাই মনে গেঁথে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে ময়ূরী এখনও জানালার কাছে বসে চাঁদ দেখছে। দ্রুত ঢুকে জানালায় চোখ রাখি, চাঁদ নয়, একটি তারা জ্বলজ্বল করছে, খুব স্নিগ্ধ।

হুইল চেয়ারে ওকে দেখতে পাই। গায়ে হাত দিয়ে ডাকি—ময়ূরী! ঠাণ্ডা লাগছে না তোমার?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কেকা আমার গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বলে— ছোটলোক। আমি কেকা, চালাকি কেন করছ। ভারি বদ ছেলে তো তুমি, আমার গায়ে হাত দিয়ে ময়ূরী বলে ডাকো।

বলেই পায়ের জুতোয় খটখট শব্দ তুলে ঘর থেকে বার হয়ে চলে যায়। মনে হচ্ছিল, আমি মাটিতে মিশে গেছি, আর মানুষ নেই। এত ভুল কি করে করলাম, আমার স্মৃতিক্ষমতা কি ময়ূরী কেড়ে নিয়েছে। আমি এতই নির্বোধ হয়ে গেছি। সারারাত আমি আর ঘুমাতে পারিনি।

সারাদিন আমি আর কেকার দিকে চোখ তুলে চাইনি। কথা বলার চেষ্টা করিনি। তীব্র অভিমান হয়েছিল। ও আমায় যে ভুল বুঝেছিল সেকথা ওকে কোনওদিন বলতে পারব না। সেই দিনই পাশের বাড়ির রাঙাবউদি এসে কেকার সামনেই গাওনা গাইতে বসল।

—আহা! একই মুখ, একই চোখ, একই নাক, কান, থুতনি, গলা, একই গড়ন, একই ধরন, সব এক, সবই একাকার, ভগবানের বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না লক্ষ্মীর মা।

লক্ষ্মীর মা রাঙাবউয়ের কথার দোহারকি ধরে—সেই কথা আমরাও বলি ভগবানকে। এ তুমি কী কাণ্ড করেছ মহেশ্বর। সব দিয়েছ, কথাটাই খালি দাওনি। যদি দিতে দুইবোন এক হত, সংসার সুখের হত। কেন করলে না।

—ভগবান কি মানুষের কথা শোনে গো। শোনে না। বলে রাঙাবউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—বাবু কিন্তু চাননি রাঙাদিদি।

—কী?

—কেকার পরে আর কোনও সন্তান হয়। বউদি জিদ ধরলে ছেলে নেবে একটা। ওই জিদ ভগবানের আর সহ্য হল না। নিবি তো নে। এমন জিনিস দিলাম যে সারাজীবন আর কেঁদে বাঁচবি না।

—লোকে বলে লক্ষ্মীর মা, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। কোথায় মানুষের মঙ্গল করেন তিনি ? দেখাও একবার আমাকে।

—করেন না বলছেন দিদি, ওই দেখুন। বলে লক্ষ্মীর মা আমার দিকে চোখের ইশারা করে দেয়। আমি ময়ূরীর নোংরা কাপড়চোপড় কেচে নিয়ে বাথরুম থেকে বার হয়ে আসছিলাম।

রাঙাবউদি আশ্চর্য হয়ে আমাকে দেখছে।

—ওর কথা কেন তুলছ লক্ষ্মীর মা।

—তুলব না ? আমি বাবুকে বলেছিলাম, আমার মাইনের আরও পঞ্চাশটা টাকা বাড়িয়ে দিন, তা সেকথা বাবু কানেই তুলল না। বলেছিলাম, গু-মুত সব করছি যখন তাই করব, একদিন খালি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম নোংরা হাতে রান্নার কাজে সোয়াস্তি হয় না, ব্যস। বদনাম হয়ে গেল আমার।

—রঙ্গনের তাতে দোষ কোথা।

—দোষ তো নাই, গুণের কথাই হচ্ছে। ও যা করে, ও বলেই করে। বলছি, অমন বালাই ঘরে না থাকলে ও বেচারি জুটত কোথা থেকে। মঙ্গল যে করেন না বলছেন, ভগবান রঙ্গনের মঙ্গল করেননি ? শুদু একটা কাজই ওকে দিয়ে হয় না রাঙাদি।

—কী ?

— ওই সেই মেয়েদের বাঁদা অসুখটা... মাসে মাসে। ওটা আমাকেই সামলাতে হচ্ছে। অবশ্যি মেয়ের মা চাকরি কামাই করেও ওইটে হলে মেয়ের কাছে থাকে, শুদু বলে, হায় ভগবান এতই যদি দিলে ওকে কথা কেন দিলে না। তা যেদিন ওটা হল, রঙ্গন বুঝতেই পারেনি, ভাবলে সাংঘাতিক কিছু হয়েছে, মামণির কাছে গিয়ে ভয়ে...

লক্ষ্মীর মায়ের কথা গলায় আটকে গেল সহসা। সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত তীব্র চোখে চেয়ে রয়েছে কেকা। রাঙাবউকে সেদিকে চোখের ইশারা করে লক্ষ্মীর মা। রাঙাবউদি ঘাড় ঘুরিয়ে কেকাকে দেখে নিয়ে ঘোমটার মধ্যে জিভ কাটে। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে— যা, না। দাঁড়িয়ে আছিস কেন। মেয়েদের কথা কান পেতে শুনতে তোর লজ্জা করে না ?

—করে। বলে উঠল কেকা।

—হ্যাঁ বোন, তা তো করবেই। সুখের কথা তো নয়, কষ্টের কথা। মেয়ের কাছে থেকে থেকে রঙ্গনের মেয়ে-স্বভাব হয়েছে। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে ! যাঃ। যা, না। হাঁ করে দেখছিস কি। বলে উঠল রাঙাবউদি।

কেকা বলল— ও যাচ্ছে, তুমি এখন এসো রাঙাবউ, বাবা বললেন। জোরে জোরে কথা বলছ, উপর থেকে সব শোনা যাচ্ছে। শুনতে শুনতে মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাবা বললেন, তুমি রঙ্গন, একবার উপরে আসবে। বলেই কেকা সিঁড়িতে জুতোর শব্দ তুলে উপরে উঠে গেল।

আমার পায়ের তালু সিরসির করে উঠল ভয়ে। তারে ময়ূরীর জামা-জাঙিয়া মেলতে মেলতে হাত কাঁপতে থাকল। কেমন অবশ মনে হচ্ছিল নিজেকে। পা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে চাইছিল না। জানি না উপরে আমার জন্য কোন্ দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে। এখানে কি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে?

দোতলায় রঙ্গন অত্যন্ত শুকনো মুখে এসে দাঁড়ায়। দোরের কাছে। বাবু বসে রয়েছেন একটি ছোট সোফায়, হাতে ইংরিজি খবরের কাগজ, একটি বড় পাতা মেঝেয় পড়ে গিয়ে ফ্যানের হাল্কা হাওয়ায় সরসর করে সরছে একটু একটু, বাবুর চোখে চশমা, ঠোঁটে অসম্ভব গাম্ভীর্য। মামণি খাটে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছেন, চোখ দুটি নিথর হয়ে সিলিংয়ের দিকে বেঁধানো, মনে হচ্ছে চৈতন্য বিবশ হয়ে গেছে। তাঁর মন এই কক্ষে নেই, কষ্টের অর্বুদ প্রহারে হৃদয় ছিন্ন হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

ঘরের একটি কোণে কেকা দাঁড়িয়ে। এদিকে পিঠ করে দেওয়ালের কোণে যেন সে লুকিয়ে পড়েছে। মুখটা কোথায় লুকাবে আর! ভাবছিলাম আমাকে আজ অশেষ অপমান হজম করতে হবে। হতে পারে, আমাকে এঁরা আজ ছাড়িয়ে দেবেন। রঙ্গনকে একবার খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে দেখলেন অর্জুনবাবু। কথা বললেন না। আবার মন দিলেন কাগজের পৃষ্ঠায়।

রঙ্গন দেখে, কেকার পৃষ্ঠদেশ থর-থর করে হঠাৎ কাঁপতে শুরু করেছে। চাপা অদম্য কান্না পিঠের ভূমিতে ছড়িয়ে দিয়েছে তরঙ্গ। এই কান্নাই যথেষ্ট, রাত্রের অপমান যে কী তীব্র হয়েছে, ওই পিঠের দিকে চাইলেই অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ও টের পেয়ে যায়। এবার ফুঁপিয়ে উঠল কেকা। তারপর ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ঘরের কোণে পিঠ ঠেকিয়ে।

দুই চোখ বেয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়ছে। বলে উঠল—বোনের চাকাঅলা চেয়ারে বসে আমি বললাম মা।

মামণির দেহ একটু কাঁপল মাত্র। চোখে একবার পলক পড়ে আবার স্থির হয়ে গেল। অপলক চেয়ে রইলেন ফ্যানের ঘুরন্ত চাকিটার দিকে। বাবা একবার খালি মেয়েকে দেখলেন। তারপর আবার চোখ রাখলেন কাগজের পাতায়।

কেকা ফের বলে উঠল—বোনের আসনে বসে বললাম, ঠাকুর। আমাকে ময়ূরীর মতো করে দাও। আর ওকে আমার মতো করে দাও। রঙ্গন তখন ঘরে ঢুকে আমাকে 'ময়ূরী' বলে ডাকল। আমার প্রার্থনা নষ্ট করে দিল ও। বোন আমার মতো পড়াশুনা করবে, স্কুল যাবে, গান গাইবে, আঁকবে। আমি তো ঠাকুরের কাছে মিথ্যা করে চাইনি।

রঙ্গন একটুখানি সাহস করে বলল—তা হলে তখন তুমি আমাকে অমন করে মারলে কেন ?

কেকা কিছুটা ফুঁসে উঠল—জানি না। কিচ্ছু জানি না যাও। বলে আরও শব্দ করে কেঁদে ফেলল সে। তারপর বলল— তোমাকে মেরেছি বলে আমার বুঝি লাগেনি।

অদ্ভুত এই মন। আশ্চর্য জটিল ওই কান্নার উৎস-ভূমিকা। কেন মারে জানে না, কেন কেঁদে ওঠে তা-ও বুঝতে পারে না ; যা সে হতে চায়, ঠিক তাই বলে তাকে ডাকলেও সহ্য করতে পারে না।

—রাঙাবউ নাগাড়ে বলে যাচ্ছে। বোনের আর আমার ডেসক্রিপশন। ভগবানের দোহায় দিচ্ছে খালি, আমরা বুঝি ভগবানকে ডাকি না। এতই খারাপ আমরা।

বলে রুদ্ধস্বরে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইল কেকা। হাতের উল্টো পৃষ্ঠায় চোখ মুছতে লাগল।

এদের অসহায়তা দেখে মনে হচ্ছিল, এরা বুঝি ময়ূরীর চেয়েও অসহায়। রঙ্গন আর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সহসা কেকা বাইরে ছুটে চলে গেল।

হঠাৎ বাবা কাগজের পৃষ্ঠায় চোখ রেখেই বললেন— কালই তোমাকে হস্টেলে রেখে আসব ভাবছি। এখানে থাকলে তুমিও সুস্থ থাকবে না। মনে হচ্ছে, রঙ্গনকে দিয়ে ময়ূরীর সমস্ত কাজ করানো ঠিক হচ্ছে না। ও ভাল মনেই করছে, কিন্তু কেকার মনে একটা কেমন...

বলে কোণের দিকে চেয়ে দেখে অর্জুনবাবু ফের চুপ করে যাওয়ার আগে বললেন—যাক গে! কেকা প্রসন্ন মনে না নিতে পারলে আমরা কী করব। পরিমলকে ঘটনাটা বলতে হবে। শোন রঙ্গন! লক্ষ্মীর মা রান্না নিয়ে আছে থাক বা সে চলে যেতে পারে। আমরা একটা নতুন কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করেছি। কাল সকালে সে আসবে।

—আমি কি তা হলে চলে যাব বাবু।

—না, না। তুমি থাকবে। শুধু ময়ূরীর ঘরে আর যেতে হবে না তোমাকে। যাও।

রঙ্গন আর কোনও কথা বলার সাহস করল না। ঘাড়গুঁজে চলে আসবে এমন সময় দেবপ্রিয়া কাত হয়ে এদিকে চাইলেন, ওঁর চোখে অশ্রু ছলছল করছে। ধরা গলায় ডাকলেন— দাঁড়াও। এদিকে এসো। কাছে এসো।

রঙ্গন আড়ষ্টভাবে কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মামণি বললেন—তুমি রাগ করলে না তো।

সেদিন বুঝিনি, কিন্তু অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম, ময়ূরীর জন্য আমাকে যেভাবে যা করতে হয়, সেই সমস্ত দৃশ্য, অত্যন্ত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা, ওই সব স্পর্শ, ওই ধরনের সংলগ্নতা কেকা মোটেও সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ মনে হয়েছিল, মেয়ে বলেই পারে না, ও দেখতে ময়ূরীর মতো বলেই পারে না। কেকাকে শুধু আমার জটিলই মনে হয়নি, অদ্ভুত জটিল মনে হয়েছিল। তার জটিলতা আরও পরিপক্ক হয়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে রঙ্গনের কেবলই মনে হচ্ছিল, কেকার মনে প্রসন্নতা নেই, ও এখানে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে, এই সব গুরুতর কথা বাবা রঙ্গনের সামনে না বললেই পারতেন। শুধু তাই-ই নয় কেকার এই মনোভাবের কথা তিনি ডাক্তার পরিমল সামন্তকে পর্যন্ত জানাতে চান। রঙ্গনের জীবন-কাহিনী অতঃপর এক জটিল আবর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। সে ভাবে, মামণি অমন সুরে কাছে ডেকে 'রাগ করলে না তো' বললেন কেন? ওই কথা রঙ্গনের মধ্যে কতকগুলি লজ্জা, দ্বিধা, সংশয়জড়িত বোধের জন্ম দেয়। সে ভাবতে শেখে, ময়ূরী তাকে মা বলে ডাকলেও সে নারী নয়, পুরুষ। ময়ূরী জড়পিণ্ড হলেও মেয়ে, তার ঋতু হয়। ময়ূরীর মনে নারীর আর্বিভাব না ঘটলেও, দেহে রমণী এসেছে। কেকা সব বোঝে। তাই সে রঙ্গনের স্পর্শ, ময়ূরী-সান্নিধ্য সইতে পারে না। আজ থেকে রঙ্গন আর ময়ূরীর ঘরে যেতে পারবে না। ডাক্তার যে বলেছিলেন, ময়ূরী তার, আর কারও নয়, এ শুধু ভাবের কথা, কেকা শুধু তার অব্যক্ত অপ্রসন্নতা দিয়ে সেই সাজানো কথাকে নাকচ করে দিয়েছে।

কেকার অপ্রসন্ন মুখের দিকে একবারও চোখ তুলে চাইতে পারে না রঙ্গন। ঘাড়গুঁজে কাজ করে যায়। লজ্জায় এবং গভীর অভিমানে সে ময়ূরীর দোরের চৌকাঠ মাড়ানো দূরে থাক, ঘরের ওদিকেই আর যায় না।

কাজের নতুন মেয়ে আসে। খেজুরিয়া থেকে। নামটি খাসা, দোয়েলা।

প্রচণ্ড ভাল স্বাস্থ্য, পায়ের পাতা ভারি, মস্ত লম্বা পা, বেশ উচ্চতা, গায়ের রঙ কালো, মুখমণ্ডল গোল ছাঁদের, নাকটা ছোট এবং চাপা, কিন্তু স্বাস্থ্যের জোরে দেখায় সুন্দর, চলাফেরায় চাপল্য আছে, গলার স্বরটি মোটা, মুখের দিকে না চেয়ে শুনলে মনে হয়, ব্যাটাছেলে কথা বলছে।

সে আসামাত্র সেই দিনই বিকেলে রতনকে আঁচলধরা করে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মীর মা বলল—তা হলে আসি বউদি। অন্যখানে আমার কাজ বাঁধা, কষ্ট করে জোটাতে হবে না।

মামণি বললেন—তোমায় তো আমি যেতে বলিনি লক্ষ্মীর মা!

—বলনি কী গো! বলা নেই, কওয়া নেই, নতুন লোক এসে হাজির। তা এনেছ, ভালই করেছ। আবার যখন ডাকবে আসব। দ্যাক, কদিন থাকে। তা বলে রঙ্গনকে তাড়িয়ে দিও না, বিপদে পড়বে।

মামণি কতবার বললেন, তবু লক্ষ্মীর মা থাকল না।

সেদিন দুপুরে ডাক্তার সামন্ত আসেন বাড়িতে, দোতলায় বাবুর সঙ্গে কী কথা হল রঙ্গন জানে না। দোয়েলাকে মন লাগিয়ে কাজ করতে বলে অর্জুনবাবু কেকাকে রাখতে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। যাওয়ার সময় কেকা রঙ্গনের কাছে এগিয়ে এল, দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। চেয়ে রইল রঙ্গনের মুখের দিকে। রঙ্গন মাথা নিচু করে রইল, মুখ তুলল না।

—যাচ্ছি। ছোট্ট এইটুকু ঘোষণা করে কেকা ভাবল রঙ্গন নিশ্চয়ই তাকে চেয়ে দেখবে। রঙ্গন আরও মাথা নিচু করল, মুখ তুলল না।

মামণি বললেন—কেকা শান্তিনিকেতন চলে যাচ্ছে, তুমি কথা বল। রঙ্গন তবু চুপ করে রইল।

নির্বিকার এই নৈঃশব্দ্যের কথা ভেবে অর্জুনবাবু অসোয়াস্তির সুরে বললেন— রঙ্গন রাগ করে আছে। চ কেকা আমরা যাই।

কেকা ঈষৎ অভিমানের গলায় বলল—আমি আর আসব না কখনও। ও এত শয়তান জানতাম না। ও শোধ নিচ্ছে, জানো বাবা। অ্যাই, কথা বলবে না!

রঙ্গন নিঃশব্দে মাথা নাড়তে থাকে, কথা বলে না।

—আমার বয়ে গেছে! ভারি তো লোক, তাই কথা না বললে আমি বুঝি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসব। মোটেও না। মোটেও না। মোটেও না। বলতে বলতে ছুটে যায় সদরদোরের দিকে কেকা, ওর গলা অলক্ষ্য কান্নায় ভিজে আসে। রঙ্গন বুঝতে পারে না, কেকা কেন অমন করে কথা বলছে

চাইছিল। ফের অত কান্নারই বা কী আছে, রাগে নিশ্চয়ই চোখে জল এসে গেছে। বড়লোকের মেয়েরা ক্রোধে কেঁদে ফেলে।

সকালের দিকেই বার হয়ে গেল বাপ আর মেয়ে, দুপুরেই বিপত্তি দেখা দিল। ময়ূরী কিছুতেই ভাত মুখে নেয় না। দোয়েলা ঘাবড়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে সে। অসম্ভব জিদ করছে। খাবে না, খাবে না কিছুতেই খাবে না। দাঁত চেপে অদ্ভুত দুর্বোধ্য আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে। চোখ দিয়ে ঠেলে জল বেরিয়ে আসছে।

আশ্চর্য কষ্টে ছটফট করছে ময়ূরী। চেকাঅলা গাড়িতে তাকে বসানো হয়েছে, তাকে স্নানও করিয়ে দিয়েছিল দোয়েলা, জামা-জাঙিয়া পরিয়ে দিয়েছিল, চুল আঁচড়ে পাউডার মাখিয়ে, লাল টিপ এঁকে দিয়েছিল। অসামান্য সুন্দর দেখাচ্ছিল ময়ূরীকে। মামণি তাকে দু চামচ খাইয়ে দিয়েছেন। তারপরই যেই দোয়েলা ভাতের থালা ধরে হাতে করে গ্রাস তুলে ময়ূরীর মুখে এগিয়ে ধরল, ময়ূরীর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

দোয়েলা ডাকল—তোমার মেয়ে ভাত মুখে নিচ্ছে না দিদি। দেখে যাও।

মামণি নেমে এসে ময়ূরীকে সোহাগ করে বললেন—অমন করে না মা! নাও, খেয়ে নাও।

শুনল না ময়ূরী। মুখ টেনে ঘাড় কাত করে গাড়ির আসন, যা দেখতে চেয়ারের মতন, গোল, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেতের চেয়ারের মতন, তার একদিকে মাথা সরিয়ে নিলে। ওর ঘাড় চেয়ারের বেড়ের উপর পড়ে রইল চিৎ হয়ে।

মামণি এবার নিজে হাতে থালা ধরে ময়ূরীকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। পারেন না।

—নাও। আমি দিচ্ছি তোমাকে।

নেয় না ময়ূরী। মামণির হাজার তোষামোদ, অজস্র অনুনয়, গভীর প্রার্থনা কবুল করল না সে।

—নিবি না! তোর কী হয়েছে মুখপুড়ি! আমাকে আর কত জ্বালাবি তুই? হায় ভগবান আর কত শাস্তি দেবে আমাকে। শুকিয়ে মরবি! মর, মর, মর! তাই মর। কেন আছিস।

কেন আছে, ময়ূরী কি জানত। মামণির আর্তনাদ শুনে মনে হত, ময়ূরী নয়, তিনি তাঁর নিজের বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজছেন। যত বারই তিনি 'কেন আছিস' বলে আর্তচিৎকার করতেন, মনে হত তিনি তাঁর আপন বুক বিদীর্ণ করে কাঁদছেন। সইতে পারত না রঙ্গন।

রঙ্গন নিজেকে প্রশ্ন করত, কেন আছ এখানে ? চলে যাও। তুমি থাকলে বার বার ময়ূরী তোমাকে চাইবে, তুমিও যেতে চাইবে ময়ূরীর কাছে। দেবপ্রিয়া এবং তাঁর স্বামী মনের মতো কাজের মেয়ে কখনওই পাবেন না, দু দিন থাকবে, তারপর চলে যাবে।

দোয়েলাও দু দিন পর কাউকে কিছু না বলে চলে গেল। তার হাতে খেতে চাইল না ময়ূরী। এমনকি মামণি অনুভব করলেন, ময়ূরীর মন বলে একটা বস্তু আছে এবং সে তার পছন্দ অপছন্দ বোঝে। অবোধ যে মন চায়, সেইভাবে সে রঙ্গনকে নির্লজ্জের মতো চাইছে।

ফিরিয়ে আনা হল লক্ষ্মীর মাকে। এসেই সগর্বে মন্তব্য করল—সবই সে জানত।

মামণি বলল— বুঝিনি লক্ষ্মীর মা।

লক্ষ্মীর মা বলল—তা কেন বুঝবে। দেখেও তো দ্যাখনি অ্যাদ্দিন, সামলাও এখন কীভাবে সামলাবে। মেয়ে তোমার যাকে পছন্দ করেছে, তাকে তো তুমি তাড়াতে পার না বউদি।

—আমার সর্বনাশ হল লক্ষ্মীর মা।

—কেন সর্বনাশ ভাবছ! পরিমল ডাক্তার কী বলেছে তোমাকে! রঙ্গন চলে গেলে ময়ূরীকে বাঁচানো কঠিন হবে। আমিই না হয় সব দায়িত্ব নিতাম আগের মতো, কিন্তু বললেই তো হবে না এখন। ডাক্তারের কথা শুনতে হবে। অবুঝকে কেন অবুঝ ভাবতে পার না। এ কি আর প্রেম-ভালবাসা মনে করছ নাকি। কেকার মতো তুমিও অবুঝ হলে দেখছি! নাও, আর ছেলেমানুষী কর না।

—এ তবে কী, লক্ষ্মীর মা।

—ওব্যেস! টান। যার হাতে খায়, তার হাতে খাবে। যাকে ছোঁয়, তাকে ছোঁবে। শোনোনি, ডাক্তার বলছিল।

ময়ূরী এবং আমার সম্পর্ক দেবপ্রিয়া বুঝতে পারবেন কেন ? লক্ষ্মীর মা বলেছে, অভ্যেস। বলেছে টান।

কী বিচিত্র এই সম্বন্ধ! ময়ূরীকে আমি অভ্যাসের বশবর্তী করি। যথা সময়ে খাওয়ানো, নির্দিষ্ট সময়ে স্নান করানো। যথাসময়ে ঘুম দেওয়া। ঠিক সময়ে জেগে ওঠে ময়ূরী।

—মা! নীচে এসো একবার।

মামণি আসেন।

—ওকে কমোডে বসিয়ে দাও ।

গাড়িটা ঠেলে বাথরুম-ল্যাট্রিনের দোর পর্যন্ত নিয়ে যাই । তখন প্রত্যূষ । মামণি লক্ষ্মীর মায়ের সাহায্যে ময়ূরীকে বাথরুমে ঢোকায় । শৌচ, স্নান করিয়ে তুলে আনেন পোশাক পরিয়ে নিয়ে । তারপর আমাকে ছেড়ে দেন । ওর চুল আঁচড়ে দিই আমি । ব্রেকফাস্ট আমার হাতে খেতে চায় ময়ূরী । ও এখন একটু একটু দাঁড়াতে পারে কাঁপতে কাঁপতে । ওকে হাত ধরে এক ধাপ হাঁটাতে পারি ।

একদিন ডাক্তার সামন্ত এসে মামণিকে বললেন—শোন দেবপ্রিয়া ! ভেবে দ্যাখো, ময়ূরী আসলে তোমার কেউ নয় । 'আমার মেয়ে' ; এই কথাটি তোমাকে ভুলতে হবে । ওকে মেরে ফেলতে পার না, তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় । সে কোনও দিন তোমাকে মা বলে ডাকবে না । তোমাদের সে চিনতেও চায় না ।

—বুঝতে পারি, কিন্তু মন যে মানে না ! কেকা অমন কেন করে !

—কিছুই করে না । ও রকম হয় ।

—কেন ?

—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না দেবপ্রিয়া । তবে একথা ঠিক, ময়ূরীকে কেকা অত্যন্ত ভালবাসে । এবং সেটা ওর মধ্যে মাঝে মাঝে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটায় ।

—কী হবে ! ভীষণ শঙ্কায় দেবপ্রিয়া বলে ওঠেন ।

কী হবে, আমিও জানি না । আমি আরও একদিন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, পারি না ।

মা এসেছিল, আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলি মায়ের সামনে । ওর আঁচলে চেপে ধরি নিজের চোখ দুটি ।

॥ তিন ॥

গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে কেকা চার দিনের বেশি থাকল না । সেই চার দিন আমি খুব সর্তক থেকেছি । ময়ূরীকে আমি যখন খাইয়ে দিচ্ছি হাতে করে, কেকা দুয়োরের চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত প্রখর চোখে চেয়ে রয়েছে এদিকে । আমি ওই দৃষ্টিটাকে উপেক্ষা করি মনের জোরে ।

ওর দৃষ্টি আমার কাঁধে এসে বর্শার মতো বিঁধছে । মনে হচ্ছে ওর গরম

নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি টের পাচ্ছি। আমার কানের ঝুলন্ত অংশটুকু, কানের লতা সিরসির করছে। কী অসম্ভব তার জোরের দৃষ্টি, কী তীব্র।

হঠাৎ কথা বলে কেকা—মায়ের মতো পার না ?

—কী

—চামচ দিয়ে খাওয়াতে।

যখন ময়ূরীকে খাওয়াচ্ছি, ও আমার বাঁ হাত দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। একটি লম্বা চৌপায়ার উপর ভাতের থালা রেখে, তা থেকে গ্রাস তুলে দিই। সহসা ঘরে ঢুকে এসে কেকা ময়ূরীর হাত জোড়া আমার অবলম্বন থেকে ছাড়িয়ে দেয়। তারপর যত্ন করে হাত দু'খানিকে ময়ূরীর কোলে রাখে।

ময়ূরীর চোখ দু'টি প্রথমে বিমূঢ়, পরে বিরক্তিতে অপ্রসন্ন এবং অভিমানে ধারালো হয়ে ওঠে।

—আচ্ছা, আচ্ছা! বলে কেকা হাতদু'টি তুলে আমার হাতে চাপিয়ে দেয় আবার।

—নে। হল তো। বাবা, রাগ করতেও শিখেছে। অ্যাই, সব তুমি শিখিয়েছ ওকে।

—ভালই তো!

—মোটেও ভাল নয়। ঠিক আছে আর খাওয়াতে হবে না। অত ঠেসে ঠেসে খাওয়াও কেন! সব ব্যাপারে তোমার বাড়াবাড়ি।

—কিসের!

—সব ব্যাপারে। আমাকে হলে তুমি পারতে।

—কী ?

—এভাবে, জোর করে। ও কথা বলতে পারে না, এইটে তোমার সুযোগ।

—ঠিক আছে, তুমি তাহলে খাওয়াও। বলে চৌপায়ায় থালা রেখে আমি বাইরে এসে বেসিনে হাত ধুয়ে ফেলি।

অত্যন্ত লেগেছিল আমার। আমি ছাদের উপর চলে আসি। ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকি। মনে হচ্ছিল আর বুঝি পারব না। কেকা আমাকে টিকতে দেবে না।

নীচে চেয়ে দেখি ছোট ছোট পেঁপেগাছগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো পাখি, টুনটুনি। নেচে নেচে ফিরছে। কী আনন্দে আছে এরা। কোথায় কোথায় ওরা চলে যায়। ছোট ছোট ডানা মেলে ওড়ে। অত ক্ষুদ্র তবু ওদের কেউ বন্দী করতে পারেনি। আমার বন্দিত্ব আমারই নিজের দোষে। কোনও কাজ

শিখিনি। বহির্জগৎ কী লীলা চঞ্চল, কী কর্মব্যস্ত! বাইরের জগতে কেউ যদি আমায় ঠেলে ফেলে দেয়, আমি সেখানে গিয়ে কী করব। পৃথিবীর কোনও কাজেরই কি যোগ্য আমি ?

সবাই ভাবে, ময়ূরী কত অক্ষম। কিন্তু আমি ? তার কাছে থেকে থেকে আমিও কি জড়পিণ্ডে পরিণত হইনি ? তার সেবা করা ছাড়া আর কী যোগ্যতা অর্জন করেছি ? কর্মব্যস্ত জগতের সামান্য ধাক্কাও কি সামাল দিতে পারব ? এত অসুবিধা, তবু মামণি তো কই চাকরি ছাড়লেন না ? একবার যে পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছে সে কি ঘরে এসে বন্দী হতে পারে ? একটি জড়পিণ্ডকে ভালবেসে কেউ কি বন্দিত্ব চাইবে ?

আমি কেন তবে পড়ে আছি ? নিশ্চয় কোনও স্বার্থ আছে আমার। কী সেই স্বার্থ ? আমার ভেতরের মাতৃগুণ কি একটা কল্পনা নয় ? বই পড়ে জেনেছি, আজকাল মেয়েরা মাতৃবন্দনাকেও গুরুত্ব দেয় না। মাতৃত্বের বন্ধনকেও তারা নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করে। নারীসত্তা থেকে মাতৃসত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতেও তারা দ্বিধা করে না।

অবশ্য এসব কথা আমার অনেক পরে উপলব্ধি হয়েছিল। তখন আমি সর্বাঙ্গে জড়তা অনুভব করি, ডানা ছিল, কিন্তু তা মেলবার কৌশল ভুলে গেছি। খাঁচাবন্দী পাখি হঠাৎ একদিন ছাড়া পেয়েও যেমন উড়ে পালাতে পারে না, আমিও দেখি আমার সাহস চলে গেছে, আমি আর উড়তে পারি না। কেকা আমাকে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে, আমি ঘাড় গুঁজে কাতরাই, বিদ্ধ হই বারবার। ভাবি, ময়ূরীকে একদিন গলা টিপে শেষ করে দেব। ও কথা বলতে পারে না, এইটে আমার সুযোগ। ঠিক কথা কেকা।

আমি এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে, যখন প্রকাণ্ড জানালা বয়ে জ্যোৎস্না এসে মেঝেয় পড়ে এক তীব্র মাদকতা ছড়িয়ে দিয়েছে, বাতাসে হাস্নুহেনার গন্ধ, হিম স্তব্ধ প্রকৃতি বাতাসে কেঁপে উঠছে, ফিসফিস করছে আকাশ-পরীরা তখন হঠাৎ মনে হল, এই তো সুযোগ, শেষ করে দিই।

ক্লাশ টেনে পড়ছে কেকা। পূজার ছুটির পর ওর ফাইন্যাল পরীক্ষা। বাড়ি এসে রয়েছে এখন। উপরে জানালা খুলে দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মা ও মেয়ে। বাতাস বইছে মৃদু স্বরে, ফিন ফুটছে জ্যোৎস্নায়। লক্ষ্মীর মা রতনকে নিয়ে ওদিকের ঘরে নিঁদে আত্মহারা। তিনতলায় বাবা কী করছেন জানি না।

রঙ্গন ভাবল, এই তো সুযোগ। ময়ূরীর গলার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় সে। চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে রয়েছে ময়ূরী। রাত দশটায় কেকা মায়ের সঙ্গে

ঘুমিয়ে পড়েছে, ভোররাতে পরীক্ষার পড়া করতে জেগে উঠবে, মামণি ডেকে দেবেন। একটু আগে বাবা ফিরে এসে তিনতলায় উঠে পড়েছেন।

রঙ্গন ভাবল, কেন আছে ময়ূরী। একটু ঝুঁকে দেখল আসনের বেড়ে মাথা ফেলে চোখ বুঁজে রয়েছে বোবা মেয়ে। ঘুমে রয়েছে মনে করে রঙ্গন গলায় হাত দেয়।

ময়ূরী হঠাৎ চোখ খুলে আশ্চর্য চোখে রঙ্গনকে দেখে। ধীরে ধীরে নিজের হাত তুলে রঙ্গনের হাতের উপর রাখে। এই জ্যোৎস্না রাতে সেই অবোধ প্রাণে যেন বোধের জন্ম হয়। আগে ঠিক মতন হাত তুলতে পারত না, এখন অনেকটাই পারে ময়ূরী। বয়স বেড়েছে তার, বোধও কোনও প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষায় ঈষৎ স্বচ্ছ হয়েছে। প্রকৃতি কখন কী করছে কার মধ্যে, অপরিণাম বুদ্ধির অভ্যন্তরে কী কৌতূহল সে বিস্ফারিত করে দেয়, শুধু জাগতিক বিদ্যা তার সবখানি অনায়াসে বুঝে নিতে পারে না। প্রকৃতির রহস্য এতই বিপুল আর সূক্ষ্ম যে, অবোধ প্রাণে তার সব আলোড়ন হামেশা বোঝা যায় না।

ময়ূরী ডেকে উঠল—মা!

তারপর সে রঙ্গনের হাতটা নিজের বুকের দিকে ঠেলে নামিয়ে প্রস্ফুটিত নিশিপদ্মে, তার উষ্ণমাংসে, বুকে চেপে ধরল, মুখে শব্দ করল অদ্ভুত। তার প্রগাঢ় শ্বাস কেঁপে উঠল।

সেই অভিজ্ঞতা অপূর্ব। সেই অভিজ্ঞতা রঙ্গনকে হত-চকিত, বিহ্বল করে। একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় রঙ্গনের সারা দেহে। তার মনে আশ্চর্য আনন্দ আর বেদনা এবং গভীর লজ্জা একাকার হয়ে ঢেউ তোলে। তখন মনে হয়, ময়ূরীর দেহটাই রঙ্গনের স্বার্থ, দেহের প্রতিটি অংশে তার অধিকার ময়ূরী স্বীকার করে, এই অধিকারবোধ রঙ্গনের সমস্ত দুর্গতির কারণ।

ময়ূরীর দেহ ময়ূরীর শত্রু কিনা রঙ্গন জানে না। আপন মাংসে নারীর বৈরিতা থাকে। সেই দেহই এখন রঙ্গনের বিপজ্জনক মনে হয়। সকল অনুভূতিই যার কাছে দুর্বোধ্য, সে কেন এমন করল। মানুষ নও, অথচ মানুষের বাসনা কেন তোমাকে পেয়ে বসে। মানুষের মতো খাও, পরো কেন! মানুষের আদি রিপু কেন তোমাতে বর্তায়, বসন্ত কেন তোমার দেহে সুদূর দিগন্ত থেকে বার্তা বয়ে আনে!

যার কোন নিজস্ব প্রেমানুভূতি নেই সে কেন অন্যকে প্রেমিক করে তোলে। যার মনে পাপ নেই, সে কেন অন্যকে পাপী করে দেয়? তোমার কোমল দেহে রঙ্গনের স্পর্শ কি শুধুমাত্র মায়ের ছোঁয়া! শুধু কি চাকরের সেবা? ডাক্তার

বলেছেন, তুমি আমার।

উপরে উঠে গিয়ে কেকাকে বলতে ইচ্ছে করে, কেন তুমি আমাকে এভাবে বাধা দেবে ?

কিন্তু এই দৃশ্য যদি কেউ দেখে ফেলে ! রঙ্গন তার হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখে, ময়ূরী ওভাবে তাকে আঁকড়ে থাকতে চাইছে। দুখানি দুর্বল হাতের সাহস যে এমনভাবে দেহের সমস্ত বলকে জড়ো করেছে, ভাবতে পারে না রঙ্গন।

—ছাড়ো ! লক্ষ্মীমেয়ে ছেড়ে দাও ! বলে কাতরস্বরে অনুনয় করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা যে না করি তা নয়।

হঠাৎ দুয়োরে ও কার ছায়া। চমকে উঠে দেখি, লক্ষ্মীর মা দাঁড়িয়ে।

—ও কী করছ রঙ্গন।

—দিদি !

—ছিঃ !

গা কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। দুর্বোধ্য ভয়ে আমি কেমন কুঁকড়ে গেলাম। লক্ষ্মীর মায়ের ছায়া সরে গেল। অনেকক্ষণ খোলা দোরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, কই কেউ তো আসেনি, লক্ষ্মীর মা ঘুমিয়ে রয়েছে, ওর নাক ডাকছে।

এভাবে এ হৃদয় কত অসহায় বুঝতে পারি। আমি কি কোনও খারাপ ছেলে ময়ূরী ! লক্ষ্মীর মাকে কেন ওভাবে এতরাতে দুয়োরে দাঁড়াতে দেখি। ও কেন ছিঃ বলে ঘৃণায় চমকে উঠল।

না। কেউ আমায় ঘৃণা করছে না। কেউ আমাদের দেখে ফেলেনি। ময়ূরীর ঠোঁট আশ্চর্য মুগ্ধ, ওর দু'চোখে একটি কালো নদী জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে। ওর চুলে আমি জবাকুসুম তেল মাখিয়ে দিয়েছি। ওর গলায় ঢেলেছি সুগন্ধ পাউডার, ওর গালে ক্রিম মাখিয়ে ঘষে ঘষে এনেছি যৌবনের অবাক সৌরভ আর উদ্বেল সৌন্দর্য, ও হেসে উঠলে দেখি পবিত্র তার হাসি, মনে হয় হাসির এই শুচিতা সে তার নিষ্পাপ যৌবন থেকে কুড়িয়ে তুলেছে মুখে, তার যৌনতা হরিণীর মতো জ্যোৎস্নার শিশিরে চমকে ওঠে।

এ কবিত্বের কোনও ক্ষমা নেই জানি। পৃথিবী আমার এই দুরাচার সহ্য করবে না। এই অবস্থায় যদি লক্ষ্মীর মা সত্যিই দেখে ফেলত, কী অবিশ্বাসের কাজ হত বলতে পারি না।

মামণি প্রায়ই বলেন—ময়ূরী তোমার বোন। ওকে দেখলে ভগবান তোমাকে দেখবেন।

এসবকথার মধ্যে যে সব ভাবের ইঙ্গিত থাকে, একদিন আমি সমস্ত বুঝতে পারি। আমি যদি তাই-ই হই, ময়ূরীর দাদা হই, তবে কেকার আচরণ অমন হয় কেন ? কেকার দুর্বোধ্য আচরণ দেখে অর্জুনবাবু তাকে শান্তিনিকেতনে রেখে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভগবান এই সব দেখেন না ?

আমাকে ময়ূরী মা বলে ডেকে আজ যা করল, ভগবান তা কি দেখতে পান না ? দেবপ্রিয়া যাকে বোন বলেন, ঈশ্বর তো তাকে আমার জন্য তেমন করেননি !

ডাক্তার সামন্ত তো কখনও কোনও মিথ্যা অনুশাসনে বাঁধেননি আমাকে ? তোমরা বাবা মা, অথচ নাম মাত্র এই পরিচয় ময়ূরীর জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়, পয়সা দাও আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, উপায় নেই বলে ফের আগের মতো বহাল হয়েছি আমি। জানি, এখনও তোমরা কাজের মেয়ে খুঁজছ। আসল ব্যাপারটি হল আমি চাকর। আজ আছি, কাল নেই।

তোমরা পয়সা দাও, আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, মানুষকে এভাবে সন্তুষ্ট করা যে যায় না, তা-ও তোমরা বুঝতে চাও না।

আমি শুধু মা নই, ভাই নই, আমি ময়ূরীর সর্বস্ব। আমি তার বয়ঃসন্ধির প্রতিটি রোমোদ্গম দেখেছি।

হঠাৎ আমি পাগলের মতো তেতলায় উঠে আসি সেই রাতে। আমি বলতে চাই। কী বলতে চাই ? অর্জুনবাবুর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে। কী সেই বোঝাপড়া ?

দেখুন, এখানে আমি অনেক দিন আছি। কোনও কাজ শিখতে পারিনি। আমি এই পৃথিবীর যোগ্য নই। আজ যদি তাড়িয়ে দেন, কোথায় যাব ? আমার বয়স হচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎ কী ?

দোতলা পেরিয়ে এই প্রথম আমি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছি। কখনও দেখিনি তিনতলার ছোট ঘরখানি দেখতে কেমন।

ক্রমশ আমি বুঝতে পারছি এঁরা আমাকে রাখবেন না। একদিন না একদিন কোনও ছুতোয় তাড়িয়ে দেবেন। কেন না চোখের সামনে ময়ূরীর প্রস্ফুটিত দেহ ক্রমান্বয়ে এক বিপজ্জনক অস্তিত্বে জেগে উঠছে। জড়পিণ্ডে যৌবন এলে তাকেও কেউ বিশ্বাস করে না। অবোধের যৌবন বুঝি আরও ভয়াবহ।

একটার পর একটা সিঁড়ি ভাঙছি আমি। হঠাৎ ভয় করে ওঠে মনটা। কী অবস্থায় তাঁকে দেখব ? কী করেন তিনি এত রাতে ? মামণি পর্যন্ত এই তিনতলায় আসেন না কেন ?

লক্ষ্মীর মা বলেছে, মানুষ বাইরে এক, ভিতরে আর এক। বাইরের অর্জুনকে আমি দেখি, চিনি বলতে পারি না। কিন্তু ভিতরের অর্জুনকে কখনও দেখিনি। তিনতলায় কি সেই ভেতরের অর্জুন থাকেন ? তিনি কি খুব ভয়ংকর।

দেখুন, আপনি যেমনই হোন, আমাকে আমার কথা বলতে হবে। আমি একটা হিসেব বুঝে নিতে চাই। আমার ওই দু'শ টাকা মাইনে যথেষ্ট নয়। ওটা হাজার টাকা হওয়া দরকার।

আমার নামে ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে মাসে মাসে কিছু টাকা ওখানে জমা করবেন বলে ছিলেন, কই কিছুই তো করেননি। লেখাপড়া শেখাবেন বলেছিলেন, শেখাননি।

এখানে শস্তায় শ্রমিক এবং সেবাদাস পাওয়া যায় আপনি জানেন। সেই সেবাদাস কি তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারে না ? জানি, আপনি এইসব অবান্তর কথায় হাসবেন। ময়ূরীরও একটি ভবিষ্যৎ আছে। কোনও প্রতিষ্ঠানে তাকে রাখার কথা আপনারা ভেবেছিলেন, উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু এই দেশে এমন জড়বুদ্ধি মানুষের জন্য তেমন ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। তাই বলে আপনারা চুপ করে বসে নেই। অর্থ জমাচ্ছেন ময়ূরীর জন্য। অনেক সময় সবই আপনাদের অর্থহীন মনে হয়, তবু মেয়ের জন্য আপনারা ভাবেন, এ কথা সত্য।

কিন্তু আমি ? আমার কী হবে ? ময়ূরী আমার বললেই কি আমার হয় ডাক্তারবাবু ? হয় না। আমি আমিই। আমার কথা সত্যি কেউ ভাবে না। ক্রমে ক্রমে আমি জড়পিণ্ডে পরিণত হই। আমার প্রাণ আছে, যৌবন এসেছে দেহে, বিপজ্জনক এই রাত্রি। আমি বুঝি কত নির্বোধ হলে মানুষ এখানে পড়ে থাকতে পারে।

তিনতলায় উঠে এসে ছোট ঘরখানি দেখতে পাই। ঘরখানি যথেষ্টই ছোট। একটি ছোট জানালা সিঁড়ির শেষে পৌঁছে মাথার উপর দেখতে পাই। আরও একটি ধাপ উঠবা মাত্র ভেতরের দৃশ্য চোখে পড়ে। টেবিলে দু'তিনটি বোতল। গেলাস। ঢালছেন আর খাচ্ছেন উনি। চোখ ঢুলে ঢুলে আসছে। একটি থালায় কী সাজানো বোঝা যাচ্ছে না, কিছুর একটা চাট।

খেতে খেতে কথা বলে চলেছেন। অত্যন্ত অশ্রাব্য উক্তি করছেন। অধিকাংশই দেবপ্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে। রঙ্গনের কানের মধ্যে কে যেন গরম সিসা ঢেলে দিতে থাকে। সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য তিনি দায়ী করছেন দেবপ্রিয়ার গর্ভকে। কী কুৎসিত সেই সব উক্তি এবং মন্তব্যগুলি।

—ওই একটা বাঁদর এসে জুটেছে এখানে। সব ওর করা চাই। ছাড়াতে চাইলেও যায় না। মনে হয়, ওটি আমার জামাই। ওই অপয়া বউ আমার... ওই সেই গর্ভধারিণী, পাপী ওটাকে লাই দিয়ে দিয়ে অমন করেছে। নাহ্ নাহ। এ কী বলছি আমি, সব ভুল দেবপ্রিয়া।। বাবা রঙ্গন, তুমি কিছু মনে করো না। আমি মাতাল। ময়ূরী তোমারই বাবা। শুধু তোমার। তোমাকেই আমি দেব ওকে। তুমি ওকে বিষ খাইয়ে দিও। বলতে বলতে তীব্র মোচড়ানো ব্যথায় হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন মানুষটা।

মানুষটি কাঁদতে কাঁদতে ঢক ঢক করে গলায় ঢালতে থাকেন বিষাক্ত গরল। এ কী অসহ্য দৃশ্য! এ এক আশ্চর্য গোপন কক্ষে বসে জগৎ-সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কী কথা নিজেকে শুনিয়ে চলেছেন!

—আমি অনেক দিন মনে মনে চিন্তা করেছি, বিষ খাওয়াব। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেব। পারিনি। ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেব। পারিনি। নতুন কাজের লোক যোগাড় করে আনব। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। সব এক। সবাই ঘৃণা করে। কেন করবে না। তাদের তো দোষ নেই। কিন্তু তারপর? এভাবে নিজেকে শেষ করে দেব। এইভাবে...

আবার গলায় ঢালতে থাকেন উনি। এত নৈরাশ্য সহ্য করা যায় না। চোখে মুখে ঘাম জমেছে। মুখের রেখায় আলকাতরার মতো গ্লানি জমেছে।

—কেন তুই পেটে ধরেছিলি বউ। সমস্তই তোমার নিজের মতলব। আমাকে ঠকানোর চেষ্টা। জানি না? অবশ্য আমি কি কম? এই দ্যাখো, খাচ্ছি! একা। কেউ নেই। হেঃ হেঃ হেঃ।

সিঁড়ির উপর আমার দু'টি পা গেঁথে গিয়েছিল। নড়বার মতো সামর্থ্যও যেন ছিল না। একটু আগে আমিও ময়ূরীকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। কোনও না কোনও মুহূর্তে আমরা প্রত্যেকেই ওকে অবাঞ্ছিত ভাবি, তার মৃত্যু কামনা করি।

—তোর আত্মহত্যারও ক্ষমতা নেই মা।

বাবা যখন তীব্র হাহাকারে একথা বলে উঠলেন, মনে হল সমস্ত বাড়িটা দুলছে। মনে হল, পড়ে যাব।

কেন এলাম এই তিনতলায়! ভেতরের এই মানুষটাকে দেখা কি সত্যিই বড় প্রয়োজন ছিল? এত কাল ভেবেছি, কষ্ট বুঝি আমারই, কিন্তু এত কষ্টে যে মানুষ বাঁচে না। মামণির কষ্টের ভাষা তবু শুনেছি, কিন্তু বাবার এই মূর্তিটা কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।

অত্যন্ত সাবধানে রেলিং চেপে ধরি। ধীরে ধীরে পা ফেলি নীচে। দেহের সমস্ত বল যেন কে শুষে নিয়েছে। টলতে টলতে ময়ূরীর ঘরে এসে দেখি, যার আত্মহত্যার ক্ষমতা নেই, সে কিন্তু চাঁদের দিকে চেয়ে আপন মনে হাসছে।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দোতলায় যখন এলাম, দেখি কেকা তার সেই তীব্র দৃষ্টি মেলে আমাকে দেখছে। তার চোখে সন্দেহ আর বিস্ময় ঠিকরে পড়ছে। একটি কথাও বলল না কেকা। সারা দেহ চমকে উঠল আমার।

তখনও সূর্যের আলো ফুটে ওঠেনি, ময়ূরীর ঘরে ঢুকে চাকাঅলা চেয়ারে চোখ পড়ে। অবাক হই, বুঝতে পারি, কেকা দোতলা থেকে নেমে এসেছে। ওর হাতে বই ধরা।

ঘরে তখনও অন্ধকার ভাসছে, তবে তা ফিকে হয়ে এসেছে। রাত্রের ঘটনা মন থেকে একটুও নড়েনি। ঘুমও হয়নি একফোঁটা। কেকাকে আমি দোতলার সিঁড়ির মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কেকা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবারই মতন ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। ময়ূরী যদি কথা বলত, যদি হাঁটাচলা এবং অন্যান্য স্বাভাবিক ক্ষমতা পেত, স্বচ্ছ বুদ্ধি পেত, ও হত উচ্ছল। কখনও কেকার মতো নিষ্ঠুর আর গম্ভীর হত না।

জানালা খুলে ভোর হওয়া দেখছে কেকা। আকাশে পাখি উড়ে যাচ্ছে দু'একটি হালকা আঁধার ঠেলে ঠেলে। ও আমার দিকে পিছন করে আছে।

কেকা হঠাৎ বলল—তুমি তিনতলায় উঠেছিলে কেন ?

বললাম—কী আছে, তাই দেখতে।

কেকা গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে ওঠে—জানো না বাবা থাকেন, ওঠা বারণ। যদি বাবা জানতে পারেন তুমি উঠেছিলে, কী হতে পারে ভেবে দেখেছ !

—আমি উঠেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছি কেকা।

—তোমাকে কি সব ব্যাপারেই নাক গলাতে হবে ? কই লক্ষ্মীর মা তো কখনও ওঠে না।

—আমার ভুল হয়েছে।

—চাকর চাকরের মতো থাকতে পার না ? তোমার কতটুকু অধিকার বোঝা উচিত। বাবা মা তোমাকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন।

—আমি চলে যাব।

—তাই যেও, থাকো কেন ?

—যেতেই তো চাই।

—যাও না কেন, সেই কথাই তো শুধোচ্ছি।

—পারি না।

—কেন পার না ?

—ময়ূরীর জন্যে। ওকে কে দেখবে ?

—ও, তুমিই বুঝি ওকে দ্যাখো।

—দেখি না ! কে দ্যাখে !

—খুব কথা শিখেছ, তাই না ? অসহায় দেখে যা খুশি তাই, মুখে যা আসবে বলে যাবে।

—আমি খারাপ কী বলেছি, যা সত্য তাই বলেছি।

—খুব স্বার্থে এখানে পড়ে আছো তুমি। এরপর অনেক টাকা দাবি করবে বাবার কাছে। তোমাদের ওই ক্লাশটাকে আমরা চিনি। তারপর বাবার বদনাম করে বেড়াবে।

—দ্যাখ কেকা, এভাবে ব'লো না। আমি এখনই বার হয়ে যাব।

—তাই যাও। আমরা কি লোক পাব না।

আর কোনও কথা আমার মুখ দিয়ে ফুটে বার হতে চাইল না। আমি জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিই। আমার তো সঙ্গে নেবার কিছু নেই, ঝাড়া হাত পা।

লক্ষ্মীর মা আমাকে জামাকাপড় পরতে দেখে ঘুম জড়ানো চোখে ভাবল, বাজারে যাচ্ছি হয়ত।

হনহন করে হাঁটা দিই স্টেশনের দিকে। ভোরের ট্রেনটা এখনও হয়ত পেয়ে যেতে পারি। কিছু দূর এসেছি, এমন সময় ট্রেন এসে পৌঁছলো স্টেশনে। দু'মিনিট থামবে বড়জোর, তারপর ছেড়ে যাবে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম পথের উপর। তাহলে কি বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাব ?

বাসের অত ভাড়া কি আমার কাছে কুলোবে ? আমি যে চুরি করতেও শিখিনি। অনেকদিন বাজার করতে এসে পয়সা বাঁচত, মামণি আমাকে বলতেন, তোর কাছে রেখে দে। মাঝে মাঝে দু'একটা দিন বাজারে এসে হাট করি। ওই পয়সা জমিয়ে ক'দিন আগে আমি ময়ূরীর জন্যে একটা রঙিন ময়ূরপালক লাগানো দামি হাত-পাখা খরিদ করে নিয়ে গেছি। যা খুচরোখাচরা এখন পকেটে রয়েছে, ওতে বাসভাড়া হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

রাস্তা নির্জন নয় বটে কিন্তু রিকশা ছাড়া পথচারী দেখা যায় না এখন। পিছনে একটা রিকশা বেল বাজিয়ে থেমে গেল। আমি ফিরেও দেখি না। হঠাৎ একটি নরম হাত আমার একটি হাত পিছন থেকে এসে চেপে

ধরে—'রঙ্গন !'

চমকে উঠে থেমে যাই। রিকশা ছেড়ে দিয়ে নেমে এসেছে কেকা।

—প্লিজ, যেও না।

—আমি খুব খারাপ কেকা ! আমি খুবই খারাপ ছেলে। চাকর।

—আর বলব না কখনও। মাফ করে দাও। ফিরে চল। না হলে আমি মুখ দেখাতে পারব না। অনেক ঘাট হয়েছে আমার।

—আমাকে কী ভাবো তুমি ?

—খারাপ ভাবি না রঙ্গন। একটুও মন্দ ভাবি না। সব আমার মিথ্যে কথা। যদি ময়ূরী তোমাকে এমন করে ডাকত, তুমি বুঝি জোর করে চলে যেতে ?

—ময়ূরী।

—আবার কে। দ্যাখো, আমি কেকা নই রঙ্গন। আমি ইচ্ছে করলেই ময়ূরী হয়ে যেতে পারি।

রঙ্গন আর এক ধাপও অগ্রসর হতে পারে না। স্তম্ভিত হয়ে থেমে পড়ে। ফিরে আসে সে। সমস্ত দিন ওই একটি কথা সর্বাত্মক ভাবনায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। 'আমি ইচ্ছে করলেই ময়ূরী হয়ে যেতে পারি।'

তারপর কী হয়েছিল ঘটনা। ক্রমশ কেকা অদ্ভুত রহস্যময়ী হয়ে উঠতে লাগল। ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কেকা বাড়িতেই থেকে গেল। মাঝে মাঝে সে পরিমল ডাক্তারের কাছে যায়। এখন ওর কথার গুরুত্ব অনেক। বাপ মা ওর কথায় চলেন। কেকা ময়ূরীর অনেক কাজ কখনও কখনও নিজে হাতে করে। আমি বুঝে নিয়েছিলাম কোন কাজটি আমায় করতে হবে, কোন কাজে তাকে ডাকব।

একদিন কেকা ওর বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে দোতলার খোলা ড্রইংয়ে গল্প করছে। আমি উঠে গিয়ে ডাকলাম—নীচে আসবে ?

—কেন ?

—এসেই দ্যাখো।

—তুমি পার না ! সবই আমায় করতে হবে। ওই নাম মাত্র আছে, বুঝলে ! সবই আমাকে দেখতে হয়।

অবাক হয়ে গেলাম।

কে একজন বলল—সবই কর তুমি ? নিজে হাতে ?

—কেন করব না।

—নিশ্চয়। বোন যখন।

—তাহলে ওকে রেখেছ কেন ?

—অনেক দিন আছে কিনা। দাঁড়াও দেখে আসি।

—ছেলেদের দিয়ে সব কাজ করানোও ঠিক নয়।

—ও তো করে না। আমিই করি। ও কেবল কাচার কাজ করে।

—অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় তোমাকে !

—তা কেন ! ময়ূরীও মানুষ।

—যখন তোমার বিয়ে হয়ে যাবে ?

—বিয়েই করব না।

কেকা নীচে দ্রুত ছুটে এসে দুয়ার ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে বোনকে নগ্ন করে, কাপড় জামা বদলে ঠিক করে দেয়। দুয়ার খুলে নোংরা কাপড় চোপড় বাথরুমে আলগোছে ধরে, আঙুলে ঝুলিয়ে এনে ছুঁড়ে ফেলে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওর দু'জন বন্ধু ওর কাজ দেখছিল। হাতে সাবান দিয়ে আবার উপরে উঠে গেল কেকা।

—কাজের মেয়ে পাও না ?

—অনেক চেষ্টা হয়েছে। থাকে না।

—ওই ছেলেটাই বা আছে কেন ?

—আছে। ও ময়ূরীকে ভালবাসে।

—ভালবাসে মানে ?

—ভালবাসে মানে ভালবাসে, আবার কি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পালকের ঝাড়নে মেঝের ধূলা সাফ করছিল রঞ্জন। সবই শুনতে পাচ্ছিল। কেকা বা ওর বন্ধুরা জানে না রঞ্জন পিছনের দরজা দিয়ে কখন দোতলার ঘরে এসে ঢুকেছে।

—তুই এমন করে বলতে পারিস দেখে আমরা অবাক হই।

—বাবা আমাকে সহজ করে দেখতে বলেছেন। ডাক্তার সামন্ত আছেন, উনি বলেন, ওদের বিয়ে দেওয়া দরকার। কথাটা শুনে গায়ে লাগে বইকি।

—তোর গায়ে লাগে ?

—আবার কার।

—কেন ?

—ময়ূরী আর আমার বডি তো এক ভাই। সব এক।

—সেকথা আমরাও ভাবি।

—তোরা কী ভাববি। ভাববার মতন অনেক লোক আছে। লক্ষ্মীর মা ভাবে, পাশের বাড়ির রাঙাবউ ভাবে। ভেবে ভেবে ওরা হয়রান হয়ে গেছে।

—তাই নাকি।

—হ্যাঁ। রাঙাবউ মারভেলাস ডেসক্রিপশন করতে পারে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ভাবি, আমি তাহলে কে ?

—কে মানে ?

—আমি কি ময়ূরী ? অথবা ময়ূরী নই। ডাক্তার সামন্ত বলেন, আমি প্রকৃতির সবাক অংশ, ময়ূরী নির্বাক। আমি সারভাইভ করব, ও করবে না। ভাষা বাদ দিয়ে অন্য প্রাণী বাঁচে, মানুষকে বাঁচানো কঠিন। ময়ূরীর কঠিন ব্যামো আছে, ও অজ্ঞান হয়ে যায়। সেন্সলেস হয়ে পড়ে থাকে। অথচ মরে না। সবেচেয় খারাপ হয় যখন ওর মাসিক হয়। সেদিন রক্ত মেখে পড়ে আছে, রঙ্গন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, স্পর্শ করতে পারছে না।

—ইস্ !

—কে ? কে ওখানে ?

রঙ্গন ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে মনে হল, সে একটা চোর। তার অপরাধের সীমা নেই।

সমস্ত পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে গেছে। দূরে শিস দিয়ে একটা পাখি ডেকে চলেছে ক্রমাগত। আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। লক্ষ্মীর মা ট্রেতে করে চা এনে নামায় অনুচ্চ টেবিলে। ঘাড়গুঁজে রঙ্গন নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে নীচে চলে যায়।

একজন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল—সব শুনেছে।

অন্যজন চায়ে চুমুক না দিয়েই বলল—এটা ঠিক হল না।

রঙ্গন পাগলের মতো ছুটে চলে আসে ডাক্তার সামন্তর কাছে। তাকে দেখে পরিমল সামন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে গলা থেকে স্টেথো নামিয়ে টেবিলে রাখেন। চোখের চশমা নামিয়ে হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে অপলক চেয়ে থাকতে থাকতে মিষ্ট করে নিঃশব্দে হেসে ওঠেন।

—কী হয়েছে রঙ্গন।

—আমি সত্যিই কী করব ডাক্তারবাবু।

—ভয় পেও না! বল, কী হয়েছে।

—আপনি কি আমাদের বিয়ে দেবেন বলেছেন।

—না। কই না। ওহো! ওটা গল্প রঙ্গন! তোমার জীবনটা তো একটা গল্প হে!

—গল্প!

—হ্যাঁ হে। তোমার একটা বিয়ের গল্প করেছি আমরা। ব্যস।

—তাহলে?

—গল্প কখনও সত্যি হয়? হয় না।

—কেকা?

—কেকা কী বলছে?

—ও কি কখনও ময়ূরী হতে পারে ডাক্তারবাবু?

—না। তা কী করে পারবে! ওইটে ওর কল্পনা। ভাবে মাঝে মাঝে। সত্য নয়।

—আমি কি মা?

—হ্যাঁ। কেন ময়ূরী তো কল্পনা করতে পারে না। তাই ওটা সত্য।

—মিথ্যা কথা ডাক্তারবাবু। আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন। এ ভুল। প্রতারণা। বলতে বলতে চরম উত্তেজিত হয়ে ওঠে রঙ্গন।

—শান্ত হও। তোমার উপায় নেই। তুমি পঙ্গু হয়ে গেছ! ময়ূরী তোমাকে শেষ করে দিয়েছে।

—ডাক্তারবাবু! রঙ্গন সভয়ে ডুকরে উঠল।

তোমার জীবনটা তো একটা গল্প হে! ময়ূরী তোমাকে শেষ করে দিয়েছে।

গল্পই যদি না হবে তাহলে রঙ্গন কেন ওভাবে ছুটে গিয়েছিল! ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটে গিয়ে কোন্ মুখে সে তার নিজের বিয়ের কথা পাড়ল! সংসারের সাধারণ বোধবুদ্ধি কি তার লোপ পেয়ে গেছে? কেকা বলল আর সে নেচে উঠল! সবাই ওরা বিয়ের গল্প করে, গল্প করে তারা আনন্দ পায়। একটা জীবন যদি শুধু গল্পে ফুরিয়ে যায় অথবা শুধু মাত্র গল্প হয় তাহলে সেই জীবনটা কি সত্যিই জীবনের মতো! জীবনের অন্যতম প্রমাণ কি এই যে, তা থেকে গল্প তৈরি হয়!

একটা গল্পের জন্য একজন মানুষ কেন তার সমস্ত জীবনটা খরচ করতে চাইবে? প্রকৃত জীবন সেটা, যা কিনা গল্পে ব্যয় বা ব্যবহার করার পরও জীবনটা আস্ত থেকে যায়!

রঙ্গন বলল, নিজেকেই বলল, দ্যাখ রঙ্গন তোমার জীবনটা শুধুমাত্র একটি গল্পের জন্য তৈরি হচ্ছে। এত দিন তুমি তোমার জীবনের গঠনটাই বুঝে

উঠতে পারনি। বন্ধুদের কাছে কেকা গল্প করে শোনাচ্ছে, তোমার আর ময়ূরীর বিয়ে হবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, বিয়েটা দরকার।

সেই ডাক্তার পরিমল সামন্ত বললেন—ওটা গল্প।

একজন নিউরো-মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এমন অদ্ভুত আচরণ করেন কেন? এত সত্ত্বেও ডাক্তারবাবুকে খারাপ মানুষ ভাবতে পারে না রঙ্গন। গভীরভাবে বিশ্বাস করে তাঁকে। ময়ূরীর প্রতি ডাক্তারের অসম্ভব মমতা। দেবপ্রিয়ার কষ্টে তিনি ব্যথা পান। অর্জুনবাবুর গম্ভীর্যের অন্তরালে প্রবল নৈরাশ্যের মূর্তিটা বোধহয় তাঁর অজানা নয়, কেন না ওঁরা পরস্পর পরস্পরের গভীর বন্ধু। রঙ্গন ইদানীং বুঝতে পারে, ময়ূরীর কারণে কেকার কোনও ধরনের মানসিক ক্ষতি হোক তিনি চাইবেন না। কিন্তু কোনও কারণে রঙ্গন পাগল হয়ে যাক, এটাই কি ডাক্তার সামন্তর অভিপ্রায়?

ময়ূরী যে রঙ্গনকে শেষ করে দিয়েছে, এই নির্মম উক্তিটি করতে গিয়ে ডাক্তারের গলা তখন ধরে উঠল। কেন ভিজে উঠল গলা। রঙ্গনকে ময়ূরী এমন পাগল করেছে, সেই ঘটনায় ডাক্তারের ভূমিকা কি কম? উনিই তো রঙ্গনকে মানুষের মাতৃগুণ বুঝিয়েছেন। উনিই ফের বিবাহের প্রস্তাব করেছেন। তিনিই বললেন, এ সব গল্প বড় জোর, তার বেশি নয়।

রঙ্গন লক্ষ্য করছে, ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ইদানীং ঘন ঘন যাতায়াত করে কেকা, এ রকম ঘটনা আগে ছিল না।

ডাক্তারের ওখান থেকে অশেষ দুর্গতি অবস্থায় ফিরে আসে রঙ্গন। বুকের মধ্যে গুমরে মরছিল তার সমগ্র অস্তিত্ব। তার মনের ভেতরে সত্যি কী প্রবল ঝড় বইছিল কেউ জানে না।

লক্ষ্মীর মায়ের কাছে এসে রঙ্গন বলল—আমার বিয়ে হচ্ছে শুনেছ দিদি। লক্ষ্মীর মা বাস্তবিক খুবই অবাক হয়ে গেল। অবাক হওয়ার পর সে হেসে ফেলল। হেসে ফেলার পর দুঃখ পায়। রঙ্গন লক্ষ্মীর মায়ের এই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে, কিন্তু সবখানি উপলব্ধি করতে পারে না।

লক্ষ্মীর মা সেকথাও বুঝতে পেরে কী বলবে বুঝে পায় না। কিছুক্ষণ অপলক রঙ্গনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে। এবার সশব্দে হেসে উঠে বলে—তোকে কে বললে রঙ্গন। মনগড়া কথা বলছিস না তো?

—অ্যাই লক্ষ্মীর মা, তোমাকে আমি কখনও মনগড়া কথা বলেছি!

—যারা বিয়ের কথা বলছে, তাদের কাছে আগে আর একটু ভাল করে

জেনে দ্যাখ বাপু ! বিয়ে বললেই বিয়ে নাকি । রাঙাবউ কতদিন থেকে ওই কথা বলে আসছে, কই ওরা তো সেই কথা কানে তোলেনি অ্যাদ্দিন ! লোককে ওরা কত কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বলে ।

—তুমিই একবার শুধিয়ে দ্যাখ না দিদি । আমার কথা আমি কি শুধবো ?

—ওই দ্যাখো, কাকে বলে ঘোড়ারোগ । তোর হ্যাংলামি দেখে আর বাঁচি না । তোর ভেতরে ভেতরে যে এত ইচ্ছে, তা কে জানত ।

—আমার সত্যিই খুব ইচ্ছে দিদি । ময়ূরীরও ইচ্ছে আছে !

—ও মা ! সে কি কথা । শুনে একেবারে গলে গেলাম, মরে গেলাম ভাই !

—রক্ষে কর, তোমায় আর মরতে হবে না । যা সত্যি তাই বলছি ।

—কী করে বুজলি, ময়ূরীর ইচ্ছে আছে ?

—আছে । সে আমি বুঝেছি, যা করে হোক ।

—খুব ভয়ংকর কথা শোনালি রঙ্গন । বুকের ভেতরটা আমার ধড়ফড় করছে । একথা বলে আপন বুকের উপর ডান হাতখানা রেখে নিজের বুকের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে বিস্ময়-মূঢ় লক্ষ্মীর মা ।

তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে লক্ষ্মীর মা—ভগবান, তোমার লীলার অন্ত নাই ঠাকুর । তুমি সব পার । কথায় বলে তোমার ইচ্ছায় ল্যাংড়াও গিরি লঙ্ঘন করে । হ্যাঁ রে রঙ্গন, ঠিক করে বল তো, কী করে বুজলি ময়ূরীর ইচ্ছে আছে ! খুব চাপা গোপন গলায় কৌতূহল প্রকাশ করে রতনের মা ।

কথা শুনতে শুনতে রঙ্গনের ক্রমশ খারাপ লাগছিল । কথা যেন আর সিধে থাকছিল না । ময়ূরীর যেহেতু ভাষা নেই, তাই যেন তার ইচ্ছেও থাকতে পারে না । ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলে মনের বাসনার প্রকাশ যেন কখনও সুন্দর হয় না, তেমনই একটা বক্তব্য লক্ষ্মীর মায়ের গলায় বুঝি বা ঘনিয়ে উঠতে চাইছিল । রঙ্গন ভয় পেয়ে গেল । বারবার মনে পড়ছিল ময়ূরী তার একটি হাত কী করে টেনে নিল বুকের কাছে ।

রঙ্গন লক্ষ্মীর মায়ের কথার উত্তরে কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল—ময়ূরীরও একটা মন আছে দিদি ! ভগবান চাইলে সে-ও তার বিয়ের কথা বলতে পারে ।

—কী করে বলল তোকে তাই ভাবছি । ওর সঙ্গে খারাপ কিছু করিসনি তো !

ভাষা জানলেই কি মানুষের প্রকাশ সুন্দর হয় । লক্ষ্মীর মা এ কী কথা শোনালো তাকে । রঙ্গনের কান দু'টি ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল । সে ছটকে সরে চলে এল ময়ূরীর দোরের কাছে । তার হৃদয় যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়তে

চাইছিল।

রঙ্গন ভাববার চেষ্টা করে, তার আর ময়ূরীর সম্বন্ধ কি লক্ষ্মীর মায়ের কাছেও কোনও অন্যায় সম্বন্ধ ? আচ্ছা, এই সম্পর্ককে কি ভালবাসা বলা যায় না ? ময়ূরী যেহেতু মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো বোবা এবং নির্বাক, তাই কি এই সম্পর্ক মানবিক নয় ? এই সম্বন্ধ কি পশুর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মতো হাস্যকর এবং নিম্নবর্গের ! ঈশ্বর চাইলেও মানুষ এই সম্বন্ধ মানবে না ? বা সেসব কিছুই নয়, রঙ্গন একজন পাগল এবং তার বিয়ের প্রসঙ্গ পাগলের প্রলাপ মাত্র।

তাহলে এতক্ষণ রঙ্গন এমন পাগলের মতো ছুটে বেড়াল কেন ? সে শুধুমাত্র একটি গল্পের পিছুনেই কি ছুটে বেড়াল ? জীবনের এই পরিহাস সইবার জন্যই কি তার জন্ম হয়েছিল ?

সবই যদি পরিহাস তবে তাকে কেন জড়পিণ্ডের জন্য এত অপবাদ সইতে হয় ? তুমি কি সত্যিই মরে যেতে পার না ময়ূরী ? আমি আর তোমার কাছে কখনও যাব না !

অথচ ময়ূরীর মুখের সামান্য এক চিলতে হাসি রঙ্গনকে প্রবলভাবে হুইলচেয়ারের কাছে টানতে লাগল। সে কিছুতেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না। হৃদয়ের এই অসংযম তার নিজেরই কাছে খুব বিস্ময়কর ঠেকে। তখন সন্ধ্যা হয়েছে সবে, আর আকাশে অত্যন্ত স্নিগ্ধ চাঁদ টলটল করে হেসে উঠেছে, তাই দেখে রঙ্গনের সমস্ত যন্ত্রণা হৃদয় থেকে সরে গিয়েছে। বিপুল এক আবেগে ময়ূরীর কাছে এসে চাঁদ দেখা অপূর্ব মুগ্ধ সৌন্দর্য, যা ময়ূরীকে মণ্ডিত করেছে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে যায়। স্পর্শ করে। ধীরে ধীরে রঙ্গনের মুখের দিকে দৃষ্টি টেনে আনে ময়ূরী। বোঝা যায়, ময়ূরী স্পর্শ বুঝতে পারে।

আবার সেই ঘটনাটি ঘটে। রঙ্গনের হাত টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে রাখতে চায় সে।

রঙ্গন আজ প্রকৃত পাপের মধ্যে প্রবেশ করে যায়। নরম বুকে হাত রাখে। তার হাত খেলা করতে থাকে।

—ভাল লাগছে তোমার ? গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করতে গিয়ে রঙ্গন বুঝতে পারে তার স্বর যথাযথ ফুটতে চাইছে না। ময়ূরী মৃদুভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন হচ্ছে একটুখানি। রঙ্গন জানে না, কামনা ঠিক কী, নারীর নরম বুকের মাংসে সত্যিই কী আছে। অদ্ভুত কোমল একটা অনুভূতি হয়, মায়া হয়, তাছাড়া শরীর যেন বিস্ফারিত হতে চাইছে, আদি রিপু তাড়িত করছে তার

প্রত্যঙ্গগুলিকে, ময়ূরীকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

হঠাৎ মনে হয়, দ্রুতই ময়ূরী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ওর শরীর ঘেমে উঠেছে. নিঃশ্বাস আরও গাঢ় হয়েছে এবং মুখে একটা আশ্লেষের শব্দও করছে। ধীরে ধীরে চোখ মুদে এল ময়ূরীর। তারপর অবাক করে দিয়ে ময়ূরী ঘুমিয়ে পড়ল। ওর হাত পা কেমন শিথিল হয়ে গেল। রঙ্গন এই ঘটনায় কেমন ভয় পেয়ে যায়। মারাত্মক ভয়।

ভয়ে ত্রস্ততাড়িত হয়ে কী করবে বুঝে না পেয়ে কেঁদে ফেলে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে। যখন সে একটু একটু করে ফোঁপাতে শুরু করেছে এবং সীমাহীন লজ্জায় তার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠেছে তখন সারা শহরে বিদ্যুৎ চলে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে। চাঁদের দিকে চাইতে পর্যন্ত ভয় করে রঙ্গনের। কত অন্যায় করেছি আমি! কী তীব্র অন্যায় হয়ে গেল নির্বাক অসহায় প্রকৃতির উপর। নিজেকে কত ছোট করে ফেললাম আমি নিজেরই কাছে। এই অন্ধকারেও নিজেকে লুকিয়ে ফেলার মতো আশ্রয় যেন নেই।

—আমাকে মাফ করে দাও ময়ূরী। তুমি কি ভীষণ লজ্জায় ঘুমিয়ে পড়েছ! অথবা তোমার দেহের ভিতরের কোথাও কি ভীষণ কষ্ট হয়েছে। নাকি গভীর আনন্দ পেয়েছ তুমি? যাই ঘটে থাক, এ অন্যায়। কখনও প্রেম এমন হয় না।

লক্ষ্মীর মা যা বলল, আমি তাই ঘটিয়ে ফেললাম। নিজেরই কাছে এই ঘটনার কোনও ক্ষমা ছিল না। অবশ্য ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলতে পারি, এক ময়ূরী ছাড়া এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে আমি কোনও রমণীদেহ দেখিনি। নিয়ত দেখে দেখে আমার চোখে এই দেহ হয়ে উঠেছিল একটি লালিত লতার মতো। এই লতাটি যেন আমার দেহকে আঁকড়ে ধরে আমারই দেহের রস টেনে টেনে বিকশিত হয়েছে। এ যেন আমারই ভাবে, ভালবাসায়, মায়ায়, অসহায়তায় করুণায় গড়া, প্রতিটি রোমকূপে আমার স্নেহ পরিপূর্ণ, ত্বক দিয়ে বিশ্বসংসার থেকে যে-বার্তা ময়ূরী যতটুকু গ্রহণ করেছে, আমার ঘনিষ্ঠতম স্পর্শ তাতে লেগে আছে। আমি যদি তাকেই বিশেষভাবে এখন স্পর্শ করে থাকি, তা কি খুব গর্হিত হয়ে যায়!

ও চাইছিল বলে এক মূঢ় অসতর্কতায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। যদি সে অমন করে আমার হাত ধরে না টানত তাহলে লোভী আমার হাতখানি ওর বুকের কোমল কুসুমে এভাবে ঘ্রাণের মতো জড়াতো না।

ঈশ্বর তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও।

অনেকক্ষণ বিদ্যুৎ এল না। অন্ধকারে পড়ে রইল ময়ূরী, ঘুমিয়ে রইল। রঙ্গন মোম আনতে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উপরে আসে। ওর শরীর মৃদু মৃদু কাঁপছিল। উপরের খোলা ড্রইং-চাতালে, যেখানে চায়ের টেবিল, সোফা ইত্যাদি রয়েছে, বইয়ের সুন্দর সেলফ সাজানো আছে, দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের ফটো, সেখানে এসে চুপ করে দাঁড়ায় রঙ্গন। এখানে বসে বাবা স্বল্পস্বরে কথা বলেন। ইদানীং কেকা এই জায়গাটা অধিকার করেছে। বন্ধুদের সঙ্গে হেথায় বসে আড্ডা দেয়।

রঙ্গন এখান থেকে বড়ঘরটির দৃশ্য স্বপ্নের মতো দেখতে পায়। মোমের ক্ষীণ মায়াবী কিরণে ওদের প্রত্যেককে দেখা যাচ্ছে। রঙ্গন আশ্চর্য হয়, ডাক্তার সামন্ত রয়েছেন ঘরের মধ্যে। কখন এসেছেন, একফোঁটা বুঝতে পারেনি রঙ্গন। হয়ত তখন সে লক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল অথবা লোডশেডিং হওয়ার পর ডাক্তার ঢুকেছেন। মায়াময় থমথমে পরিবেশ ঘরটির মধ্যে। ওঁরা কেউ কথা বলছেন না।

একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন ডাক্তার। ঠিক তাঁর উল্টো দিকে একটি সোফায় দেওয়ালের কাছাকাছি বাবা। খাটের উপর মামণি, বাবার কাছাকাছি। মায়ের সামনে অন্যপ্রান্তে ডাক্তারবাবুর কাছাকাছি কেকা। কেকা সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁকা করে ডাক্তার সামন্তর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, ওর কামিজের পিঠটা বাইরের চাতাল থেকে চোখে পড়ে। তার মুখ দেখা যায় না, গালের একপাশ গোচরে আসে।

ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন ওঁরা সবাই।

ডাক্তারবাবু হঠাৎ কথা বললেন—বিয়ের কথাটা ওকে বলে ঠিক করনি কেকা।

কেকা বলল—বলিনি কাকাবাবু। শুনে ফেলেছে।

ডাক্তার বললেন—ও আমার কাছে গিয়েছিল। খুব উত্তেজিত। ও যেহেতু আর স্বাভাবিক নেই, তাই ওর উত্তেজনাও স্বাভাবিক ছিল না। ধীরে ধীরে ছেলেটা কেমন হয়ে যাচ্ছে!

মামণি উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন—এখন তাহলে কী হবে সামন্ত?

পরিমল সামন্ত বললেন—বিয়ে আমরা দিতে পারি দেবপ্রিয়া।

—পারি? বিস্ময় আর আশ্বাস জড়ানো গলায় বাবা কথা বললেন।

ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ পারি। এবং দিতে হলে আর দেরি করাও ঠিক হবে না।

—কেন ? বাবা প্রশ্ন করেন।

সামন্ত একটু হাসেন নিঃশব্দে, তারপর বলেন—আমার সামনে এখন তিনজন পেশেন্ট। কেকাকেও আমি পেশন্ট হিসেবে ধরে নিচ্ছি !

—ধ্যাৎ ! বলে কেকা যেন আর্তনাদই করল। অতঃপর বলল—ধরতে হলে বাবা আর মাকে ধর, আমি নই। আমার কোন অসুখ নেই।

ডাক্তার বললেন—তাহলে তোমাকে একটু বলি। আজ থেকে পাঁচ বছর পরে যদি বিয়ে দিতে চাও, হয়ত সেই বিয়ে আর হবে না। এই যে তুমি আর ময়ূরী দেখতে এক রকম, এটা ঠিক নয়। আগে কখনও বলিনি, আজ বলছি।

একটু থেমে সামন্ত বললেন—লোকে যা বলে তা যে ঠিক নয়, লোকই পরে সেকথা বুঝবে। ক্রমশ ময়ূরীর চেহারার মধ্যে একটা 'প্রিমিটিভ শেপ' তৈরি হবে এবং একটা 'আগলি' ভাব এসে যাবে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত মঙ্গল-বেবিদের বেলা এটা অবধারিতই বলা যায়। ওর খাওয়ার মুখটা তোমার চেয়ে ছোট। খুব লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। টোটাল ফেসটা মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের, বলা হয় মঙ্গোলিয়ান মুনফেস বেবি, চাঁদের একটা ছাঁচ আছে, তুমি ওর মতো নও। পিছন বা পাশে থেকে খুব মিল আছে। চাউনিতে সমান সমান ভাব আছে। আবার অমিলও কম নেই, লোকে দেখে না। কিন্তু চোখের চাউনির কারণেই প্রথম থেকেই একটা কী বলে, প্রিমিটিভ লুকস থাকে, কিন্তু বয়েস কম থাকার জন্য একটা চার্ম থাকে, পরে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। একটা উদাহরণ নিই।

ডাক্তার ফের থেমে পড়ে বললেন—ধর একটি জোয়ান তাগড়া ছেলে বেশ জোরে ভিড়ের মধ্য দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, গাড়িঘোড়া চলছে রাস্তায়, হঠাৎ ও একটা ধাক্কা খেয়ে গেল গাড়ির সঙ্গে, এত জোরে আঘাত পেল যে, প্রথমে আঘাতের পরিমাণ সে বুঝতে পারে না। কেকা, তুমি গভীরভাবে শুনবে কথাটা।

আবার সামান্য থেমে ডাক্তার বলতে থাকেন—এবার দ্যাখো, ছেলেটা ভীষণ সাহসী, বেপরোয়া, ও ভাবতেই পারেনি এভাবে দুর্ঘটনা হবে এবং বুঝতেও পারছে না সত্যিই কী ঘটে গেল। ওর সাইকেল দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে পড়েছে একদিকে, সে একদিকে। মাটিতে পড়ে থাকার পর ও হঠাৎ-ই কিছু হয়নি, সামান্যই হয়েছে অথবা সত্যিই কী হয়েছে ভাবতে ভাবতে যখনই সে উঠে

দাঁড়ানোর চেষ্টা করে তখনই তাকে দেখায় অদ্ভুত। অ্যাবনরম্যাল। ও জানেই না সে ভিতরে ভিতরে গুঁড়ো হয়ে গেছে হয়ত। দু'টি হাত সে বাতাসে মেলে দিয়েছে, পৃথিবীকে সে চিনতে পারছে না, তীব্র যন্ত্রণায় চেহারা বদলে এক আশ্চর্য অসহায়তা ফুটে উঠছে মুখে, বাতাসে হাত মেলে সে হাতড়াচ্ছে, অমন জোয়ান ছেলে, কিন্তু সে আর সে নেই, এই যে অবস্থাটি, তার এই আকৃতি, অভিব্যক্তি, অপ্রকৃতিস্থ চাউনি, একে আমি প্রিমিটিভ লুকস বলছি। ভেবে দ্যাখো, ময়ূরীর শরীরে অত যন্ত্রণা হয়ত নেই, কিন্তু তার অবস্থা সেই ছেলেটার মতো, যাকে দেখে, ওই যে হাত মেলে সে দাঁড়াতে চাইছে, তাকে দেখে থ্যাঁতলানো পশু মনে হয়, মানুষ ভাবতে পারি না—সেরকম ময়ূরীকে আমরা দেখি ওই একটা স্তরে। ওকে ভালবাসি কেন, ওই জন্যে।

—তো! বলে ধরা গলায় কেকা আরও শুনতে চায়।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু কথা হচ্ছে, বুদ্ধির ছটা চোখেমুখে পড়ে বলে আমরা মানুষ, বিপদে পড়ে গেলে আমরা প্রিমিটিভ, আদিম। ওখান থেকে আমরা ময়ূরীকে তুলে আনতে পারছি না। বরং বয়স বাড়লে কেকা যত সুন্দরী হয়ে উঠছে, ও তত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে একই রকম দেখতে দু'জনের একজন চলেছে আরও আদিম অবস্থার দিকে, কারণ সে ক্রমশ অসুন্দর হয়ে যাচ্ছে, অন্যজন এগিয়ে চলেছে জ্ঞান এবং সৌন্দর্যের দিকে। ভেবে দ্যাখো, তুমি ভাল হবে, ময়ূরী খারাপ হয়ে যাবে। রঙ্গন কি তখন ময়ূরীকে আর...

এবার কেকা বাস্তবিক ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কান্না তার যেন আর থামতে চাইছে না। ওঁরা চুপ করে রইলেন, কেকা একা ফোঁপাতে থাকল।

মামণি দিশে হারিয়ে বলে উঠলেন—হরিমতীর অনুমতি না পেলে এই বিয়ে আমি দিতে পারব না সামন্ত।

ডাক্তার বললেন—হরিমতীকে যদি সব কথা বলা যায় দেবপ্রিয়া, মনে হচ্ছে, ও কিছুতেই রাজি হবে না। তাছাড়া সব কথা তোমাদেরও বলিনি এখনও। অর্জুন একটা নিষ্কৃতি চাইছে। ওর কোথায় লাগে বুঝি না, বিয়ের জন্য ওরই জেদ বেশি।

বাবা বললেন—জেদ আমার বটে, কিন্তু চাহিদাটা আমার নয়, রঙ্গনের। ওর সঙ্গে আমার বিশেষ কথা হয় না ঠিকই, তাবলে ওকে আমি কম বুঝি না সামন্ত। তোমার চেয়ে বেশিই ফিল করি। ওদের বিয়ে দাও।

ডাক্তার সামন্ত বললেন—আমি কিন্তু গছিয়ে দিতে চাই না অর্জুন। ডাক্তার

হিসেবে সে মস্ত অন্যায় হবে। আমি রঙ্গনকে সব কথা বলতে চাই।

দেবপ্রিয়া বললেন—তাই কর ডাক্তার। তাই কর। সব বলে দাও ওকে, যা আমরা জানি না, তা-ও ওকে বল।

—না! গম্ভীর এবং প্রায় রূঢ়স্বরেই অর্জুন প্রতিবাদ করেন। তারপর বলেন—সব কেন বলতে হবে। বলার কী আছে। আপনিই সব জানবে রঙ্গন। ওকে নিজের মতো করে জানতে দিতে হবে। দ্যাখো, রঙ্গনকে আমরা চাকর হিসেবে চেয়েছিলাম, সে চাকর হয়ে থাকেনি, সে তারই দয়া। আমি তার সত্যিই কোনও উপকার করতে পারিনি, কেন পারিনি বলতে পারব না। আমরা মধ্যবিত্ত আমরা অনেক স্বার্থপর সামন্ত।

—সব কথা বলব না। ডাক্তার অবাক গলায় বিমর্ষস্বরে বলেন।

—না। বলব না। হরিমতীকেও বলব না, আমি বিয়ে দেব। জিদ করেন অর্জুন।

—ময়ূরী কখনও মা হতে পারবে না দেবপ্রিয়া। বলে ফেলেন পরিমল। তারপর বলেন—তুমি যে মনে করতে ভগবান ময়ূরীকে সব দিয়েছেন, এ ধারণা ভুল। ও কখনও 'কনসিভ' করবে না। আমি বলব, প্রকৃতি তাকে রক্ষা করেছে। তুমি কষ্ট পেলে দেবপ্রিয়া?

—ব্যস, ব্যস। আর নয় সামন্ত। মা কেকা, তুমি আর এখন আমাদের মধ্যে থেকো না। যাও, ছাদে যাও। বলে উঠলেন বাবা। সঙ্গে সঙ্গে কেকা খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এবং অত্যন্ত দ্রুত রঙ্গনের কাছে চলে এসে আঁতকে ওঠে।

—তুমি!

—মোম নেব।

—কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছো? তোমাকে সব কথা কান পেতে শুনতে হবে?

হঠাৎ রেগে গেল রঙ্গন, বলল—তুমি কেন শুনছ। কাঁদলে কেন তখন? যাও ছাদে যাও।

সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল কেকার মধ্যে। একটা ছোট্ট চড় তুলে সে রঙ্গনের গালে বসিয়ে দিল। তারপর সেই হাতটা মুখে চেপে ধরে একটুখানি ফুঁপিয়ে উঠে দোতলার ছাদে ছুটে এসে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আকাশে চোখ তুলল। ওর গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল। চাঁদটা যেন অশ্রুতে মেখে আরও প্রবল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিল আকাশে।

তারপর আমার বিয়ের দিন স্থির হল, ডাক্তারবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—তাহলে রঙ্গন তোমার বিয়ের ব্যাপারটা, তোমার আর ময়ূরীর বিয়ের ঘটনাটা আর গল্প রইল না। আমরা এখন গল্প করে বলতে পারব, আমরা বিয়ে দিতে পেরেছি। তুমি কিছু বলবে ?

আমার অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু কোনও কথাই ফুটে উঠল না মুখ দিয়ে, মুখ হাঁ করলাম, মুখের ভিতরে জিভও নড়ে উঠল একটু, শব্দ হল অদ্ভুত ধরনের। ডাক্তারবাবু আশ্চর্য উৎসুক হয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে চেয়ে। ভাবলেন আমি বুঝি খুব আনন্দ পেয়েছি, অবশ্য সেই ভাবনা অর্থহীন বা অকারণ ছিল না, আনন্দও হচ্ছিল আমার যথেষ্ট। তবে ডাক্তারবাবু যে বললেন, উনি এখন গল্প করতে পারবেন, বিয়ের গল্প, কথাটি শুনে আমার একটু, ভাল লাগল না।

—কিন্তু রঙ্গন তুমি কোনও দিন বাবা হতে পারবে না। ডাক্তার হিসেবে একথা তোমাকে বলে দেওয়া দরকার। তোমার বয়েস বেশি নয়, তবু বলছি বিয়ের পর মানুষের সন্তান হয়। ময়ূরী...

—আমি শুনেছি ডাক্তারবাবু।

—তুমি শুনেছ ?

—হ্যাঁ, চুপ করে আপনাদের সব কথা শুনে ফেলেছি।

—তুমি একথা শুনেও বিয়ে করতে চাইছ ?

—বিয়ে না করলে ময়ূরীর কাছে থাকব কী করে ? বাবা যদি তাড়িয়ে দেয়।

—তখন তুমি চলে যাবে।

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু। বলতে গিয়ে আমার গলা বোধহয় একটু ধরে এল।

ডাক্তারবাবু বললেন—তুমি যে ময়ূরীকে এত সুন্দর ভাবছ, সে কিন্তু ভবিষ্যতে দেখতে অত সুন্দর থাকবে না। চেহারা খানিকটা খারাপ হয়ে যাবে। তখন তুমি ওকে ছেড়ে চলে যাবে না তো ?

—না। ও কখনও দেখতে খারাপ হবে না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু এবারে কেমন সুন্দরভাবে হো হো করে হাসতে লাগলেন। এবং হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেঝের উপর পায়চারি করতে থাকলেন। চোখমুখ ক্রমশ কেমন কঠিন হয়ে উঠল তাঁর। বাইরে রোগী বেশি নেই। কিছুক্ষণ বাদে চেম্বার বন্ধ করে দুপুরে চান-খাওয়া করতে চলে যাবেন বাসায়। বেলা হয়েছে। বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সপ্তাহে দু'দিন তিনি এই মফঃস্বল শহরের চেম্বারে বসেন। সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে কলকাতায় থাকেন।

হঠাৎ ডাক্তারবাবু বললেন—দ্যাখো রঙ্গন, তুমি এ বিয়ে করো না। যতদিন পার, থাকো। চিরকাল কি থাকতে পারবে।

—কেন পারব না ডাক্তারবাবু।

—সব কথা যে বলতে পারছি না তোমাকে। তুমি যে ছেলেমানুষ। আমরা যে গল্প করে বিয়ের কথা বলেছিলাম, সত্যি তো আর বিয়ে চাইনি। তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না আশা করি!

—আমাকে ময়ূরী মা বলে ডাকে, তাই ওকে আমি ছাড়তে পারি না। ওকে ছেড়ে গেলে, ও কিছুতেই বাঁচবে না। আপনিই বলেছেন, পুরুষও মা হয়।

—সবই সত্য রঙ্গন। তুমি যাতে থাকো সেই মতলব থেকেও কত কথা বলতে হয়েছে আমাকে। অবশ্য সব কথাই বানিয়ে বলিনি। ভেবেছি, কী করে রাখব তোমাকে, সেই দুর্ভাবনা থেকে বিয়ের কথা মাথায় আসে। তাছাড়া তুমি ওকে ভালবাস, সেই জোর দেখে আমি অনেক ভুল করে ফেলেছি। অর্জুনকে অস্বাভাবিক লোভী করে তুলেছি। ও এখন এমন করে চাইছে যে, আর ন্যায় অন্যায় বুঝতে পারছে না।

—অন্যায় কিসের ডাক্তারবাবু।

—অন্যায় তো বটেই। ময়ূরী যেমন কারও মা হতে পারে না, তেমনি ও কারও বউ হতেও পারে না। রঙ্গন, ভেবে দ্যাখো...

—আপনিও ললিতাদিদির মতন করছেন ডাক্তারবাবু। ময়ূরী আমাকে বিয়ে করতে চাইছে ডাক্তারবাবু। ও যদি বউ না হবে তবে আমাকে অমন কেন করে।

—কী করে!

—সে আপনাকে বলতে পারব না। ছেলেমানুষ আমরা, আমাদের দোষ ধরবেন না। আমাদের বিয়ে দেন ডাক্তারবাবু। ময়ূরী আমাকে বলেছে, ও রাজি।

আপন মনে প্রায় চোখ বুঁজে বলে ফেলি মনের চেপে রাখা কথা, লজ্জার মাথা খাই। ডাক্তারবাবু কত ভাল মানুষ আমি তো জানি। ওঁকে লজ্জা পাই, ভয় পাই না। ভয় না পেলে তাঁর সামনে নির্লজ্জ হতে বাধা কোথায়। ময়ূরী বউ হতে পারে না। এ আমি বিশ্বাস করি না। ও পাখি দেখে, চাঁদ দেখে, আকাশে ঝড় চিনতে পারে, সরু এবং মোটা মোমবাতি চিনতে পারে। ও এখন

একটু একটু দাঁড়িয়ে উঠতে পারে। কাঁপতে কাঁপতে সামান্য হাঁটতেও পারে। ওকে যথাসময়ে ঘড়িঘণ্টা ধরে খাওয়ালে পরালে, ঠিক সময় মতো পেচ্ছাব পায়খানা করালে, জামাকাপড়ও আর নষ্ট করে না। ও খুশি হলে মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে পোকার মতন পা টেনে টেনে ঘোরে, আমার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। ওর এত উন্নতির কথা কেউ ভাবেনি। ভালবাসা জিনিসটা কী, আমি বই পড়ে পড়ে জেনেছি। ও যে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, সেটাই ভালবাসা।

আমার মনটা তো ডাক্তারবাবুও জানেন না। ময়ূরীর মতন আমিও পাখি দেখে, চাঁদ দেখে, আকাশের ঝড় দেখে, সূর্যাস্ত দেখে, নীল আকাশ দেখে, ফুল দেখে সময় কাটিয়ে দিতে পারি। একটা ঘাস ফড়িঙের সঙ্গে খেলা করতে পারি, কথা বলতে পারি। আমার এবং ময়ূরীর অনেক রঙিন ছবি আছে, প্রকৃতির দৃশ্য। ও আর আমি দেখি। ওকে আমি ভাষা শেখাই। ও জল বলতে পারে, কিন্তু ওর কথা আমি ছাড়া কেউ বোঝে না। জলকে জল না বলে ময়ূরী বলে—খই। মানে, জল দাও। ওকে আমি কথা শেখাচ্ছি, তার যে কী আনন্দ, কেউ বুঝবে না।

ডাক্তার আমার কথা শুনে পায়চারি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েন, তারপর কেমন এক হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়েন। আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওঁর চোখদু'টি সহসা ছলছল করে ওঠে। আমি বুঝতে পারি না, কী অন্যায় কথা আমি বলেছি!

ডাক্তারবাবুর অশ্রুসজল চোখ দেখে আমার ভারি আশ্চর্য লাগে। ডাক্তার সামন্ত বিড়বিড় করছেন—এ অন্যায়! তুমি বুঝলে না রঙ্গনা, তুমি বুঝলে না। আমি কোনও ভাবের কথা বলিনি। আমি বায়োলজির কথা বলেছি, সায়েন্সের কথা বলেছি। বলেছি নিউরোলজির কথা। তুমি চলে যাও। তুমি পাগল। তুমি চলে যাও।

—বিয়ে তাহলে হবে না ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার আমার কথার আর জবাব করেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি মাথা নীচু ক'রে, তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে আসি। ময়ূরী মা হবে না। কেনই বা হবে। ওরা কেউ বুঝতেই চাইছে না, ময়ূরী নিজেই শিশু, ওর মা হওয়ার কথা নয়। সে এক মস্ত শিশু, ফের তীব্র যুবতী, ও একটা আলাদা প্রকৃতি, ও আমার প্রেম। তবে ময়ূরী যে বউ হবে না, একথা মিথ্যা, ওকে ঠিক করে ফুলে, চন্দনে, রঙে, সৌরভে সাজাতে পারলে নিশ্চয়ই ময়ূরী বউ হবে।

বাড়ি ফিরে দেখি ছাদের ফুলের টবে জল দিচ্ছে বালতি আর পেতলের ঘটি করে কেকা। ও আরও সুন্দরী হয়েছে, ময়ূরী ক্রমশ খারাপ হবে, কেকা ক্রমশ ভাল হবে। ধীরে ধীরে দুই বোন আলাদা হয়ে যাবে—একথার পূর্ণ সমর্থন করছে আজকের ছাদের আলো, ফুলগুলি এবং কেকার যৌবন। ওর মুখে, দেহে ফুল্লতা—ওর যৌবন নিজেই যেন আপন গৌরবে আপনাতে বিস্মিত, সেই বিস্ময় এক বিস্ফার, তাজা সুগন্ধ ওর শরীরে। আমাকে দেখে একটু ঘাড় ঘুরিয়ে দৃষ্টি বাঁকিয়ে খুব মিষ্ট করে হেসে ফেলে নিঃশব্দে।

টবে জল ঢালে ঘটি কাত করে একটুখানি, একটু কাত হয়, একটু জল পড়ে। আবার চোখ তোলে আমার দিকে।

—কোথায় গিয়েছিলে! অত্যন্ত মিঠে করে শুধায় কেকা। এত ভাল করে কথা কখনও বলতে শুনিনি। হঠাৎ-ই যেন মেয়েটা কেমন বদলে গিয়েছে। ও আমাকে চড় মেরে কষ্ট পায় বুঝতে পারি। অথচ ওর রাগ যে কী, ও-ও জানে না।

—বললে না, কোথায় গিয়েছিলে। নরম সুরে আবার প্রশ্ন করল কেকা।

—ডাক্তারবাবু ডেকেছিলেন। উত্তর করি।

—ও, আচ্ছা। বলে কেকা টবে জল ঢালে আপন মনে। ও স্নান করায় ওর দেহে কেমন একটা শুচিতার লাবণ্য খেলা করছে, ওর মুখে লেগেছে একটি বড় পাতার ছায়া। কিছুটা রোদ, কিছুটা ছায়ায় মাখা মুখটা কী অপূর্ব হয়ে ফুটেছে ফুলেরই মতন। দেখতে দেখতে হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলি—তুমি আমার বিয়েতে ময়ূরীকে সাজিয়ে দেবে তো কেকা।

কেকা কেমন চমকে উঠে আমার মুখের দিকে চাইল। ওর হাতের ঘটি থেমে গেল। তারপর যেন কষ্ট করে হেসে উঠে একটু থেমে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল—নিশ্চয়!

—তোমার বোন!

—হ্যাঁ, আমারই মতো দেখতে! এ তো আমারই বিয়ে রঙ্গন। বলে ফেলেই দেখি কেকা কেমন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ছটফট করে উঠল, মুখটা ওর মুহূর্তে ছাই হয়ে গেছে। আড়ষ্ট হয়ে যায় ধীরে ধীরে, পায়ের কাছে ছাদের মেঝেয় ঘটিটা রেখে দেয় শব্দ করে এবং নিজেকে আড়াল করতে দ্রুত ছুটে চলে যায় অন্যত্র। ও আজ শাড়ি পরেছিল, আঁচল তুলে গালে চেপে ধরে চোখ আড়াল করে এবং পালায়।

মুখ ফসকে বলে ফেলেছে কেকা, আমি বুঝতে পারি। ও কিছুতেই একথা

বলতে চায়নি। আজ থেকে এক বছর আগে হলেও কেকা একথা বলে ফেলে হয়ত মোটেও লজ্জা পেত না, আজ যে সে শাড়ি পরেছে! শাড়ি পরলেই কি মেয়েরা বয়স্ক হয়ে যায়! ও বলেছিল, ও ইচ্ছে করলেই ময়ূরী হয়ে যেতে পারে, মনে আছে সেকথা। ও সেদিন লজ্জা পায়নি, কিন্তু আজ মুখটা কেমন রাঙিয়ে উঠে শেষে ছাই হয়ে গেল। আমি বাংলাভাষায় মহাকবি কালিদাসের পদ পড়েছি। সেখানে কবি মেয়েদের যৌবন এলে কী হয় বলেছেন।

মেয়েদের পায়ের হরিণী-চাঞ্চল্য চোখের তারায় এসে ঘন হয়, পাদু'খানি ক্রমশ ভারি এবং শ্লথ হয়ে আসে। এই পর্যবেক্ষণ অদ্ভুত। ব্রীড়া বলে একটা বস্তু আছে মেয়েদের, এই মুহূর্তে সেই একটা ভঙ্গি খেলে উঠল কেকার মধ্যে। ওর চোখে তৃষ্ণার চাঞ্চল্য আমি দেখিনি, বই পড়ে মুখস্থ করা জিনিস, দেখার বেলা ছাই মনেও থাকে না সব সময়। যাই হোক, আমাকে যে সব সময় দেখতেই হবে, তারও কোনও মানে নেই। না দেখে থাকা যায়, কিন্তু কথা যে শুনে ফেলেছি, ও কথা কি খুব সিধে যে, কেকারই বিয়ে হচ্ছে যেন। ফের 'যেন' শব্দে একটা দ্বিধা আছে, কেকার কথায় কোনও দ্বিধা নেই, ও এমন করে বলল!

বারবার ও কেন এমন করে ভাবে? ওর লজ্জা দেখে অবাক হই, এবং এই প্রথম আমার মনে হল, ময়ূরী নির্লজ্জ। ওর পা নেই, কখনও ওর পা দু'খানি কালিদাসের পদকে জড়াবে না কেকার মতো অমন মধুর ভাবে, ওর চোখ কখনও এমন চঞ্চল হবে না। লজ্জায় কখনও ময়ূরী রাঙিয়ে উঠবে না।

মেয়েরা রঙ ছাড়াও নিজেকে মধুর করে রাঙিয়ে তোলে নিজের রক্তে, আপন দেহের মধ্যে লীলায়িত হয় লোহিতস্রোত, একেবারে মুখে বয়ে এসে উচ্ছ্বসিত হয়, হা ঈশ্বর! আমাকে তুমি এইসব সৌন্দর্য দেখালে কেন, আমি কেন ময়ূরীকে নির্লজ্জ বলছি! কেকা? তুমি কি আমার সঙ্গে এইভাবে শত্রুতা করবে!

দোতলার বড় ঘরখানিতে নেমে এসে দেখি, কেকা উপুড় হয়ে খাটে পড়ে আছে। ওর মুখটা গুঁজড়ে রয়েছে বালিশে। ওর দেহ অদম্য কান্নায় থরথর করে কাঁপছে।

পায়ের সামান্য ঘষা লেগে মেঝেয় শব্দ হওয়াতে কেকা চমকে উঠে খাড়া হয়ে বসে। আমাকে দেখে বিহ্বল হয়ে যায়। আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জলভরা চোখে আগুন ঠিকরে বার করে বলে—লজ্জা নেই তোমার! এখানে এলে কেন। সবই তোমাকে দেখতে হবে, সবই তোমাকে শুনতে হবে,

তাই না ? তবে শুনে রাখো, ময়ূরী একটা পুতুল, মাংসের পুতুল। খুব তো সাহিত্য পড়, বুঝতে পার না ?

—সাহিত্য পড়ে কী জীবন বোঝা যায়।

—যায় না বুঝি ! তাহলে পড় কেন !

—আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আর। সাহিত্যে জীবনের সব কথা থাকে না কেকা ! তুমি কাঁদছ কেন ?

—তুমি বাবা-মাকে ব'লো না আমি কেঁদেছি ! কথা দাও আমাকে। প্লিজ, ব'লো না কখনও ! বলে খাট ছেড়ে এক লাফে নেমে এসে কেকা আমার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে দু'হাতে পাগলের মতো। আমি এতই অবাক হয়ে যাই যে, কেকার কপালে চোখ রেখে স্থির দাঁড়িয়ে থাকি। ওর চোখের পাতা নত হয়ে ওরই ধরা হাতের উপর নিবদ্ধ, ও চোখ তুলতেও পারছে না—ভয়ও পেয়েছে বুঝি বা।

হঠাৎ-ই আমার হাতের মুঠো করা, হাত জোড়া করে মুঠো আলগাভাবে বাঁধলে যেমন হয়, সেই হাতে তার দু'হাত জড়িয়ে ধরে রেখেছিল কেকা এবং হঠাৎই সচকিত হয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল—তুমি ডায়েরি লেখো, তাই না ? আমার ডায়েরি পড়তে ভাল লাগে, দেবে আমাকে ? কেমন করে লেখো তুমি ? আমিও একটু একটু লিখি, রোজ রোজ পারি না, মনেই থাকে না।

—আমি লিখি নিজের জন্যে, অন্য কেউ পড়বে আমি চাই না।

—এত গুমোর তোমার !

—গরিব মানুষের ডায়েরি তুমি পড়বে কেন ! চাকর-বাকরের ডায়েরি কেউ পড়ে না।

—আমি পড়ব

—না। একটি পুতুলের কথা লিখেছি, আমি পদ্মার কথা লিখেছি, মায়ের কথা।

—পুতুল বলেছি বলে তুমি বুঝি রাগ করেছ ! আচ্ছা, 'ডিজেব্‌ল্‌' মানে কী বল তো।

—ডিজেব্‌ল্‌ ? ইংরাজি কথা ?

—হ্যাঁ।

—ডাক্তারি কথা নাকি !

—তা-ও ধরতে পার।

—কার কথা বলছ তুমি কেকা !

—ওটা ডাক্তারি কথা নয় রঙ্গন। এমনি তোমাকে শুধোচ্ছি!

—এই যে বললে...

—না তোমাকে আমি কেন বলব! যাও, নীচে যা আচ্ছা, 'অবসেসন' মানে জানো, তুমি ইংরেজিটা শিখলে পারতে।

—কে শেখাবে আমাকে?

—আমি। আমি আর শান্তিনিকেতন যাব না, এখানেই ভর্তি হব।

—বাবা যদি তোমাকে জোর করে...

—জোর করলেই হল! আমি যাব না, কিছুতেই যাব না! অত দূরে থাকতে আমার বুঝি ভাল লাগে! একথা বলে কেমন একটা বিষণ্ণ ভঙ্গি করে ঝাড়ন দিয়ে কেকা টেবিলের সাজানো বইগুলি ঝেড়ে মুছে সাজাতে শুরু করল। নীচে নেমে চলে আসি আমি।

তারপর ক্রমশ রঙ্গন অদ্ভুত দুর্বোধ্য কেকার কথা ভাবতে থাকে। ইংরেজি শব্দ দু'টি মাথা থেকে নড়তে চায় না। ময়ূরী একটা মাংসের পুতুল, এই পুতুলটা কি ডিজেবল? অভিধান ঘেঁটে কথাটার অর্থ বার করে ফেলে রঙ্গন। দেখে, কথাটায় তেমন কোনও দোষ নেই। যাকে লক্ষ্মীর মা বালাই ছাড়া ভাবে না, সে যে ডিজেবল, সেকথায় নতুন বিস্ময় তো নেই।

কিন্তু রঙ্গনের সেদিন থেকে কেবলই মনে হতে থাকে ময়ূরী নির্লজ্জ, ওর ব্রীড়া নেই, চোখের তারায় চাঞ্চল্য নেই, ও নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে পারে না। ওকে ঘিরে কালিদাস পদ রচনা করেন না, মাংসের পুতুলের সঙ্গে কোনও মানুষ আজীবন খেলা করতে পারে না। পুতুলখেলা কতক্ষণের, কতদিনের? অসমর্থ বোবাকালা একটি মেয়ে রঙ্গনের বউ, তার পুতুল বউ, ইংরাজিতে 'এ ডিজেবল ডল বাট সি ইজ মাই ওয়াইফ।'

—তুমি পুতুল হয়ে জন্মালে কেন ময়ূরী? আমি শুধু কল্পনা করি, তুমি মানুষ। কেউ তো করে না।

রঙ্গন ময়ূরীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বিড়বিড় করে ওঠে। পুতুল হয়ত কারও মা হতে পারে না, তাই বলে কি বউ হতেও পারে না! তাই যদি না পারে, তাহলে কেকা তুমিও তো পুতুলের বিয়ে দিয়েছিলে ছেলেবেলায়, কেন দিয়েছিলে?

রঙ্গন এই প্রশ্ন করতে চায় কেকাকে। পুতুল পুতুলই, তার আগে ডিজেবল কথাটা বসাবার মানে কি। তুমি হঠাৎ কেন স্মরণ করাতে চাইছ ময়ূরী অসমর্থ, ও বোবা, ও কালা, ওর কোনও অনুভূতি নেই! আমি বিশ্বাস করি না, ময়ূরী

পুতুল মাত্র। তুমি শত্রু, তুমি আমাদের শত্রু কেকা। তুমি কখনও ময়ূরী হতে চাও না ; চাও, এ তোমার ছলনা। তুমি ময়ূরী হতে পারও না ; একথা বাস্তব। তোমার ভারি হিংসে।

দুপুরে নাওয়া খাওয়া হলে, ময়ূরীও যখন ঘুমিয়ে পড়ল, রঙ্গন একটা বোঝাপড়া করবে ভেবে দোতলায় উঠে এল। এসে দেখে খাটের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কেকা, মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গেছে, ওর ফ্রকের পিঠের বোতাম খুলে গিয়ে পিঠের অনেকখানি অনাবৃত হয়ে পড়েছে, ফ্রক ছেড়েছে কেকা, মাঝে মাঝে বাড়িতে পরে। রঙ্গন দেখে কেকার পৃষ্ঠভূমি অনেক পেলব এবং বোধহয় কোমল। তবে এখনও কেকা আর ময়ূরী মূলত, দৃশ্যত এক। এক নয় কি ? হায় ভগবান। এসব কী কথা ভাবছি আমি। আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলাম ? দেখি, কেকার মাথার কাছে খোলা একখানি ডায়েরি পড়ে রয়েছে, কলমটা তারই পাশে খাপ বন্ধ না করা অবস্থায় যেন কেকারই মতো ঘুমোচ্ছে। অনেকখানি লিখেছে কেকা।

আমি জানি আমাকে ডায়েরি লিখতে কোনও ভাবে দেখে ফেলেছে বলেই ওরও শখ চাগাড় দিয়েছে, নইলে খুব কম লোকই দিনলিপির বাতিকটাকে বজায় রাখতে পারে। অবশ্যি ডায়েরি লেখার শখ কবিতা লেখার মতোই বেশ একটা নিভৃত মজা দেয় মানুষকে, অনেকেই করে। কি লিখেছে কেকা। 'অবসেসন' কথাটাও আমার জানা হয়ে গিয়েছে। কেকার কিসের অবসেসন ? ওর গভীর মনে কীকথা আছে ? ময়ূরী হতে চাওয়াটা কি তার অদ্ভুত কোনও ভাবের আচ্ছন্নতা, নাকি আমাকে চমকে দেবে বলে কথাটা ছুঁড়ে দিয়েছে শুধু ?

রঙ্গন ডায়েরিটা হাতে করে তুলে নেয়। আশ্চর্য হয়, লেখার পরিমাণ কম নয়। মাঝে মাঝে লিখেছে, মাঝে মাঝে বাদ দিয়েছে। ওর ভাষা অতি চমৎকার। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, প্রত্যেকটি দিন বা রাতের লেখায় প্রায়শই ময়ূরীর কথা কোনও না কোনও ভাবে এসেছে। অধিকাংশ লেখা শান্তিনিকেতনের হস্টেলে থেকে লিখেছে, বাড়িতে এসেও ডায়েরি ব্যবহার করেছে।

এক জায়গায় লিখেছে, আমি কেকা। ময়ূরী নই। আমার নাম যদি কেকাই রাখা হল তো ওর নাম ময়ূরী হল কেন ? বাবার কল্পনা শক্তি খুব উর্বর বলে মনে করি না। সন্তানের নামের ব্যাপারে বাবা মায়ের অনেক আদিখ্যেতা প্রকাশ পায়, সন্তানকে পরিণত বয়সে নিজেরই নাম বদলে ফেলার অধিকার দেওয়া

উচিত।

আমরা দু'জন এক রকম, কথাটার মানে বুঝে পাই না। অবশ্য এক রকম হতে আপত্তি নেই, ও আমার বোন।

এই পর্যন্ত লিখে নীচের লাইনে মন্তব্য করেছে, কাল রাঙাবউ অনেক করে বলে গেল আমরা কতখানি দেখতে একরকম। ওই মেয়েটা একটা কুটনি। যখন কথা বলে, আমার গা কাটতে থাকে। গত রাতে ঘুমাতে পারিনি।

আরও এক দিনের কথা।

আমি মেনে নিয়েছি, আমি আর ময়ূরী এক। আলাদা নই। সর্বাঙ্গ যদি এক হয় তাহলে রঙ্গন আমাকেও স্পর্শ করেছে। আমার দেহের কোনও গোপনীয়তা ওর কাছে নেই। বুকের গড়ন পর্যন্ত নাকি একই ধরনের, এই চর্চা কি শোভন রাঙাবউ ? তুমি ফিসফিসিয়ে লক্ষ্মীর মাকে বললে, এক দেহ, এক কোমর, বুকের মাপ পর্যন্ত এক, দেখেছ লক্ষ্মীর মা ? ভগবান এত মিল করেন কী করে ?

—তুমি কি মেপে দেখলে নাকি রাঙাদিদি ?

—আমার কি চোখের মাপ নাই রে।

—আস্তে দিদি। রঙ্গন শুনে ফেলবে।

—শুনুক। ও ছোঁড়া মেয়েটার সবখানে হাত দিয়েছে।

এই কথাবার্তা শুনতে শুনতে গতকাল আমি কেমন স্তম্ভিত হয়ে যাই। মানুষ কি সাংঘাতিক অশ্লীল জীব। যখন রাত্রি হল, ঘুমের মধ্যে রঙ্গনকে দেখলাম।

এখানেই সেদিনের দিনলিপি শেষ। রঙ্গন আর কিছুতেই পাতা ওল্টানোর সাহস করল না। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন রক্তের চরম বেগ ছুটে বেড়াতে লাগল। ডায়রির অক্ষরগুলিকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। অথচ এই ঘটনা মোটেও কল্পনা করে লেখেনি কেকা। রাঙাবউয়ের মুখের কথা হুবহুই লিখেছে, ওর কথা বানিয়ে লিখতে হয় না।

রাঙাবউ কী সর্বনাশ করেছে কেকার। অশ্লীল কথার ভেতর থেকে তাহলে কি কেকার বুকের মধ্যে কোনও ভালবাসার জন্ম হয়েছে ? নইলে ঘুমের মধ্যে রঙ্গনকে দেখল কেন কেকা অথবা ওকথা লিখল কেন যে, ওর দেহের কোনও গোপনীয়তা রঙ্গনের কাছে নেই ! তাকেও স্পর্শ করেছে রঙ্গন ! যদি একে ভালবাসা বলতে হয় তাহলে ভালবাসা কি বিচিত্র বস্তু।

রঙ্গন আর চিন্তা করতে পারছিল না। হাত পা অসম্ভব কাঁপতে শুরু

করেছিল। কেকার মাথার কাছে ডায়েরিটা আগের মতো খুলে রাখতে গিয়ে ভয় করতে লাগল তার। কোনও প্রকারে ডায়েরিটা রেখে দিয়ে পালিয়ে এল সে। নীচে নেমে চলে এল।

ময়ূরীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন দুপুরে রঙ্গনের মাথায় 'ডিজেবল' কথাটির প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটিত হয়ে যায় আপনা থেকে। রঙ্গন বুঝতে পারে, ময়ূরীর স্বাভাবিক যৌন-ক্ষমতাও নেই। পুরুষের কাছে ময়ূরীর দেহ এক মস্ত প্রতারণা। 'মাংসের পুতুল' কথাটি কী মারাত্মক হয়ে বেজে ওঠে তখন। ডাক্তার পরিমল সামন্ত যে বলেছেন, ময়ূরী কারও বউ হতেও পারে না, তাহলে কি ওই কথার একটা গভীর বৈজ্ঞানিক অর্থ রয়েছে ?

সুযোগ ঘটে যায় একদিন আবার কেকার ডায়েরি পড়ে ফেলার, সেদিন কেকাও কোনও বন্ধুর বাড়ি দুপুরে বেড়াতে গেছে, বাবা এবং মামণি চাকরিতে গেছেন, নীচে লক্ষ্মীর মা ঘুমিয়ে, রতনকে আঁচলে শুইয়েছে, দু'জনই কাঠ। খুব জোরে ফ্যান চলছে, শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। উপরে দোতলায় ডায়েরিখানা হাতে পেয়ে যায় রঙ্গন।

একজায়গায় কেকা লিখেছে, সামন্ত ডাক্তারবাবু আমাকে প্রায় স্পষ্ট করেই বলেছেন, ময়ূরী ডিজেবল, কোন সুস্থ মানুষ ওকে বিয়ে করতে চাইবে না। আলটিমেট মানুষ খাওয়া শোয়া এবং যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে একেবারে অকপট পশু। এবং এই পশুত্বেই রয়েছে মানুষের স্বাভাবিকতা। যৌনবাসনা ছাড়াও ভালবাসা ভাবের চোখে সম্ভব, ডাক্তারি চোখে অসম্ভব। নারী পুরুষের সম্বন্ধ যৌনতা-নির্ভর, সেটি কোনও কারণে ব্যাহত হলে মানুষের জীবনটা শুষ্ক এবং বিকৃত হতে পারে। একদিন রঙ্গনের পক্ষে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, ময়ূরীকে আগলাতে আগলাতে সে-ও জড়পিণ্ডে পরিণত হতে পারে। ডাক্তারবাবু যেদিন এই সব কথা বুঝিয়ে বললেন সমস্ত রাত ঘুমাতে পারলাম না। ময়ূরীর সঙ্গে মানসিক আদান-প্রদানের চেষ্টা মানবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু দাম্পত্য রচনা এক আশ্চর্য অদ্ভুত প্রস্তাবনা। বিয়ে দিলে রঙ্গনের 'মেন্টাল ইনভলভমেন্ট' ঘটবে ময়ূরীকে ঘিরে, সেটা শুনতে ভাল, কিন্তু সেটা পায়ে বেড়ি পরানোর সামিল। সব বুঝেও মা বাবা চুপ করে রয়েছেন হরিমতীকে পর্যন্ত তার ছেলের বিয়ের খবর দিতে চান না এখন আমার কী করা উচিত, আমি যে ভালবাসি

অত্যন্ত পাকা বুদ্ধির মানুষের মতো করে লিখেছে কেকা। পশুত্বেই রয়েছে মানুষের স্বাভাবিকতা একথা পড়ে রঙ্গনের শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করতে

থাকে। ডাক্তার পরিমল সামন্ত ঠিক এই ভাষাতেই বলে থাকবেন, কেন না উনি বড়ই আশ্চর্য কথা বলতে পারেন। এক জায়গায় কেকা আরও বিস্ময়কর কথা লিপিবদ্ধ করেছে, মানুষের যৌনতা পশুর চেয়ে উন্নত সেখানে, যেখানে নরনারী তাদের যৌন-জীবনকে ঘিরে একটা ভাবের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে পারে। মানুষের যৌনতা ভাষা দিয়ে, ভাব দিয়ে গড়া। ময়ূরীর কি সেই সব আছে ?

পড়তে পড়তে একেবারে হৃদয়টাই হু-হু করে কেঁদে ওঠে রঙ্গনের। সে কখনও এমন করে ভাবেনি, ভাবতে চায়নি। পশুত্বের স্বাভাবিকতা মানুষের আছে, ক্ষুধায়, পিপাসায় এবং যৌনতায়, রঙ্গন বইতে পড়েছে, কিন্তু ভাব আর ভাষার মন্ডন আছে সর্বত্র, মোদ্দা কথাটা এই রকম। এত কথা কেকাও বুঝে ফেলেছে, ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে ছেড়েছেন তাকে। ভাষাই মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে দিয়েছে, কথাটির গূঢ় সঞ্চার ঘটে যায় রঙ্গনের বুদ্ধি-কৌশলের সমস্ত স্তরে, সে চমকে ওঠে। কখনো ভাবিনি তো ! কখনও ভাবিনি।

রঙ্গন, তুমি কি জানতে না ময়ূরীর ভাষা নেই ! তাহলে এত বিচলিত হচ্ছ কেন ? মাংসের পুতুলকে ঘিরেই তো তোমার মনের জগৎ গড়েছ, ভাবের পৃথিবী রচেছ, এখন কেন কষ্ট পাচ্ছ, কান্না পাচ্ছে কেন তোমার ?

কেকা অন্যত্র অন্য পৃষ্ঠায় লিখেছে, রাঙাবউ বোঝে না, যার ভাষা আছে, সে এবং যার তা নেই, এই দু'জন দেখতে এক হলেও কত আলাদা। ডাক্তারবাবু যদি এভাবে না বোঝাতেন তাহলে আমি নিজেই একদিন ময়ূরী হয়ে যেতাম। ভাগ্যিস, আমি কখনও ময়ূরী হব না ! আমি ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, ডাক্তারবাবু আমাকে রক্ষা করেছেন। ভাবতে খারাপ লাগে, আমি রক্ষা পেলেও, রঙ্গন কখনও আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

—ময়ূরী ! তুমি আমাকে মুক্তি দাও ! বলে অসহায় নির্বাক কিশোরীর দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো করে উঠি আমি। ডুকরে উঠি। দেখি, মনের ভিতর থেকে কে যেন কথা বলে উঠল—এই তো সবে শুরু ! সমস্ত জীবন মুক্তি চেয়ে কাঁদতে হবে তোমাকে, মুক্তি তো পাবে না। লতা যখন গাছকে জড়ায় গাছকে কি সে ছাড়ে ! ময়ূরী জড়াতে জানে, ছাড়তে জানে না, পালাও। এখনও সময় আছে।

আমি যখন ময়ূরীর দু'হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছি, দেখি ওর চোখের তারায় ব্যথিত আলোড়ন হচ্ছে, একটা বোধের জন্ম হচ্ছে, কী সেই বোধ, কী সেই মায়া, আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না, ময়ূরী তো পারে না আমার চোখের

জল মুছিয়ে দিতে। কেঁদ না, আমি তো রয়েছি, একথা বলতে পারে না অসহায় জীবটি। তবে ও কেন আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছে!

এই করুণাঘন আকুল দৃশ্যটি দেখে ফেলে কেকা। কখন সে বন্ধুদের কাছে থেকে ফিরেছে এবং ময়ূরীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি।

কেকা ডেকে উঠল—রঙ্গন! তোমার চোখে জল! জানি, পুতুলের জন্যও মানুষ ব্যথা পায়! এত ভালও কি বাসতে পার! শোনো! উপরে এসো।

ময়ূরীকে নীচে রেখে উপরে আসতেই কেকা বলল—আমার ডায়েরিটা এখানে পড়ে আছে কেন! ফিরে এসে দেখি, আলমারি থেকে কে বার করে রেখেছ।

—আমি জানি না, তুমিই হয়ত ভুল করে খাটের ওপর ফেলে রেখে গেছ!

—না। এ হতেই পারে না! তুমি পড়েছ?

—না।

—দ্যাখ, মিথ্যে কথা বলবে না। তুমি কাঁদছিলে কেন অমন করে?

—মায়ের কথা মনে পড়েছিল কেকা!

—তোমার মা এসেছে।

—কোথায়?

—দাঁড়াও। আগে হরিমতী থিতু হোক। শোন। বিয়ের কথা একদম বলবে না।

দোতলার ঘর থেকে ছুটে বার হয়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমেই মাকে দেখতে পায়, মায়ের পায়ের কাছে প্রায় লুটিয়ে পড়ে বলি—হামরাকে নিয়ে চল্ মা। আমি থাকব না, কিছুতেই থাকব না।

কেকা এই দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়ে, লক্ষ্মীর মা শব্দ পেয়ে জেগে ওঠে। রতন একটু একটু কেঁদে চোখ কচলাতে কচলাতে মুঠো হাত রগড়াতেই থাকে চোখে, মায়ের আঁচল ধরে থাকে।

লক্ষ্মীর মা বোকার মতো মুখ ফসকে বলে—আজ বাদ কাল বিয়ে...বলেই জিভ কাটে, তারপর সামলানোর চেষ্টা করে—পাশের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে হরিমতী! এখন কোথায় যাবে, নিয়ে যেও না। একবেলা থাকো, কাল ভোরে চলে যেও।

ভেবেছিলাম, মাকে সব বলে দিই। পারলাম না। দেবপ্রিয়া, অর্জুন আমাকে এমনই শক্ত করে আগলে রাখলেন যে, মাকে বলার সুযোগই পেলাম না। কেকা এবং লক্ষ্মীর মা আমাকে পাহারা দিয়ে থাকল। বোকা রতন পর্যন্ত

মায়ের কাছাকাছি দেখলে, হেঁকে ওঠে—অ্যাই মা, কথা বলছে গো।

সব আঘাত ভুলতে পারব, রতনের ওই হাঁক সমগ্র জীবন অন্তরে দগ্ধাবে আমাকে। নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর মা তার ছেলে রতনকে সাবধান করে বলেছিল, দেখিস ওরা মা-ছেলে ফিসফিস করে কথা না বলে, একঠাঁই হলেই চেঁচাবি।

চাকরের জীবন, একজন অক্ষম মানুষের জীবন এমন এক আশ্চর্য নাটক দেখে, যা তার পক্ষে অনিবার্যই ছিল। মা যখন বিদায় নিচ্ছে, বারবার চোখ তুলে বন্দী ছেলেকে দেখছে, মার মুখের ভাষাটি এ বাড়ি কেড়ে নিয়েছে, মায়ের চোখে চাপা অশ্রু ঝিকিয়ে উঠছে, আঁচলে চোখ মুছে নিচ্ছে মা। মায়ের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। তারপর পদ্মার গ্রাসে চিরতরে তলিয়ে গেল আমার জননী।

বিয়ের দিন অর্জুনবাবু যাদের ডেকেছিলেন সব তাঁর চেনাজানা এবং সুহৃদ। ডাক্তারবাবু ছিলেন। না ডাকলেও রাঙাবউ উপস্থিত হয়েছিল। একটু দূরে চন্দনশোভিত কনে ময়ূরী। শাড়ি পরানো হয়েছে ওকে, গয়না দিয়েছেন মামণি, সুগন্ধে ম ম করছে সারা ঘর, নীল বেনারসী আর লাল টকটকে ব্লাউজ ঝলমল করছে। সোনার ঔজ্জ্বল্য ওকে ঘিরে ঝলসিত করছে ওর রূপ। ও প্রায় পাগলের মতো আমার দিকে চেয়ে আছে।

রাঙাবউ হঠাৎ শুধু বলে উঠল—দেখেছ, কী মর্মান্তিক ঘটনা, চোখ দিয়ে গিলছে! কনে তো সেজেছিস, বরের সাধ পূরণ করবি তো ময়ূরী!

সস্নেহেই বলেছিল রাঙাবউ, কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা কেমন গুমরে উঠল। একটা মস্ত ফাঁকি ছাড়া এ বিয়েকে আমার আর কিছুই মনে হল না।

ডাক্তারবাবুর পায়ের উপর পড়ে গেলাম আমি, বললাম—এ বিয়ে দেবেন না ডাক্তারবাবু, এখনও আমি মন্ত্র পড়িনি।

হঠাৎই বাড়ির আবহ কেমন ম্লান হয়ে গেল। ডাক্তারবাবুর মুখটা কালো হয়ে উঠল নিমেষে। অর্জুনবাবুর চোখমুখ রাঙা হয়ে গেল। মামণি সহসা ফুঁপিয়ে উঠলেন। মুহূর্তে আমি সবার মুখের আনন্দ শুষে নিলাম। কেকা স্তম্ভিত হয়ে পিঠ দেওয়ালে ভর করে দাঁড়িয়ে। বিমূঢ় ভঙ্গিতে কোথায় পালাবে বুঝে পেল না।

তারপর কেকা আমার কাছে ছুটে এসে হাত ধরে টেনে তুলে বলল—আর হয় না রঞ্জন! আর হয় না!

—হয়। আমি পারব না।

কেকা আমাকে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে আসে। কাউকে আসতে দেয়

না। কেউ আসেও না।

চাপাস্বরে কেকা বলল—বিয়ে তো তোমাতে আমাতে রঙ্গন। তুমি বোঝ না! আমার কথা একবার ভেবে দ্যাখ! লগ্ন চলে গেলে আমার কী হবে।

আর আমি ভাবতে পারি না। কিছুতেই ভাবতে পারি না। কেকা ছাদেই দাঁড়িয়ে থাকে, আমি ছুটে আসি ময়ূরীর কাছে। ও তখন আমার হাত আঁকড়ে ধরে ডেকে ওঠে—মা!

মামণি অতি অসহায় সুরে ডুকরে উঠলেন—তোকেই মা বলে ডেকেছে রঙ্গন, আমি তো পর। অ্যাই পোড়ারমুখী, কাকে তুই মা বলে ডাকছিস। বলেই মামণি ময়ূরীকে মারেন। আমি আর সহ্য করতে পারি না। মামণি'র হাত চেপে ধরে বলি—ছেড়ে দাও। ময়ূরীকে মেরো না মামণি। দেখি, চন্দন মাখা মুখে চেলির আড়ালে বউ ময়ূরীর চোখে 'অশ্রু' চমকে উঠেছে, ও হাসছে।

তারপর বিয়ে হয়ে গেল আমার। বিয়ের রাতে সবাই যখন ফিরে চলে গেছে, আমি যখন সম্পূর্ণ একা, ডাক্তারবাবু বিদায় নেওয়ার আগে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন—তোমাকে আমি সমস্তই বলেছি রঙ্গন। দুঃখ লাগছে, শেষ অবধি তোমার উপর জোর করতে হল। কেকা না চাইলে এ বিয়ে হতই না। কেকাই সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছে, বুঝতে পারছি।

—আপনাকে বলল বুঝি কেকা?

—হ্যাঁ, বলল বইকি! বন্ধুদের কাছে পর্যন্ত গল্প করল। চলি তাহলে। তুমি সুখী হও। বলে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলেন বাড়ি ছেড়ে। ময়ূরীর ঘরে ঢুকে দেখলাম, ময়ূরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

সমস্ত বাড়ি নিশুত হলে দোতলার ছাদে উঠে আসি একা। ক্রমাগত একটি অনুভূতি হয়, আমার সঙ্গে ময়ূরী নয়, কেকার বিয়ে হয়েছে। একটি অদ্ভুত সর্বনাশের বীজ রক্তে ঢুকিয়ে দিয়েছে কেকা। বুঝতে পারছি, আমি আর কিছুতেই সুখী হতে পারব না।

আকাশে পূর্ণশশী, ফিন ফুটছে জ্যোৎস্নায়। ময়ূরী ঘুমিয়ে পড়েছে। তেতলার ঘরে উঠে গেছেন বাবা। মা আর মেয়ের সংলাপ কানে আসে।

মা বলছেন— কী করে রাজি করালি শেষটায়?

কেকা বলল— বললাম, তোমাতে আমাতে বিয়ে রঙ্গন। বুঝতে পারছ না?

মামণি বললেন— কেন বলতে গেলি ওকথা।

কেকা বলল— পাগলকে কী বোঝাব মা। চাকরকে বশ করতে হলে,

অনেক মিথ্যাই বলতে হয়। এমন বণ্ডেড লেবার আর তুমি পাবে না! এবার তুমি আর বাবা সত্যি করে নিশ্চিন্ত হলে। তবে একটা ব্যাপার, ওকে কিন্তু ময়ূরীর কাছে রাত্রে শুতে দেওয়া উচিত না। উপরে ডেকে আনব?

—কেন বাছা, হিংসে করছিস, যা ইচ্ছে করুক।

—হিংসে কেন বলছ মা! ময়ূরী জানেই না ওর বিয়ে হয়েছে। একথা রঙ্গনকে বোঝানো দরকার।

—আর বোঝাতে হবে না তোকে।

—কাল আমার রেজাল্ট বেরবে। শান্তিনিকেতন যাব শীগগির। কী যে আনন্দ হচ্ছে মা!

শুনতে শুনতে প্রবল এক ঘৃণায় ভরে গেল রঙ্গনের বুক। তীব্র জ্বালা করতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

ওরা কেউ আমাকে তাড়িয়ে দেয়নি, চলে যাও বলেনি, বরং ওরা সবচেয়ে শস্তায় কিনে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে শস্তার চাকর হিসেবে ময়ূরীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল। কেকা যদি অমন করে ভালবাসার ছলনা দিয়ে ওই একটা সত্য কথা বিয়ের রাতে উচ্চারণ না করত, তা হলে জীবনভর বুঝতেই পারতাম না, আমি আগাগোড়া চাকর এবং আশ্চর্য আমার চাকরি।

ওরা যে আমাকে খুব অপমান করেছে, তা আমি মনে করি না। কেকা যেমন করে বলেছিল, তোমাতে আমাতে বিয়ে রঙ্গন, তাতে এখন মনে হয় অতটুকু মেয়ের অন্তরে কী পরিমাণ ভয়ংকর স্বার্থবুদ্ধি ছিল!

রাগটা কেকার উপর হল না, রাগ গিয়ে পড়ল ময়ূরীর উপর। কেকার কথার মধ্যে যে ধরনের অতর্কিত ছোবল ছিল, তা যত গরল আমার শরীরে ঢেলেছে, তা বহন করবার সাধ্যই যেন ছিল না আর! শুধু অপমান বললে এই আচরণের আসল প্রতিক্রিয়া বোঝানো যায় না, তাই একে আমি শুধু অপমান বলি না। ওরা আমাকে অপমান করেনি, তাড়িয়ে দেয়নি। ময়ূরীর উপর রাগ করে কাউকে কিছু না জানিয়ে, আমি অতি নিঃশব্দে ও বাড়ি থেকে চলে এসেছি। বুঝতে পারি না ময়ূরীর উপর এত রাগ, এত ঘৃণা কেন আমার অন্তরকে দগ্ধাতে থাকল সমস্ত রাত, কিছুতেই ঘুমাতে পারলাম না।

কিন্তু ময়ূরীকে বললাম না যে, তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি ময়ূরী! ভাবতে

পারি না, যখন চলে আসছি, তখন প্রত্যূষও হয়নি ঠিক, আঁধার সামান্য হালকা হয়েছে, মুখ দেখা যায়, অত ভোরে ময়ূরী জেগে উঠেছে, ওরও কি সারারাত ঘুম ছিল না ! ওরও কি অন্তরে বিয়ের উত্তেজনা ছিল ! ময়ূরী কি বুঝতে পেরেছিল, গত রাতে তার বিয়ে হয়ে গেছে !

ওকে ওর হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিলাম, এই কাজটুকু করার পরই মনে হল, প্রতিদিনের সেই সব অভ্যস্ত কাজে আমি ফের জড়িয়ে যেতে চাইছি, কেকারা দেখে খুশি হবে যে, চাকরটা আজ ভোর থেকে পুরোপুরি চাকর হয়ে গেছে, আরও মন দিয়ে কাজ করছে। কেকারই সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ভেবে পাগলের মত আনন্দে কাজ করে যাচ্ছে, একজন ক্রীতদাসের বুদ্ধি দেখে কেকা তা হলে আর হেসে বাঁচবে না।

দেখি, আমার মুখের দিকে ময়ূরী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। কেকার কথার প্রতিবাদ আমি করব, কোনও মায়াই আমাকে আটকাতে পারবে না। নির্লজ্জ ময়ূরীকে বোঝানো দরকার ও একটি আদিম মানবী, ওর ভাষা নেই, ওর ভাব নেই, সে একটি জড়পিণ্ড, ও দেখতে অসুন্দর, ওর নারীত্ব একটা মস্ত ছলনা, প্রকৃতপক্ষে ময়ূরীই আমাকে ঠকিয়েছে। যতই অসহায় হোক ওর চক্ষুদুটি, যতই সে আনন্দে হেসে উঠুক, যতই আকাশের চাঁদ ওকে মুগ্ধ করুক, আমি ভুলব না যে, আমি কে। ওর হাসি বিশ্রী, ওর চাহনি কুৎসিত, ওর সর্বাঙ্গ একটি পুতুলের মতো মাংস নির্মিত, যা বস্তুত কাঠ।

চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে যেই আমি চলে আসব, পা বাড়িয়ে দিয়েছি দোরের দিকে, হঠাৎ আমার জামার খুঁটে টান পড়ে। ও মা। কাণ্ড দ্যাখ, এই বউটা বেড়ালের মতো করছে, পাখির মতো করছে, কুকুরছানার মতো করছে।

—মা।

—পোড়ারমুখি, কে তোর মা। আসল মা তো উপরে শুয়ে শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, কই তাকে ডাকতে পারিস না ! মাকে চিনতে পারিস না। হতভাগী, আমি তোর কে, কেউ নই ! ছেড়ে দে আমাকে। আমি রঙ্গন, আমি একজন স্বাধীন মানুষ, পদ্মার ধারে আমার বাড়ি, আমার বাবার তেরো কাঠা জমি আছে, আমার দুটো বোন, একটা ভাই আছে, মা আছে। আমার সব আছে। তোকে আমি চিনি না।

—মা।

—আবার মা। ওই একটা ডাকই কেন ভগবান তোর মুখে দিয়েছিলেন ! মা শব্দটার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শোষণ, আজ আমি বুঝতে পারি।

ভগবান ষড়যন্ত্র করেন সবচেয়ে ক্ষুদ্র শব্দ দিয়ে, সমস্ত মমতা উৎপন্ন করেন ক্ষুদ্রতম শব্দের সাহায্যে, বোবা এবং কালাকেও তিনি ওই শব্দটি দান করেন। করেন এই জন্য যে, তিনিও ক্ষুদ্র শব্দ মাত্র, ওঁ। শুধু একটি ধ্বনি। ছেড়ে দে ময়ূরী, আমি চলে যাব।

'মা' শব্দটি নিয়ে আমার মতো খুব কম লোকই এত নানাখানা করে ভেবেছে। দেবপ্রিয়াও ভাবেননি এত এত এত। তাঁর দুঃখ, মেয়ে তাকে মা বলে ডাকেনি। কেউ যদি 'মা' কথাটি বুঝতে চায়, তা হলে তাকে ময়ূরীর 'মা' ডাক শুনতে হবে। সবচেয়ে অসহায় যে, তারই আর্তনাদ 'মা'। এইভাবে ময়ূরীর ওই ডেকে ওঠা ক্ষুদ্র ধ্বনিটুকু আমাকে আকুল করেছে নিরন্তর, মাতিয়েছে। তার সেই মুখ-বিবর উদগত ধ্বনি আমাকে নিস্তার দেয়নি সেই থেকে। সে অসহায় বুঝি, কিন্তু নিষ্ঠুরও কি নয় যে, ওই ডাকটাই তার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল।

মা মা করে কবিরা গান বেঁধেছে কত। বঙ্কিমচন্দ্র মা মা করেছেন দেশপ্রেমের নামে। চাষী তার জমিকে মা বলে ডেকেছে। গরিব দেশের মানুষ মা ডাকতে বড়ই ভালবাসে। মরবার আগে মানুষ মা ডেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, প্রাণ বার হয়ে ছুটে যায় আকাশে মা ডাকতে ডাকতে। একবার এক মুসলমান ধর্মভীরুকে মৃত্যুর আগে আল্লা ডাকতে বলছিল লোকেরা, দৃশ্যটা দেখেছি। আল্লা আল্লা করতে করতে সে কিন্তু শেষ ডাকটি ডেকেছিল—মা!

মা আর ঈশ্বরকেও মানুষ একাকার করে ছেড়েছে। একটি জড়পিণ্ডের প্রাণটিও ওই ডাকটার মতলব বোঝে, শোষণ করতে হলে, মা ডাকটিই শ্রেষ্ঠ, বোঝে, ময়ূরী নিশ্চয়ই বোঝে।

প্রচণ্ড ঘৃণা হল আমার। দু' দুবার ময়ূরী আমাকে মা বলে ডাকল। আমি জোর করে জামার খুঁট ছাড়িয়ে নিয়ে সরে চলে এলাম দোরের কাছে। কিন্তু ওই দৃশ্য, ওই সেই অসহায় চোখ, ও ভাবে টেনে ধরা, চোখে কিছু কান্নার আভাস, সর্বস্ব হারানো সেই মুখচ্ছবি এখন আমারই চোখে মুখে সেঁটে বসেছে।

আমার কেউ নেই, কিছু নেই। ময়ূরীর অভিশাপে আজ আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। পদ্মা আমার সব কেড়ে নিয়েছে। কেন এমন হল! ওকে আমি ঘৃণা করলাম বলেই কি এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল! মা ডাকে যার এত ঘৃণা, তার তো মা থাকে না।

কোথায় যাব এখন, কার কাছে যাব। কেউ আমাকে চেনে না, কাউকে আমি চিনি না। শিবু বৈষ্ণব মরে গেল, সে আমায় চিনতে পারল না। ও বলে গেল, জীবন একটা মিথ্যা কথা।

ক'দিন আগে, খবরের কাগজে একটি অবাক করার মতো খবর ছাপা হয়েছিল। একজন যুবক একটি সাইকেল করে ভারত-ভ্রমণ করছে, সঙ্গে সে তার সাইকেলের পিছনে মাকে বসিয়ে নিয়েছে একটা ডুলিতে। ছেলেটা যাচ্ছে এক জেলা থেকে আর এক জেলা, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্য, সড়কের পর সড়ক অতিক্রম করে চলেছে বিচিত্র দেশে, দেশান্তরে, মা রয়েছেন সঙ্গে, মাকে টেনে নিয়েছে চলেছে তার সন্তান। বোকা মাতৃভূমির ছেলেরা সব পাগল।

দেশপ্রেমিক নেতারা তাই বুঝেছিলেন, এই দেশটাকেই মা বলে ডাকাতে না পারলে স্বাধীনতার জন্য কেউ প্রাণ দিতে চাইবে না। ডাক্তার পরিমল সামন্ত বুঝেছিলেন, রঙ্গনকে ময়ূরী মা বলে ডেকেছে, ছেলেটা আর পালাতে পারবে না। মা দিয়ে সব হয়, কিন্তু চাকর কখনও মানুষ হয় না।

খুব খিদে পেয়েছে আমার, তেষ্টায় প্রাণটা শুকিয়ে মরে আসছে যেন। যেখানে 'ভাত আছে', সেখানে যেতে হবে আমাকে। শ্রীকণ্ঠ দাস শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার আশ্বাস শেষ হয়ে যায়নি। এত বড় পৃথিবীতে কোথাও কি তেষ্টার জল আর খিদের ভাত পাব না! চাকরের কাজ করার অভ্যাস আছে আমার রক্তে। কিন্তু কোথায় চাকরি!

বাস-কন্ডাক্টর আমাকে বাস থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে পথের উপর। আমার কাছে ভাড়ার পয়সা ছিল না। এই প্রথম বুঝলাম, ময়ূরীদের বাড়ির বাইরের পৃথিবী খুব সহজ নয়। আমি পাগল হলেও, বাইরের চেহারা-পোশাকে পাগলের ছাপ নেই, কন্ডাক্টর শুনবে কেন। পাগলের জন্য ফ্রি বেড়ানো, ফ্রি খাওয়া দাওয়া আছে, তা ছাড়া পাগলদের শীত আর খিদের অনুভূতি হয়তো কম। আমার ক্ষেত্র আলাদা, পাগলের সর্বস্ব হারানোর বোধ শেষ অবধি থাকে না। ওরা পৃথিবীকে মিথ্যা বলতে পারলেই খালাস। শিবু বৈষ্ণব শেষটায় পাগল হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি।

অনেক হেঁটে আমি এই গঞ্জটায় পৌঁছতে পেরেছি। একটা ভাতের হোটেলও খুঁজে বার করতে পেরেছি। পাগল সেজে এখানে ভাত সাবড়ে নিতে পারলে, এ যাত্রা প্রাণটা বাঁচত। কিন্তু তেমন পাগল কী করে হব!

আমার চোখে হঠাৎ হঠাৎ কোনও কোনও মানুষকে ভরতপুরের লোক বলে

মনে হচ্ছিল। পাশ থেকে, পিছন থেকে, একটু দূরে আলো-আঁধারে দাঁড়ানো মানুষকে সহসা মনে হয়, ওই তো সেই মানুষটা, অমুক চাষী, তমুক ক্ষেতমজুর, পাঁচবিঘে জমির মালিককেও আমরা চাষী বলি, তাই, তাকে দেখে মনে হয় সেই চাষীটা, আসলে সব খাটনে লোকের দল, তাদেরই একজন ওখানে দাঁড়িয়ে! ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই তার কাছে। পরনে খাটো লুঙ্গি, গায়ে হাফহাতা জ্যাকেট, মুখে কালো দাড়ি, গোঁফ কামানো, মাথায় খোঁট করা চুল। মগরিব শেখ।

যখন কোনও এক সন্ধ্যায় অনেক কাল আগে মগরিব জন্মালো, তখন মসজিদে আজান হচ্ছিল, তাই ওর নাম রাখা হল মগরিব শেখ। ঠিক ওই মগরিবই পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গুণ্ডিদোক্তার পান কিনছে, ওই তো মুখে পুরল পানের খিলি।

কাছে এসে ডেকে উঠলাম—মগরিব চাচা।

ও ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। তারপর গাঢ় করে পিক ফেলল মাটিতে। দু আঙুলে কষ মুছে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়ে নাচিয়ে আবার কাঁধে ফেলে লোকটা হাসল একটুখানি। আমি লজ্জা পেয়ে সরে চলে আসি।

কত মানুষকেই আমার ভরতপুরের মানুষ বলে মনে হয়। অথচ কেউ আমাকে চিনতে পারে না। কেনই বা চিনবে! সত্যিই তো কেউ তারা ভরতপুরের জন-মানুষ নয়। ভরতপুরের কেউ কোথাও যদি বেঁচেও থাকে, তার সঙ্গে দেখা হওয়া কি সহজ! বুঝতে পারছি, আমি সব হারিয়েছি। পৃথিবীর সঙ্গে আমার সব যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

হোটেলের মালিক একজন মেয়ে। হোটেলের কপালে লেখা আছে, রানির হোটেল, খাসপুর। রানি বানানটা ওই রকম। মেয়েটার পিঠ ছাপানো চুল, অমন চুল দেখে মনে হয় ওর খুব মায়া।

ছেলেবেলায় ময়ূরীদের ওখানে চাকরি করতে যাওয়ার আগে একবার আমি স্নানের ঘাটে ডুবে মরছিলাম। আমার কাছাকাছি প্রায় গা ঘেঁষে চান করছিল নয়ন বউ। ওর ছিল মস্ত চুলের গোছ। আমি সাঁতার জানি না। পাষাণের উপর থেকে আমার পা হড়কে যায়। ঠিক তখন ঝপ করে নয়নের চুলের গোছ আঁকড়ে ধরি, সে আমাকে ফেলে দেয়নি সেদিন, দাঁতে দাঁত চেপে স্রোতের প্রবল ধাক্কার মধ্যেও রক্ষা করেছিল। ওর যদি অমন লম্বা চুল না থাকত, আমি বাঁচতাম না। মেয়েদের ওই ধরনের দীর্ঘ কালো মসৃণ কেশরাশ দেখলেই মনে

হয়, মায়ায় ভরে আছে ওই মেয়েটার হৃদয়, ও আমাকে বাঁচাবে।

রানি আর নয়ন তো একই মানুষ। এখানে যদি আমার আশ্রয় হয়, তাহলে বুঝব আমি নয়ন বউয়ের কাছেই রয়েছি।

একটা বাচ্চা ছেলে ডোলে করে জল বইছে। ওর ইজের প্যান্টের দড়ি কেটে গেছে, বাঁ হাতে প্যান্টের তলপেটের অংশ জড়ো করে ধরেছে, পাছে প্যান্ট খসে পড়ে যায়। বালতির জলের ভারে ওর কোমর বেঁকে গেছে। ও আর পারছে না। হাঁপিয়ে পড়েছে, খিদেয় ওর পেট খাদে ঢুকে গেছে, ওর বুকের হাড় গোনা যায় এখন, কাজের চাপে আর ঘন ঘন নিঃশ্বাসে। ওকে দেখে আমার খুবই মায়া হচ্ছিল। মন বলছিল, ওকে আমি সাহায্য করি।

ছেলেটা ডোল মাটিতে রেখে কোমর যেই সিধে সটান করবার জন্য গা ঝাড়া দিল, অমনি অসতর্ক ভুলে ওর হাতের মুঠো খসে যায়, দড়িহারা ইজের ঝপ করে পড়ে যায় পায়ের কাছে। ওর নগ্নতা দেখে ফেলে লোকে। দেখা যায়, ওর পুরুষাঙ্গের চারপাশ কোমল মৃদু রোমে ঈষৎ কালো হয়েছে, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছে। লজ্জা পাচ্ছে না কেন ছেলেটা। ধীরে ধীরে হাতদুটি নামিয়ে সে নিজেকে ঢাকল। একটা ঢ্যাঙা মতন লোক, যে কি না রাঁধুনি, রান্না ফেলে ছুটে এসে নতুন কিশোরটিকে কাতুকুতু দিতে থাকে, কিশোরটি লাফায়, ওর নগ্নতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ও হাসতে হাসতে মাটিতে শুয়ে পড়ে। রানি তখন গা কাঁপিয়ে হেসে ওঠে।

এই দৃশ্যের মধ্যে কী আনন্দ আছে আমি বুঝে পাই না। ঢ্যাঙা লোকটা কিশোরকে নগ্ন করতে চাইছে, প্যান্ট পরতে দিচ্ছে না, এই নগ্নতা কি উপভোগ্য তার কাছে! ছেলেটাই বা কেমন, নগ্ন হয়েও হাসে! লজ্জা সে যেমন পায় না, ময়ূরীও পেত না। কিশোরের ওই নগ্নতা ময়ূরীর নগ্ন সৌন্দর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। তার অলজ্জ প্রকাশ ময়ূরীকে স্মৃতিপথে টেনে আনে। আমি বউ ময়ূরীকে কখনও উপভোগ করিনি। তার নগ্নতা আমার চেনা এবং পবিত্র। এই কিশোরের স্বচ্ছ দেহ দেখে ময়ূরীর স্বচ্ছতা মনে পড়ে। পৃথিবীর কাউকে আমি বোঝাতে পারব না, কালিমা আমারও আছে, কিন্তু চোখের সামনের দৃশ্যটা কেন আমি সহ্য করতে পারছি না।

ওরা যখন নগ্ন কিশোরকে নিয়ে খেতে গেল, আমি সেই ফাঁকে ডোল হাতে করে জল বইতে শুরু করি। সবাই নগ্নতা-মুগ্ধ, ঢ্যাঙা লোকটার জিভ ঝুলে পড়ছে মাঝে মাঝে।

রানি আমাকে লক্ষ করে। জল বইতে বাধা দেয় না। অনেক জল বয়ে

ফেলি আমি। কিন্তু রানির মুখে তেমন কোনও প্রসন্নতা ফুটে ওঠে না। জল বয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকি চুপচাপ। ভাবি, খেতে ডাকবে নিশ্চয়। নিজেই জল বইবার সময় জলের কল নিংড়ে জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়েছি। খালি পেটে জল পড়ে কলকল করে ডেকে উঠেছিল। রাত্রি হয়েছিল।

বিকেলে ওই একটা নাঙা দৃশ্য দেখেছি। এখন অনেক রাত। রানি আমাকে খেতে ডাকেনি। ঝাঁপ বন্ধ করার সময় হয়ে এল। একবার ডাকলও না আয় বলে। আঁচলে চাবি বেঁধে রানি যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছে, আমার কাছে এসে রিকশা থেকে নামল। আমি হোটেল থেকে সরে এসে বটতলার নীচে একটা কাঠের মাচায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রিকশা থেকে নেমে এসে গায়ে ঠেলা দিয়ে ডেকে তুলল রানি। তারপর একটা সিকি হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—পাউরুটি কিনে খাস। বলে রিকশায় উঠে চলে গেল রানি।

আমার চোখের উপর থেকে সমস্ত মায়া মুছে শেষ হয়ে গেল। পৃথিবী কেমন, তার আরও প্রমাণ পেলাম রাত আরও গভীর হলে। হোটেলের বাইরে ঝাঁপের তলে বেঞ্চি জোড়া লাগিয়ে শুয়েছে ওরা। সেই কিশোর আর ঢ্যাঙা লোকটা।

মাঝে মাঝে ডাকছে লোকটা—মনা ! মনা। কর্কশ গলার আদুরে ডাক।

ডাকটা এমনই নির্লজ্জ আর আঠালো যে, শুনতে শুনতে গা ঘিনঘিন করে। মনা মিহি সুরে প্রবল আপত্তি করছে, লোকটা কী চাইছে মনার কাছে। হঠাৎ একটু জোরে কেঁদে উঠল ছেলেটা। আমি মাচা ছেড়ে উঠে এসে দেখি, একটা বাঁশের খুঁটি ধরে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে মনা হারামি হারামি বলে লোকটাকে গালি দিচ্ছে। আমাকে দেখে লোকটা দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

আমি আর দাঁড়াইনি ওখানে। আমার কাছে রানির দেওয়া একটা সিকি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পথে পথে এইভাবে আমার ছ'মাস কেটে গেছে।

একটি লরিতে আমি খালাসির কাজ করি কিছুদিন। কিন্তু সেই কাজে আমার কোনও পটুত্ব ছিল না। তোলাপাড়ার কাজে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ওই কাজে টেকাই অসাধ্য ছিল। তাছাড়া রাত্রিতে কোথায় কোথায় অদ্ভুত চটিতে থেমে থাকত গাড়ি। ড্রাইভার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে পথের পাশের ধাবায় নেমে দড়ির খাটে শুয়ে থাকত, মদ খেত। চলতি পথে কিভাবে মেয়ে জুটত জানি না, দুজনে মিলে ভোগ করত, বেপাড়ার মেয়ে বলা হত তাদের। সেই অন্ধকার জগৎ যে না দেখেছে, তাকে সেই বিবরণ শুনিয়েও বোঝানো কঠিন যে, সেই জগৎটা কী ঘোর তমসায় আবৃত।

মনে হচ্ছিল, আমি খারাপ হয়ে যাব। ভাগ্য ভাল, শেষ পর্যন্ত একটি মনোহারীর দোকানে আমার কাজ জুটে গেল। পঞ্চাশ টাকা মাইনে, খেতে পরতে দিত।

কিন্তু মন আমার কোথাও টিকতে চাইছিল না কিছুতেই। অবিশ্রান্ত স্মৃতি আমাকে ব্যাকুল করে তুলছিল। মনার কথা মনে পড়লেই মনে হত, তার চেয়ে অপমানিত জীব পৃথিবীতে নেই। মাস মাইনে তিরিশ টাকা, খেতে পরতে পেত। যখন খালাসির কাজ করি সেই সময় একদিন লরি করে ওখানে থেমে, ওর সব কথা শুনেছিলাম। ওর মা আছে, বাপ কোথায় জানে না। মা দাসীবৃত্তি করে। অপমানের কথা সে মাকেও বলতে পারে না। ওকে নগ্ন করলে ওর কেন হাসি পায়, তা-ও সে বলতে পারে না। হাসি পায়, শুধুই হাসি পায়। আর কান্না পায়, যখন ঢ্যাঙা লোকটা ওকে নগ্ন করে ফেলে আর গায়ে হাত বুলিয়ে নোংরা প্রস্তাব করে।

বাইরের পৃথিবী যে এমন ভয়ংকর, তা কে জানত। মানুষের কামনাবাসনা যে এমন অদ্ভুত। তা কে জানত, পুরুষ নারীর উপর অত্যাচার করে, বলাৎকার করে শুনেছিলাম, কিন্তু ঢ্যাঙা লোকটা মনার কাছে যে ধরনের প্রস্তাব এবং বলপ্রয়োগ করত তা প্রকৃতির কোন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে চাইলে গায়ে কাঁটা দেয় আমার। মেয়েদের পিছনে ছেলেরা লাগে এই সব শুনেই মনটা কেমন করে, কিন্তু মনা যখন কাঁদতে কাঁদতে বলল তাকে কিভাবে বিরক্ত করে ঢ্যাঙা লোকটা এবং মেঠাই খাওয়াতে চায়, তখন শুনতে শুনতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

ভয়ে ভয়ে মনা বলল—তোমাকেই বলছি দাদা, তুমি কাউকে বলে দিও না। ওই লোকটা ভাল রাঁধুনি, রানিমা ওর কোন দোষ দেখবে না। বললে ভাববে আমিই খারাপ। একদিন দুপুরে একলা পেয়ে আমাকে এত অপমান করল, তোমাকে খুলে বলতে পারব না। তুমি সেদিন দেখে ফেলেছ বলে আমার এত লজ্জা করে!

আর আমার শুনতে ইচ্ছে হল না। একজন কিশোরের অপমানের ইতিহাস আমার কাছে মানুষের যৌনতার কী কঠিন ক্রূর ছবিটা তুলে ধরে। এর পর ঘটনা আরও চমৎকার ঘটে যায়। মনোহারী দোকানের সামনে একটি তেলেভাজার দোকান আছে। ওখানে চারজন মস্তান বিকেলে আড্ডা দেয়, ওদের মধ্যে একজন এক স্কুল মাস্টারের ছেলে, বি-এ পাশ করেছে, ওখানে একটা পাগলিও আসে, মুখে সর্বক্ষণ লালা ঝরে। রাত তখন এগারোটা।

দোকান বন্ধ করে চাবিগাছা নিয়ে মালিকের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে, ওখানে একটি জর্দাঘরে আমার শোয়ার ব্যবস্থা আছে। দম বন্ধ হয়ে আসে, কিন্তু ওই তীব্র গন্ধের মধ্যেই রাত কাটাতে হয়। মালিকের জর্দা তৈরির কারখানা ওটি, তারই লাগোয়া ঘরে আমার ঠাঁই।

তালা বন্ধ করে রাস্তায় নেমেছি, এমন সময় একটা খিলখিল করা মেয়েলি হাসি শুনতে পাই। তেলেভাজার দোকান রাত দশটার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ওখানে একটা কালো মোটা কুকুর আর পাগলি মেয়েটা শোয়। ওটা একটা বন্ধ ঘরের বারান্দা বিশেষ। ঘরে লোক থাকে না।

ওই পাগলিটাই কি তবে খিলখিল করছে। একটু একটু করে এগিয়ে যাই। মাঝে মাঝে কুকুরটা ভুক ভুক করছে। একজন মস্তান কেলোটার গলায় দলিত হাতের টানে সোহাগ দিয়ে চুপ করাতে চাইছে। পাগলিটার মাথার দিকটা একজন চেপে ধরে রয়েছে, অন্য একজন পাগলিটার পরনের কাপড় কোমরের দিক ঠেলে দিয়ে নগ্ন পা দুখানি ওর দেহের দু পাশে টেনে নিয়ে চাঁদের আলোর বারান্দার ছাদের ছায়ায় হাঁটু গেড়ে যা করছে, তা দেখেই বুঝলাম, এটাই আমার জীবনের প্রথম যৌন ছবি। আমি ব্লু ফিল্ম দেখিনি কখনও, ময়ূরীদের বাড়িতে কোনও খারাপ পত্রিকা যায় না। সিনেমার পত্রিকা পর্যন্ত যায় না। অতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ সে সব।

ময়ূরীকে ঘিরে আমার জীবন ছিল ছবিময়, অনেক ছবি আমাদের ছিল। দুজনের জন্য। ঝরনার ছবি। পর্বতমালার ছবি। তুষারশুভ্র পর্বতশৃঙ্গের রঙিন ছবি। রাঙা, সবুজ টিয়া, কাকাতুয়ার ছবি। কত কি। সব ছিল অযৌন প্রকৃতির দৃশ্যমালা। এখন বুঝতে পারি মামণি আমাকে একটি শিশু করে রাখতে চেয়েছিলেন। অর্জুনবাবু আমার এবং ময়ূরীর যৌন-চেতনার উন্মেষ চাননি। চাননি, তার জন্য আমি তাঁদের দোষ দিই না।

আমি মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছি। আমার চোখে পৃথিবী অন্য এক জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হচ্ছে, এত নিষ্ঠুর করুণ এবং কান্নাভেজা চাঁদ আমি দেখিনি কখনও। পাগলিটা কাঁদছে।

আমাকে ওরা দেখে ফেলল। দুজন ওরা ছুটে এসে একজন গলা চেপে ধরে টানতে টানতে গলির মধ্যে টেনে এনে মুখের উপর সপাটে ঘুসি চালিয়ে দিল, অন্যজন পেটে লাথি মেরে বলল—শালা !

—আমার কী দোষ।

—দেখছিলি কেন ! চলে গেলি না কেন। যা দেখলি পেটে যদি চেপে না

রাখিস খুন করে দেব। কালই চলে যাবি এখান থেকে।

এই সময় কুকুরটা অসম্ভব ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ধর্ষিতা পাগলিকে ফেলে ওরা চলে গেল, কুকুরটা তেড়ে গেল গলির মধ্যে। একটু বাদে গুলির আওয়াজ শোনা গেল গলিরই ভিতর দিকে, অদ্ভুত একটা মায়াময় আর্তনাদ করে কুকুরটা থেমে গেল। ভয়ে ভয়ে অনেকক্ষণ বাদে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে গলির মধ্যে যাই।

কুকুরটা কাত হয়ে ড্রেনের জলে পড়ে আছে। মরে গেছে। বেকার হতাশ ভবিষ্যৎহীন ভারতবর্ষ পাগলিকে পর্যন্ত, যে দেখতে অনেকটা ময়ূরীর মতো, তাকেও ছাড়ে না।

ময়ূরীই যেন অদৃশ্য আড়াল থেকে মহাপ্রকৃতির মতো আমাকে এই সব অপূর্ব সিনেমা দেখিয়ে চলেছে। আমার মনে আছে, বিয়ের রাতে আমি ময়ূরীর সঙ্গে রাত কাটাই, এই অঘটন কেকা পছন্দ করেনি। দেশে যত বেকারি বাড়বে, হতাশা বাড়বে, আমার মনে হল, ওই পাগলি মেয়েরা ততই সন্তান উৎপাদন করবে। অমন একটা লালাঝরা নির্বোধ, একদম কথা বোঝা যায় না এমন মেয়েকে, শুনতেও পায় না ঠিক, প্রায় ময়ূরীর মতো মেয়েকে ছেলে কোলে রেল-স্টেশনে ঘুরতে দেখেছি। ও তার বাচ্চাকে মুখের মধ্যে আটার নোংরা বিস্কুট গুঁজে দিচ্ছিল অতি স্নেহে। কী করে এই ছবিটা তৈরি হয় চোখের উপর জানি না। যে এতই নির্বোধ, সে কী করে অসহায় প্রাণের সবচেয়ে সহায় হতে চায়। যার চেয়ে অসহায় আর কী হয় বলে মানুষ ভাবতে বসে, সেই অবোধ পাগলিটাও কি মা হতে পারে।

কুকুরটাকে কী ভাবে ওরা গুলি করে শেষ করে দিল, কী করে পারল ওই বেকার যুবকরা, আমি যেমন জানি না, তেমনি জানি না, ওই অবোধ, বোবা মা, কী করে বিস্কুট গুঁজে দেয় শিশুর মুখে। আমি পৃথিবী চিনি না, মানুষ বুঝি না। শুধুই মনে হয় ময়ূরী আমাকে এই সব দৃশ্যের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে মনে মনে হাসছে।

ভয় করতে লাগল আমার। ওরা আমাকে মেরে ফেলতেও পারে। এত ভয়ংকর কথা আমি কাকে বলে শোনাব। কেউ বুঝবে না, বাঁচার স্বাদ যে কী বিভীষিকা, কেউ শুনতেও চাইবে না।

ওই পাগলি মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ও যদি অর্জুনবাবুর মেয়ে হত, তা হলে কুকুরটা মারা পড়ত না। চেয়ে থাকতে থাকতে কে যেন আমার বুকের মধ্যে ডেকে উঠল—মা।

আমার সমস্ত হৃদয় বিপুল বেগে সেই ডাকে আচ্ছন্ন হয়ে কী তীব্র এক কষ্ট আর আনন্দ উৎপন্ন করতে থাকে, বুঝি, ময়ূরী আমাকে ডাকছে।

ময়ূরী আমাকে ডাকছে। আমারই বুকের মধ্যে অত্যন্ত আকুল হয়ে ডাকছে। আমি মস্তানভাইদের আচরণ দেখে ভয় পেয়েছি, তাদের গাঢ় হতাশার যৌনদৃশ্য দেখেছি, ফিনফোটা জ্যোৎস্নায় কুকুরটাকে গুলি করে রক্তপাত ঘটাতে দেখেছি, মানুষ পশুবৎ যৌনকাজ করে এবং পশুর চেয়ে অনেক হিংস্র ভাবে তারা বেঁচে থাকে, অথচ মানুষকে জানোয়ার বললে, মানুষ রেগে যায়।

মানুষ বলতে কী বোঝায় মানুষ কখনও তা পরিষ্কার করে মানুষকে বলেনি। যীশুকে দেখিয়ে বলেছে, ইনি একজন মানুষ ছিলেন, এ কথা বলার পরই মনে হয়েছে, যীশুকে মানুষ বললে, যীশু যা করেছেন মানুষকেও তাই করতে হয়, তাই যীশুকে পয়গম্বর করেছে মানুষ এবং পরে মনে হয়েছে, পয়গম্বর যা পারে, মানুষও তার কিছু কিছু পারে, অতএব যীশুকে ভগবান করে দাও, ডাকো ভগবান যীশু। ভগবান যা করেন, মানুষ তা করতে পারে না, ফলে যীশু যা করার করলেন, ক্রুশে বিঁধিয়ে মারা হল তাঁকে, তিনি বললেন, এই সব আবাল-নাবাল মানুষদের ক্ষমা কর প্রভু, এরা জানে না, এরা কী করছে। ব্যস। ক্ষমা তো পেয়ে গেল মানুষ। মানুষকে আর যীশুর কাজ করতে হল না। যীশুকে মানুষ গলার তাবিজ করল, পদক করল।

মাস্টারের মস্তান ছেলেটা, বি-এ পাশ, গলায় সেই পদক ঝুলিয়ে আরও ভয়ানক মস্তান হয়ে গেল। পাগলিটাকে ধর্ষণ করল, প্রভু তাকে ক্ষমা করে দেবেন। গুলি করে কুকুর মেরে ফেলল, যেহেতু ওটা খুব চেঁচাচ্ছিল, রক্তপাত হল জ্যোৎস্নারাতে, প্রভু তার গলায় ঝুলতে থাকলেন ক্রুশে। আমার কোনওই কষ্ট হত না, যদি না ওর গলায় যীশুর তাবিজ থাকত। আমি কখনও আর যীশুর দিকে মুখ তুলে চাইতে পারব না।

আমার কেউ নেই। পৃথিবীর সঙ্গে আমার যতবার সংযোগ হয়, দেখি আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটে চলেছে। আমাকে ওরা চলে যেতে বলেছে, আমি চলে যাব।

ওদের যদি বলি, তোমরা কুকুরটাকে মেরে ফেললে কেন? ওরা তাহলে আমাকেই মেরে ফেলতে চাইবে। আমার বউটার কী হবে। ময়ূরী যে আমাকে ডাকছে।

অত্যন্ত কড়া শীত পড়েছে, জামাকাপড় নেই তেমন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে

ঠকঠক করে কাঁপতে আর ভাল লাগে না। পথের উপর গরিব মানুষরা কাঠখড়ি সাজিয়ে আগুন জ্বেলেছিল, ভোরবেলাটা সেই আগুন পুইয়ে কাটিয়েছি। মনে মনে ভাবছি, ময়ূরী ছাড়া আমার আর কে আছে। পৃথিবীতে কোথাও ঠাঁই না পাই, ওর কাছে পাব। ও কখনও আমাকে ফেলে দেবে না। আমি বিশ্বাস করি, ময়ূরী আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছে।

চোখ মেলে মেলে খুঁজছে আমাকে। রাগ করে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ও আমার জন্যে শুকিয়ে মরবে, তবু অন্যের হাতে খাবে না। ওর সেই বড়ি ওষুধটা...ওটা হয়ত কেকা খুঁজেই পাচ্ছে না, ময়ূরীর খুব কষ্ট হচ্ছে। ওকে ওষুধটা খাইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। গারডিনাল বড়ি অনেক খুঁজে পেতে যোগাড় করতে হয়। বড়ই যন্ত্রণা ওর। চোখমুখে অসহায় যন্ত্রণার ছাপ। কেউ তো জানে না, ওর কষ্টের পরিধি কতখানি।

—মা!

পাগলি মেয়েটার শিশুকে বিস্কুট খাওয়ানো দেখতে দেখতে হঠাৎ বুকের মধ্যে ডাকটা শুনতে পাই। গাছতলায় বসে আমার গাল বেয়ে জল পড়তে থাকে। আমার চোখের উপর দিয়ে পাগলিটা চলে গেল টিকিট ঘরের দিকে। প্ল্যাটফর্মের এদিকে দেবদারু গাছটায় কত পাখি কিচকিচ করছে। আমি যে কাঁদছি এবং আমার গায়ে জ্বর এসেছে কেউ কি বুঝবে সে কথা।

ভরতপুর মুছে গেছে। খবরের কাগজে সেই সংবাদ ছাপা হয়েছে। মামণি কি পড়েননি সেই খবর। তাঁরা ভেবেছেন, আমি নিশ্চয় ফিরব। এত বড় সর্বনাশের পর আমি আর কোথায় যেতে পারি।

কেকা তার মাকে বলল—দেখো; ঠিক ফিরে আসবে।

মামণি বললেন—তোর কথাই যেন সত্য হয় মা, রঞ্জন যেন ফিরে আসে।

—কোথায় যাবে, কেউ তো নেই!

—অমন করে বলছিস কেন কেকা! এ কি আর আনন্দের খবর।

—তোমারও তো আনন্দ হচ্ছে মা, কষ্টও হচ্ছে। দ্যাখো,পারুল বলে কাজের মেয়েটা একদম পারে না। ও নিজেই অসুস্থ, তাছাড়া লক্ষ্মীর মা ওকে সাহায্যও করে না।

আমি চলে আসার পর এই ভাবে শুরু হয়। পারুল বলে একটা নতুন মেয়ে আসে ওদের বাড়ি। লক্ষ্মীর মা ঠেলাপাড়া করত। খাইয়ে দিতে পর্যন্ত চাইত না। কেকা যে অত করে, ব'লে বলত, তা ছিল লোক দেখানো শখের সেবা। গু-মুত মেখে পড়ে থাকে ময়ূরী। পারুল যেন দেখেও দেখে না। ওকে যখন

কাপড় বদলানোর জন্য বলা হয়, ও তখন টবের ফুলগাছে জল দিতে দিতে বলে—যাচ্ছি ! বাবা বাবা ! তোমরা দেখছি মুখে বিড়ি দিতে চাও না।

এমনিতে পারুল ছিল নোংরা স্বভাবের মেয়ে। ময়ূরীর গু-মুত মেঝে পড়ে থাকাকে ও কিছুই মনে করত না। করলেই হয়, করলেই হচ্ছে, এই ছিল ওর ভঙ্গি।

মামণি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু অসহায় চোখে ময়ূরীর দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। অফিস বার হয়ে যাচ্ছেন, দেখলেন মেঝেয় পড়ে মেয়ে কঁকাচ্ছে ! পারুল রেডিও-তে ভাওয়াইয়া শুনছে। শুনছে কোচবিহারি লোকগান—'ফান্দে পড়িয়া বগা কাঁন্দে রে।'

মামণি ডাকলেন—ও পারুল। শুনে যা।

—যাই ! বলে গানে কান পেতে পা নাচিয়ে চলল।

—শুনছিস !

—যাই গো !

কিন্তু আসে না। জোর করে হাত ধরে টেনে এনে কাজে জুড়তে হয়। কাজে হাত লাগিয়েই বলে—অ্যা ম্যা গো। এই কি মানুষের কাজ মা।

—না, এ কাজ রঙ্গন করেনি। তুমিই করছ খালি।

—করত তো চলে গেল কেন ? বল, তাড়িয়ে দিয়েছ !

—না।

—না বললে শুনব কেন, ভাগ্যের দোষ না থাকলে, এ কাজে কেউ আসে না।

—দোষ তোমার নয় পারুল, দোষ আমাদের !

—কাঁখের দোষ মা ! মেয়েকে কখনও কোলে করে দেখেছ !

—এই সব কথা বলবার জন্য তো ডাকা হয়নি তোমাকে !

—কাজের জন্য ডেকেছ !

—হ্যাঁ।

—সেই কাজই তো করছি মা। রাগছ কেন !

—কথা বলো না তুমি। মুখ বুজে কাজ কর !

—এ কাজ মুখ বুঁজে করা যায় না গো। আমাকে কথা বলতে দিতে হবে।

—আশ্চর্য !

—তা অবাক হলে আমি কী করব। রঙ্গনকে ডেকে আনো না ! কই, খোঁজ তো নিচ্ছ না। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ, এখন খুঁজে আনবে কোন মুখে।

অশান্তি আর অসুখের তীব্র আগুন জ্বলে উঠল রি রি করে। মামণি অসুস্থ হয়ে পড়ল পারুলের কথার আঘাতে। নিয়ত যন্ত্রণা দিতে থাকল পারুল। কেকা বাধ্য হয়ে ময়ূরীর কাজ করত, কিন্তু তারও তো ক্লান্তি আছে, ওর পড়াশোনার ক্ষতি হতে লাগল। মামণির ব্যাঙ্কের চাকরিতে কামাই হতে লাগল। অর্জুনবাবু ময়ূরীর দুরবস্থা দেখে মনে মনে ভাবলেন, সত্যিই একে মেরে ফেলা দরকার। কঠিন মানুষ, বাস্তবিক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন।

এক শীতের সকালে তিনি দেখলেন, অসুস্থ নগ্ন জড়পিণ্ড তার চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দু পা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, স্রাব হয়েছে অধিক। তিনি মনে মনে ভগবানকে ডেকে উঠলেন, কখনও প্রকাশ্যে তিনি ভগবানকে ডাকেন না। ডেকে উঠে বললেন—ভগবান। বাপ হয়ে মেয়ের এমন অবস্থা দেখতে হল। জীবন কি এমনই নিষ্ঠুর। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি দোরের কাছে, একা অবোধ মেয়েটি ওইভাবে দাঁড়িয়ে কী ভাবছে, কাকে অভিশাপ দিচ্ছে আমরা জানি না। মা। আমাকে তুই ক্ষমা করে দে, বাপ হয়ে আমি তোর জন্যে কোনও ব্যবস্থাই করতে পারলাম না। তুই কি রঙ্গনের কথা ভাবিস। ওর কারণে তোর কষ্ট হয়। কিন্তু রঙ্গনকে যে আমরা ঠকিয়েছি। ও তো আর আসবে না তোর কাছে। ওর সর্বস্ব গেছে, তবু সে আসবে না।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোকে আমি শেষ করে দেব। রাখব না।

অর্জুনবাবু একদিন কোন এক রোববারে একলা বাস ধরে ভরতপুর আসেন। বাড়িতে কাউকে কিছু বলে আসেন না। কিন্তু ভরতপুর বলে কোনও গ্রামের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পদ্মার ভয়ংকর উত্তাল তরঙ্গ ছাড়া তাঁর চোখে কিছুই পড়ে না, কলকল করছে শুধু জলরাশি। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে যায়। হরিমতী জানতেও পারল না রঙ্গনের কী হয়েছে, ছেলে তার কাছে ছুটে এসেছিল, ছেলে তাকে পেল না।

কোথায় আর পাওয়া যাবে রঙ্গনকে। অর্জুনের মনে হল, শেষ পর্যন্ত রঙ্গন জীবনের মস্ত ফাঁকিটা বুঝে ফেলেছিল, তাই সে ময়ূরীর কাছে থাকতে চায়নি। তাকে খুঁজে ফেরার কোনও অর্থ হয় না। তিনি যে ঠিক করেছেন ময়ূরীকে মেরে ফেলবেন, এই সিদ্ধান্ত পৃথিবীর কেউ জানবে না, তিনি যা করবার করবেন।

কতই তো প্রাণ হত্যা হচ্ছে নিত্যদিন, প্রতি মুহূর্তে এই সংসারে। মানুষ

মাছমাংস খায়, প্রাণী হত্যা করেই খায়। কই কখনও কি মনে করে যে, কত প্রাণ মেরে মানুষ বেঁচে রয়েছে। মানুষ ভেবে নিয়েছে, মনুষ্যেতর প্রাণীকে হত্যা, গাছপালা হত্যা, তার স্বাভাবিক জীবধর্ম। ডাক্তারি বিদ্যায় বলা হয়েছে মাছেদের খুনের অনুভূতি নেই, তাদের মস্তিষ্কে হত্যার ভয় জন্মায় না, ছাগল-গরুও তাকে যা দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, সেই হত্যার অস্ত্র চিনতে পারে না।

আচ্ছা। ময়ূরী কি মানুষ? অর্জুন মনে মনে অস্বীকার করলেন এবং নিজেকে বললেন, তার ছোট মেয়েটি মানুষ নয়। মানুষকে মেরে ফেলতে চাইলে মানুষ ভয় পায়, খুন করে ফেললে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভোগে, প্রাণ যে কষ্ট পায়, সে অতি নির্মম।

আশা করা যায়, ঘুমের বড়ি খাইয়ে মেরে ফেললে ময়ূরীর কোনও কষ্টই হবে না। মা। তোর কি কষ্ট হবে!

ডাক্তার সামন্তকে একবার শুধিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল, কিন্তু অর্জুন সেখানে না গিয়ে দাওয়াখানায় ঢুকে ঘুমের বড়ি কিনলেন—কিনলেন ময়ূরীর নামের প্রেসক্রিপসন দেখিয়ে। তাঁর মনে হল, ময়ূরী তার নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছে। ডাক্তার সামন্তরই করা প্রেসক্রিপসন, মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে পড়লে ময়ূরীকে এক আধখানা বড়ি খাওয়ানোর নির্দেশ আছে।

অতএব সামন্তকে জিজ্ঞাসা করার মানে হয় না। মৃত্যুর পরোয়ানা সামন্তই লিখে রেখেছেন। অথচ অর্জুন জানতেন, সামন্তর সামনে এই প্রস্তাব করলে, ডাক্তার শিউরে উঠবেন। ময়ূরী মরে গেলে থানা পুলিশ হলে ডাক্তারই সাক্ষ্য দিয়ে অর্জুনকে জেলে পাঠাবেন।

এ হত্যাকাণ্ড একান্ত গোপনে এবং নিঃশব্দে হয়ে যাবে। ত্রিশ-বত্রিশটা ঘুমের বড়ি সংগ্রহ করতে পেরেছেন অর্জুন। রাত তখন দশটা, বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াতেই পারুল এগিয়ে এসে বলল—কোথায় গেছিলেন বাবু। এত রাত হল।

—মরতে!

—মাঝে মাঝে সবাই আপনারা মরতে বার হন, কিন্তু মরতে পারেন না। জান আপনাদের শক্ত আছে বাবু। অসুখ মেয়েটার দিকে ফিরেও দ্যাখেন না, একলা কত করি।

—তোকে আর করতে হবে না পারুল। এবার তোকে ছুটি দেব।

—ওই একটা কথা হামেশা বলেন। আমি কি ছুটি চেয়েছি, রঙ্গন কি

চেয়েছিল।

—তাহলে বল্ ! চলে গেল কেন। কেন চলে গেল।

—সেকথা আপনারাই জানেন, অত্যাচার তো কম করেন না।

—অত্যাচার করি।

—করেন না ? রাতদিন অত্যাচার করেন। রঙ্গনের হাতে ছাড়া ময়ূরী খাবে না, সেই দোষ কি আমার ! আমি খাওয়াতে পারি না বলে দুষলে মা। এটা কি রকম কথা হল বাবু। কী রকম অত্যাচার হল।

—শাপ লাগবে পারুল। শাপ লেগে যাবে। দেখে এলাম, বুঝলি। দেখে এলাম।

—কী দেখে এলেন শুনি !

—জল। শুধু জল। কিচ্ছু নেই। কলকল করছে ভয়ংকর পদ্মা। সব গ্রাস করে নিয়েছে। চিহ্ন নাই। আমার মেয়েকে যে ঘৃণা করবে, তার আর কিছুই থাকবে না। অবোধকে যে ফেলে পালায়, তার অমনই সর্বনাশ হয় পারুল।

—আমি কি পালাব বলেছি।

—এই তো ভয় পেয়েছিস। ভয় ! শুধু ভয়। শাপ লাগবে। মরে যাবি ! বলতে বলতে পাগলের মতো করে হেসে উঠলেন অর্জুন।

পারুল আর কথা বলবার সাহস পেল না। যেন সে এই মুহূর্তেই শাপস্পৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে মেঝের উপর পুঁতে গেছে। গরিব মূর্খ মেয়েমানুষ অভিশাপকে সবচেয়ে ভয় পায়। লক্ষ্মীর মায়েরও মনে হচ্ছিল, অবোধ প্রাণকে অবহেলা করার জন্যই বুঝি রঙ্গনের অমন সর্বনাশ হয়েছে।

লক্ষ্মীর মা বলল—চুপ কর পারু, আর কথা বলিস না। বাবু পদ্মা দেখে এসেছে, মিছে তো বলছে না।

পারুল হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে বলল—আমাদের কি আর মুখ আছে ললিতাদিদি ! নাই। অন্যকে শাপ দিয়ে যে মেয়ে বাঁচে, তাকে তো শাপ দিতে পারি না, ভগবান সইবে না। আপন স্বামীকে শাপ দেয় গো, এমন সর্বনাশী।

আর সইতে পারলেন না অর্জুন। মনে হল, বুকের উপর দিয়ে কে যেন রোলার চালিয়ে পিষে দিচ্ছে তাঁকে, মনে হল, সত্য কথাটাই বলেছে পারুল। ময়ূরী এক সর্বনাশী। রঙ্গনের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। ওর আর বাঁচার অধিকার নেই।

মা আর মেয়ে সিঁড়ির উপরের বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিল, অর্জুনের কণ্ঠস্বর শুনে।

—দেখে এলে ?

—কী ?

—পদ্মা।

স্ত্রীর প্রশ্নের সম্পূর্ণ জবাব করতে পারেন না অর্জুন। তাঁর চোখের উপর ভয়াবহ্ পদ্মার স্রোত ভেসে ওঠে। তাঁর মনে হয়, প্রকৃতি আর কী চায় মানুষের কাছে !

—বাড়িঘর কিছুই দেখলে না ?

—না। সব শেষ।

—রঙ্গন কোথায় গেল।

—তোমার মেয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিক দেবপ্রিয়া। তোমার মেয়ে, তোমার পেটের সন্তান। বসে আছে, চুপ করে বসে আছে। মজা দেখছে। স্বামীকে খেয়ে ফেলেছে, বুঝলে।

—অমন করে ব'লো না গো !

—বলব না ! কেন বলব না। শাপ লাগবে। যে এখানে থাকবে, শাপ লেগে মরবে। চলে যা পারুল, চলে যা। থেকো না লক্ষ্মীর মা। পালিয়ে যা কেকা !

—তোমরা ? তোমরা যাবে না। বলে উঠল কেকা।

—যাব। নিশ্চয় যাব। শেষ করব আগে, তারপর যাব। বলতে বলতে তিনতলায় উঠে চলে যান অর্জুন।

গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় ময়ূরীর ঘরে নেমে আসেন বাবা। আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলে চলেন।

—শাপ দিই। অভিশাপের ভয় দেখাই মানুষকে। ভগবান, তুমি আমাকে এত অসহায় করেছ। আজ সবকিছুর অবসান হবে। এই শীতের রাতে আর কেকাকে লেপের উষ্ণতা থেকে বাইরে ঠেলে দিয়ে বলতে হবে না, দেখে আয় ময়ূরী বিছানা ভিজিয়েছে কিনা, জেগে উঠে কষ্ট পাচ্ছে কিনা। এই রাত ময়ূরী, তোমার শেষ রাত্রি। আমার পকেটে অনেক ঘুমের বড়ি।

বিড়বিড় করতে করতে ঘরে ঢুকে আসেন অর্জুন। অবাক হয়ে দেখেন, চেয়ারেই বসে আছে মেয়ে, তাকে অত্যন্ত নীচু চৌকিতে শুইয়ে দেয়নি পারুল। কেউ আর দেখে না তোকে মা। তোর এই ঘরখানি তোর একার বন্দীশালা, এখানে রঙ্গন তোকে রাতজেগে পাহারা দিয়েছে। এই নরক তোরই জন্য আমিই নির্মাণ করেছি। দ্যাখ। এতগুলি বড়ি এনেছি তোর জন্যে।

খুবই বিস্ময় এখানে মজুদ করেছিল নির্বোধ প্রাণটি, অলৌকিক ছিল তার অস্তিত্ব। বসে আছে ময়ূরী। নিষ্প্রভ নীল আলোয় ওর কালো চোখ জাগ্রত। ওর চোখে পদ্মার স্রোত বইছে কুলকুল কলকল শব্দে, আকাশ থেকে তারার ক্ষীণ আলো পড়েছে জলের বুকে। কালোর মধ্যে চিকচিক করছে কণিকাময় তারার স্রোতাহত বিন্দুগুলি। এই ছবি কেন দেখালে ময়ূরী। ছোট অনুচ্চ টেবিলে বিয়ের পোশাকপরা রঙ্গনের আর ময়ূরীর যুগল ছবিখানি খাড়া করে বসানো। অপলক সেই দিকে চেয়ে আছে মায়াবতী মেয়ে।

এ অসহ্য ! এই রূপটা দেখা, চেয়ে চেয়ে দেখা কোনও পিতারই পক্ষে খুব সহজ নয়। ও অমন করে চেয়ে আছে কেন। গায়ে পাতলা জামা, ওর কি শীত করছে না। মত্ত চোখে জল এসে সব কেমন ঝাপসা করে দেয়। চৌকিতে শুইয়ে দেন বাবা। কতকাল পরে মেয়েকে স্পর্শ করলেন।

ছবিটা চোখের সামনে রাখেন, যাতে মেয়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে পায়। তিনি ভুলে যান, কী করতে এসেছেন এখানে।

কথা বলেন—রঙ্গন ফিরে আসবে মা। তুমি ভেবো না। এত রাত জাগছ কেন, তোমার যে শরীর খারাপ করবে। ঠিক আছে, ঘুম আসছে না, তোমার জন্যে ঘুমের বড়ি এনেছি।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কেন তিনি এখানে এসেছেন। মুখের কাছে জল আর বড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতেই ময়ূরী পাখির মতো হাঁ করে দিব্যি। বাবার বুকটা ভেঙে যায়। মেয়ের গায়ে শিশুর মতো গন্ধ। পাউডার আর অযোন ঘ্রাণ। মুখের নিঃশ্বাস-শ্বাসে দুধের মতো গন্ধ। ঠিক শিশু যেমন। এই প্রাণ যখন ভালবাসে, তার কি কোনও দাম নেই। ওর অমন চেয়ে থাকার কি কোনও মূল্য নেই ! রঙ্গন, তোমার কি একটুও মনে নেই ময়ূরীকে।

ভাবতে ভাবতে প্রবল বেগে হাউমাউ করে অত্যন্ত ভীত মানুষের গলায় অত্যন্ত চড়া আর্তনাদ করে উঠলেন অর্জুন। গোটা বাড়িটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল।

কঠিন প্রাণের মানুষ যখন কেঁদে ওঠে, হঠাৎ-ই একদিন আর্তনাদ করে ওঠে, তখন সেই অশ্রুতপূর্ব আওয়াজ কেমন বিহ্বল করে দেয় মানুষকে। দোতলা থেকে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে ছুটে নামে কেকা। বাবার এই দুরবস্থা দেখে সে হতবাক হয়ে যায়। বাবার হাতের মুঠোয় ধরা ঘুমের বড়ি, বাবা মেঝেয় পড়ে রয়েছেন।

কেকার মনে হল, ময়ূরীর কাছে নেমে এসে, এই এত রাতে, বাবা

আত্মহত্যার চেষ্টা করেও পারলেন না। বা ময়ূরীকেই কি তিনি ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন।

বাবাকে তিনতলায় বহু কষ্টে ঠেলে তুলে দেয় কেকা। তারপর নিজের বিছানায় লেপের তলে ঢুকে মনে পড়ে, পারুল বা লক্ষ্মীর মা ময়ূরীর ঘরের প্রকাণ্ড জানলাটা বন্ধ করেনি। সমস্ত ঘর প্রবল শৈত্যপ্রবাহে হিম। বাইরে টানা বেগবান হাওয়া। খবরের কাগজে শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যুর খবর বেরিয়েছে। একবার ভাবল কেকা, নেমে গিয়ে জানলার কপাট বন্ধ করে আসে। ও বুঝতে পারছিল, এ শীতে ময়ূরী বাঁচবে না। কিন্তু শীতের লেপ তাকে বলল, আপদ শেষ হয়ে যাক। তুমি শুয়ে থাকো।

এই এক আশ্চর্য রাত্রি, হিম, ভয়াবহ সেই হিমের মৃত্যুমাখা মুখ। কোথাও শৈলচূড়ে পিতার কান্নার আঘাত লেগে তুষার ঝরছে হাওয়ায়। সেই দৃশ্য দেখতে পেল ময়ূরী। তার চোখে স্বপ্ন দিয়েছেন ভগবান, তার চেতনায় দীপ জ্বেলেছেন প্রকৃতি। এই মহারাত্রি তাকে অদ্ভুত সক্রিয় করে তুলল। সে বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়।

উপুড় হয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলল নিজেকে রঙ্গন আর তার ফটোটার দিকে। ওটাকে সে ধরবে, মৃত্যু তাকে চারিদিক থেকে ঘিরেছে, জীবনের একমাত্র উষ্ণতা ওখানে, তার মস্তিষ্ক তাকে আজ অদ্ভুত মনোযোগে সঠিক তথ্য পাঠাতে থাকে।

যাও ধরো। অবলম্বন কর। তোমাকে যে ভুলে গেছে, তাকে তুমি ভুলতে দিও না। জগৎ জেনেছে, তুমি অবোধ। তোমার গায়ে অযৌন শিশুঘ্রাণ, তবু তুমি জানো, তুমি তা নও। তোমার কামনা আছে, তুমি তা প্রকাশ কর। সরীসৃপের মতো বুকে ঠেলে পৌঁছাতে হবে তোমাকে। তুমি গড়িয়ে পড়েছ কিন্তু চিৎ হয়ে পড়ে যাওনি। আজ মস্তিষ্ক তোমাকে সুবুদ্ধি দিয়েছে। গভীর বাসনা তোমাকে ঠেলছে। তোমার বুকের মধ্যে অপূর্ব মিলনাকাঙ্ক্ষা চালিত করছে প্রবল শীতের মধ্যে। শীতকে তুমি উপেক্ষা কর। জানলা দিয়ে সবেগে হাওয়া ঢুকে আসছে, তাকে তুমি পাত্তা দিও না। যে তোমার চোখের সামনে নেই, সে তোমার অন্তরে আছে।

মুখ দিয়ে লালা এবং নাক দিয়ে জল ঝরছে তোমার। মনে হচ্ছে ফটো-রাখা টেবিলটা অনেক উচ্চ। তোমার হাত ওখানে পৌঁছাতে চাইবে না, কিন্তু রঙ্গনকে ছুঁতেই হবে, ওকে বুকের মধ্যে টেনে আনতে হবে। আরও খানিক গেলে তবে ওই টেবিলটার নাগাল পাওয়া যাবে। শীতে হাত পা

কাঁপছে তোমার, কিন্তু তাই বলে তুমি তো অযথা মরে যেতে পার না। রঙ্গনকে স্পর্শ না করে মরে যেতেই পার না।

ময়ূরীর সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছিল। শ্বাস টানতে পারছিল না। মেঝে বরফের চেয়ে শীতল। আকাশের জ্যোৎস্না তালশাঁসের মতো ঘন আর শাদা, বাতাস হুহু করছে গোরের মতো। ময়ূরী কেঁদে ফেলে। তবু সে দমতে চায় না। হাত বাড়ায়, শূন্যে হাতখানি কাঁপে, আঙুল কাঁপে।

এবারে কোনক্রমে ময়ূরী টেবিলের পায়াটা স্পর্শ করতে পেরেছে। শুধু এইটুকু। তাইতেই ময়ূরী হেসে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে পায়াটিকে আঁকড়ে ধরতে পারে। উপরের দিকে হাত বাড়ায়। তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। একদিন, একবার মাত্র সে উঠে দাঁড়াবে।

এই রাত্রিতেই, এই মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়াতে চায়। দু'হাত দিয়ে পায়াটিকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছে। দেহকে টেনে টেনে এবং দু'হাতে ভর দিয়ে উপুড় থেকে বসে ওঠার ভঙ্গিটা সে আয়ত্ত করে ফেলে। উঠে বসার পর এবারে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা।

ময়ূরী উঠে দাঁড়ায় এবং আর সামলাতে পারে না। দুর্বলভাবে মুখটা টেবিলে ফেলে, ঠোঁটে আঘাত খেয়ে মেঝেয় পড়ে যেতে যেতে, ফটোটায় ধাক্কা দিতে পারে, ওটি মেঝেয় পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। টেবিলের তল দিয়ে হাত বাড়ায় ময়ূরী।

সে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কাঁচ ফেটেছে, ওই অবস্থায় বুকের মধ্যে পেয়ে যায় রঙ্গনকে ময়ূরী। এবারে ফটোটা বুকে করে সে চিৎ হয়ে পড়ে যায় মেঝেতে। বুকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরেছে ফটো। আর তো কোনও কাজ ছিল না তার।

ঠোঁটে আঘাত লেগে রক্ত ঝরেছে। ময়ূরী কোনও পরোয়া করে না। হিমে জমে যাচ্ছে রক্ত, ময়ূরী অবিচল। তার এখন ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

কেকা আবার ভাবল, নীচে নেমে কপাট বন্ধ করে দেবে। কিন্তু লেপের উষ্ণতা তাকে বলল, কঠিন প্রাণ কখনও মরে না কেকা। ওরই জন্য রঙ্গন আজ হারিয়ে গেছে। থাকো, শুয়ে থাকো।

বাপ যা পারলেন না, তোমাকে তাই পারতে হবে। ময়ূরী মরে যাবে, কিন্তু থানাপুলিশ, জেলহাজত কিছুই হবে না কারও। ময়ূরীর ঘরে মৃত্যুর জাল বিস্তার করেছেন ঈশ্বর। যাকে ঈশ্বর বোবা-কালা অপরিণামবুদ্ধি জড়পিণ্ড এবং

মাংসের পুতুল হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাঁকে মারছেন। তুমি শুয়ে থাকো!

ময়ূরীর মৃত্যুর কথা কেকা তার ডায়েরিতে লিখে রেখেছিল। আমি অনেক পরে সেই লেখা পড়ি।

ময়ূরী ফটোখানি বুকে করে হিম মেঝেয় শুয়ে রয়েছে, ওর আর জাগতে ইচ্ছে করছে না। ওর এখন মায়াবী ঘুম পাচ্ছে, ওর এখন হিমেল হাওয়ার মধ্যে হৃদয়ে গভীর আনন্দ, পরিপূর্ণ আনন্দ, দুধের ফেনার মতো উপচে পড়া আনন্দ, এত সুখ তার, অবোধ প্রাণে এত সুখী সে, অলৌকিক সুখে সুখী, অমর্ত্যসুখে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

মাংসের পুতুলের মধ্যে প্রকৃতি ঢেলে দিচ্ছে কামনার স্বপ্নগুলি, হিরণ্ময় স্বপ্নের আবেশ, রঙ্গনের মুখ মনে করে তার তৃপ্তিতে ভরে যায় মুখের হাসি। সে হাসে আহ্লাদে, সাধে, মায়ায়, ভালবাসায় ; তার দেহ শিহরিত হয়, দেহে যৌনবোধ উন্মেষিত হয়, তার দেহের সৌগন্ধ আমোদিত করে ঘর, তার চুলে জড়িয়ে যায় মৃত্যু। তার পায়ের কাছে এসে বসে স্নেহময় মৃত্যু।

—তোমার কি কষ্ট হয় ময়ূরী!

—না, হয় না। আমি সুখী, আমি সম্রাজ্ঞী, আমি এই পৃথিবীতে এসেছিলাম, আর কখনও আসব না। নিয়ে চল আমাকে। আমার ভীষণ ভাল লাগছে এখন।

—তোমার একবার রঙ্গনকে দেখতে ইচ্ছে করে না?

—করে। এই তো বুকের মধ্যে পেয়েছি তাকে।

—তুমি বাঁচতে পারবে না, তা তুমি জানতে?

—একটু আগে জেনেছি। যার ভাবা নেই, সে তো বাঁচে না মশাই। কেকাকে আমি মুক্তি দিলাম। আমার জন্যে ওর আর কষ্ট থাকবে না। রাঙাবউ আর তুলনা করে বলবে না, আমি এই রকম, কেকা সেই রকম। ভাবি, আমাকে কেন তার মতো করেছিল প্রকৃতি।

—খেয়াল।

—আমিও আমার আপন খেয়ালে মরে যাচ্ছি, মৃত্যুর গন্ধে আমার রক্তে উৎসব লেগেছে। তুমি কোথা থেকে কথা বলছ, তুমি দেখতে কেমন।

—এই তো তোমার পায়ের কাছে বসে আছি। রঙ্গনের মতো দেখতে অবিকল।

—ও, তাই!

—কারও মৃত্যু বুঝি কারও ভালবাসার মতো হয়। আপন মনে বলল ময়ূরী। ওর কথা মৃত্যু বুঝতে পারল। ঠাণ্ডা হাওয়া গোল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ময়ূরীর চারপাশে।

—মা।

ময়ূরী একবার সজোরে ডেকে উঠল।

—কারও ভালবাসা বুঝি মায়ের মতো হয়। মৃত্যু প্রশ্ন করল ময়ূরীকে।

ময়ূরী জবাব দিল না।

—কী রেখে যাচ্ছ কেকার জন্যে ? তোমার বোন। তোমার একটা ছায়া তো রইল পৃথিবীতে। তুমি মরে যাওয়ার পর রাঙাবউ কী বলবে। বলবে, আর একজন ছিল !

—বলবে।

—কেকার কী হবে ?

—ওর জন্য চেয়ারটা রইল আমার !

—কী রইল ?

—চেয়ার।

—ময়ূরী ?

—উঁহু।

—কথা বল।

—ঘুম পাচ্ছে মা গো।

—চেয়ারটা রেখে যাচ্ছ কেন ? বললে না তো, ভালবাসা কি মায়ের মতো হয়।

ময়ূরী আর কথা বলল না।

—কথা বল।

আরও প্রবল হাওয়া ঢুকে-এল ঘরে। হাওয়ারা জীবন পেয়েছে। প্রাণ পেয়েছে, নেচে উঠল গভীর হিম হাওয়া। তারপর যে-পথে ঢুকেছিল ঘরে, সেই পথে বেরিয়ে চলে গেল।

ময়ূরী মারা গেল। ময়ূরী ঘুমিয়ে পড়ল। চেয়ারটা খালি হয়ে গেল। নির্বাক প্রকৃতির আর্তনাদ কেউ শুনতে পেল না।

চেয়ারটা রইল। আর কিছু রইল না। খেলনাগুলি রইল, যে খেলনা নিয়ে ময়ূরী কখনও খেলা করতে পারেনি। ছবিগুলি রইল, আর কিছু রইল না। ছবি রইল, যা দেখিয়ে রঞ্জন তাকে ভোলাতে চাইত। এই ঘর ছিল তার

বিশ্বভুবন। এখানে সে একদিন রঙ্গনের দুটি হাত জড়িয়ে ধরেছিল, তার বুকের উপর টেনে নিয়েছিল প্রেমিকার মতো।

ভোরের আলো এসে লাগল মৃত ময়ূরীর গায়ে। তার চুলের উপর ছড়িয়ে পড়ল রোদের সোনালি কিরণ। তার বুকের উপর ধরে রাখা ফটোর উপর রোদ এসে বসল। ওর বিয়ের নাকছাবিতে টিলটিল করে উঠল মিহি রোদের করুণা। আলো হল, আলো হল, আলো হল। কত আলো এল পৃথিবীতে।

চেয়ারে এসে বসেছে রোদ। চকচক করছে স্মৃতিকণিকার তরঙ্গ। নির্বাকি ছিল যে, তার ভাষায় ভরে গেল ঘরটা। যে ছিল এত নির্বাকি, এতই অবোধ, সে কেমন করে এমন মৃত্যুর দৃশ্য রচনা করে। কী করে সে চেপে ধরে ফটোখানি বুকের সঙ্গে! কী করে, কী করে, কী করে। রাঙাবউ ভেবে পেল না। লক্ষ্মীর মা ভেবে পেল না, পারুল এমনকি রতনও ভেবে পেল না।

ওরা বিষম অবাক হয়ে গেল। ওদের মুখ দিয়ে কথা বার হতে চাইল না। চোখ বিস্ফারিত হয়ে স্তব্ধ, নিথর, নিবিড় হয়ে উঠল করুণায়। ওরা নাকছাবির টিলটিলে আলোর বিস্ময় দেখতে থাকে, সে আলো দেওয়ালে এসে পড়েছে, সে আলো সিলিংয়ে পৌঁছে জ্বলজ্বল করছে। ময়ূরীর হাসি ওই রকম ছিল।

—আহা, বেচারি। বলে উঠল রাঙাবউ।

—কথা বলো না, একদম কথা বলো না দিদি। কাতরস্বরে বলে উঠল লক্ষ্মীর মা।

ডাক্তার সামন্ত ময়ূরীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাকে দেখতে এলেন। শোকস্তব্ধ বাড়িটা তাঁকে দেখে সামান্য একটু নড়ে উঠল। ময়ূরীর মৃতদেহ তারই ঘরের মেঝেয় শোয়ানো, ওর বুকে জড়িয়ে ধরা ফটো, তখনও বুকেই রয়েছে, কেউ সাহস করে ছবিখানি ওর আবেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেনি। একখানা সাদা কাপড়ে ওকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, মুখটা খোলা। ডাক্তার ওর ঢাকনা দেওয়া কাপড় বুকের উপর থেকে সরিয়ে ফেলে চমকে উঠলেন। তাঁর এতই দুর্বিষহ লাগল সেই দৃশ্য যে, তাঁর চোখের দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল। প্রথমে উনি তাঁর একটা হাত তুলে নিজের দৃষ্টি আড়াল করতে চাইলেন। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল পরিমল সামন্তর দেহ।

—না, না। এ আমি ভাবতে পারি না। ময়ূরী এ কী ঘটনা ঘটিয়ে গেল। এমন করে মরল, এই রকম, ও কী করে এতটা করেছে? হায় ভগবান।

দেবপ্রিয়া জীবনে এই প্রথম ডাক্তারের মুখে ভগবান বলে আর্তনাদ করতে শোনেন।

—তুমি ডাক্তার হয়ে ভগবানকে ডাকছ সামন্ত, তা হলে আমি কী করব। বলে দাও, আমি কী করব! বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবপ্রিয়া।

—তোমাকে সান্ত্বনা দেব না দেবপ্রিয়া। এতদিন যাকে আমি গল্প বলে এসেছি, তা আর গল্প রইল না। পৃথিবীতে কী ঘটে আর কী ঘটে না, আমি বলতে পারব না। মৃত্যুর আগে কতখানি যুদ্ধ করেছে মেয়েটা! বলতে বলতে সামন্ত উঠে দাঁড়ালেন।

দেবপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে বললেন— আমরা ওকে বাঁচাতে পারলাম না সামন্ত! ওই জানলাটা রাত্তিরে খোলা ছিল, কেউ বন্ধ করে দেয়নি। ঠাণ্ডায় সারা ঘর ভরে গিয়েছিল। মানুষ যখন জানবে, ভাববে আমরা মেরে ফেলেছি। রঙ্গন কি মরতে দিত, বল মরতে দিত। এখন যদি রঙ্গন ফিরে এসে বলে, আমার বউকে কেন তোমরা মেরে ফেলেছ, কী জবাব দেব তাকে।

মুহূর্তে সামন্তর মুখের সমস্ত তরঙ্গ বদলে গেল। দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। জানলার কাছে ত্বরিতে সরে যান পরিমল। একটি পাল্লায় হাত রেখে বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকেন। ভাবেন, এত অভিভূত হয়ে পড়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

—ওই ঠাণ্ডার মধ্যে লড়াই করেছে মেয়েটা। বলতে গিয়ে থেমে যান ডাক্তার। অনেকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারেন না।

—আমি তোমাকে গোপন করব না সামন্ত! আমরা অন্যায় করেছি।

—চুপ কর দেবপ্রিয়া! কথা বলো না। কে ওখানে। লক্ষ্মীর মা। পারুল কোথায়? বলে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে আসেন পরিমল। সিঁড়ির মুখের কাছে এসে এদিক ওদিক দেখেন, পারুলকে কোথাও দেখা যায় না।

দোতলার উপরে এসে খোলা চাতালে অর্জুনকে কাঠের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে সোফায় বসে থাকতে দেখেন।

—পারুলটা কোথায় গেল আবার। বলে, অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায়, যেন কিছুই ঘটেনি এমনই ভঙ্গিতে পাশের সোফায় বসে পড়েন পরিমল।

ডাক্তারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে অর্জুন শান্তসুরে বলেন—আমি ওকে ছুটি দিয়েছি সামন্ত, খুব ভোরে পারুল চলে গেছে, ওকে একদণ্ড এখানে রাখতে ইচ্ছে করেনি। ও আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু দোষ ওর হবে না। রাঙাবউকে দেখলে নীচে?

—না।

—ও আমাদের সংসারে বিবেকের পার্ট করে সামন্ত। আমি রাজনীতি করি,

লোকে আমাকে দুষবে। এমনিতেই বলাবলি করছে, আমরা রঙ্গনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। একটা গল্প চালু করে দিয়েছে, বিয়ের পর রঙ্গন ময়ূরীর নোংরা কাচতে চাইনি বলে আমরা নাকি অপমান করি। ওকে আমরা এক্সপ্লয়েট করবার জন্য বিয়ে দিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ।

—মানে !!

—তাই দিয়েছিলাম অর্জুন। বার বার বলেছি ময়ূরীর অনুভূতি আছে, কিন্তু তা রঙ্গনকে বিশ্বাস করানোর জন্য বলেছি, টু কনভিন্স হিম। অথচ নিজেরা জানতাম ময়ূরী....

—পরিমল। তোমাকে আজ আমি চিনতে পারছি না। শত্রুর মতো কথা বলছ কেন ? তুমিও কি মনে কর রঙ্গনের বউকে আমরা মেরে ফেলেছি। চুপ করে রইলে যে। বিশ্বাস কর, ঘুমের বত্রিশটা তাজা বড়ি ময়ূরীকে খাওয়াতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। আমি পারিনি পরিমল ! খাটো করে বলছি, পারিনি। বিলিভ মি। তুমি আমাদের বন্ধু।

অর্জুনের কথা শুনতে শুনতে ডাক্তারের কষ্টই হচ্ছিল। তিনি আশ্চর্য হয়ে ময়ূরীর বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। নিউরো-মেডিসিন ডাক্তারদের বোধ হয় কিছু অদ্ভুত পাগলামি থাকে।

—ময়ূরীর একটা ডেথ-সার্টিফিকেট দিতে হবে সামন্ত। তুমিই ওকে দেখেছ ! ওরা যদি স্লোগান দেয় !

—কারা ?

—সামনে ভোট। মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন। সামনের মাসে। পার্টির সঙ্গে কথা হয়েছে, আমাকে দাঁড়াতে হবে। আমি কি পারব ! ময়ূরী যে চলে গেল !

—তুমি দাঁড়াবে না।

—কিন্তু সে উপায় নেই পরিমল। পার্টি শুনবে না। পলিটিক্স আমাকে খেয়ে ফেলেছে।

—পরে তোমাকে বলছি ! বলে পরিমল সামন্ত দ্রুত বার হয়ে চলে যান। একটু বাদে একজন ফটোগ্রাফারকে ধরে আনেন ফটোর দোকান থেকে। ময়ূরীর গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে বলেন—কাছে থেকে তোলো। ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার তুলবে।

—এ কী করছ সামন্ত। এ অন্যায়।

—না। তুমি পলিটিক্সের কথা তুলতে পার, আমি ফটো তুলতে পারি না।

—বলছি অন্যায়।

—না তোলাটাই অন্যায় হবে অর্জুন। দেবপ্রিয়া, তুমি আমাকে বাধা দিও না! আমি যখন অন্য কাউকে বলব, এই রকম আরও 'কেস' আছে, আমাকে তাদের বলতে হবে যে, দ্যাখো, জড়বুদ্ধি যাকে বলি, সে তা নয়। একবার যে মানুষ হয়ে জন্মায়, তার সব থাকে। ম্যান ইজ এ লাভিং এনটিটি, তার সৌন্দর্যের সীমা নেই।

—তুমি তোমার দোকানে এই জিনিস টাঙিয়ে রাখবে।

—হ্যাঁ। ময়ূরীর এই ঘরখানাতেও একখানা থাকবে! রঙ্গন ফিরে আসবে!

—না। আসবে না। আমি আসতে দেব না। ওর চাকরি শেষ হয়ে গেছে। তুমিও চলে যাও পরিমল। বলে ওঠেন অর্জুন।

—ময়ূরীর নামে যা অর্থকড়ি আছে, সবই রঙ্গনের প্রাপ্য। ডাক্তারের সিদ্ধান্ত।

—না। এক কানাকড়ি রঙ্গন পাবে না। কিছুতেই দেব না আমি। আর্তনাদ করে বলে উঠলেন অর্জুন।

ডাক্তার সামন্ত বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে যার পর নাস্তি অবাক হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন রঙ্গনের চেয়ে হতভাগ্য এ সংসারে সত্যিই কেউ নেই। ওকে এরা কখনওই ভালবাসেনি, বরং ঘৃণা করেছে।

ডাক্তার শান্ত গলায় বললেন—তাই কিন্তু কথা হয়েছিল অর্জুন। তোমার মেয়েকে ভালবাসতে গিয়ে যে তার জীবনটাকেই পঙ্গু করে ফেলেছে, তাকে তুমি কিছুই দেবে না?

—না। কথা কী হয়েছিল তোমারই মনে নেই ডাক্তার। বলেছিলাম, ময়ূরী যতদিন বাঁচবে ময়ূরীর টাকাপয়সা....

—থাক। আর শুনতে চাই না। আমি জানতাম, ময়ূরীর সর্বস্বই রঙ্গনের। তুমি দিতে বাধ্য অর্জুন।

অর্জুন আর কথা না বলে চুপ করে রইলেন। ডাক্তার সামন্তের মনে হল, বন্ধুটি রঙ্গনের নামটি পর্যন্ত সহ্য করতে পারছেন না। কী আশ্চর্য মানুষের মন, বুঝে পান না পরিমল। অত্যন্ত রেগে ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে ছবি তোলা হয়ে গেলে বাইরে দ্রুত চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন, একবারও তিনি কেকার সঙ্গে কথা বলেননি।

দোতলার সিঁড়ির দিকে উঠতে থাকেন সামন্ত।

—কেকা ! ডাকতে থাকেন ।

—তুমি কিছু বলছ না কেন ! কোথায় তুমি ? বলতে বলতে উঠে আসেন পরিমল ।

ঘরের মধ্যে কেকা নেই। ময়ূরীর ঘরে কেকা নেই। ছাদের এককোণে দাঁড়িয়ে কেকা দেখছে, একটি টুনটুনি পাখি বাসা বুনছে, ওর সঙ্গী খুব ব্যস্ত ।

খুব রোদ উঠেছে আজ। ঠাণ্ডা চলে গেছে। টুনটুনির বাসা হিমে টসটস করছিল, এখন রোদে রেঙে উঠেছে। একটা বড় ভ্রমর গুনগুন করে উড়ছে হেথা হোথা ।

কাঁধে হাত রাখেন ডাক্তার। কেকার কোমল প্রাণটি থরথর করে কেঁপে ওঠে। অসম্ভব কেঁপে ওঠে ।

কেকা বলে ওঠে—ময়ূরীর জানলাটা বন্ধ করে দিতে হবে ডাক্তারকাকা। লোকে দেখে ফেলবে। বলে সে দ্রুত ময়ূরীর জানলার কাছে ছুটে আসে। মৃতদেহ বাইরে চলে যায়। ময়ূরী বিদায় নিলে, চিতা প্রজ্জ্বলিত হয় ।

॥ ছয় ॥

চিতা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং ছাই হয়ে যায়। একটু একটু হাওয়ায় ছাই উড়তে থাকে ; সেই আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অর্জুন শুনতে পায়—মেরে ফেলেছে, বুঝলেন ।

কে বলল ও কথা, শ্মশানযাত্রী, শবদাহকারী মানুষের মধ্যে এই মৃত্যুর চর্চা হয়, মানুষের মন্তব্য কানে আসে। কিন্তু ঠিক কোন লোকটি একথা বলে উঠল চেনা গেল না, মুখ দেখা গেল না ।

সেই কণ্ঠস্বর অর্জুনকে ছাড়ল না। ভোটের সময় সঞ্জয় নামে একজন ক্যাডার এসে বলল—দাদা ! তোমার আর দোষ পেল না শালারা, গাওনা করছে এই বলে যে, তুমি হন্তারক, ভাষাটা লক্ষ কর ; হন্তারক। যে নাকি অসহায় নিজের মেয়েকে মারে ইত্যাদি....একটা পোস্টার অবধি দেখলাম ।

শুনতে শুনতে অর্জুনের ভরাট মাংসল মুখ গাম্ভীর্যে ঝুলে পড়ে। চাপা কষ্টে চোখের কোণ চিকিয়ে ওঠে ।

সঞ্জয় ফসফস করে সিগারেট টানছিল, নাক দিয়ে গলগল করে ধুঁয়ো বেরুচ্ছিল, জ্বলন্ত সিগারেটের অবশেষ অ্যাস্ট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে বলল—

আজকাল রাজনীতি এই রকমই হয়েছে দাদা। তোমাকে হজম করতে হবে। একেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারে চোখ পড়ে কেকার। 'খুনি অর্জুনকে একটি ভোটও নয়।'

রাজনীতি বাবাকে খুনি প্রতিপন্ন করল। বাবা পাশ করতে পারলেন না। এই পরাজয় মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সুকঠিন ছিল।

—আমাকে ময়ূরী ফেল করিয়ে দিলে দেবপ্রিয়া। বলে বাবা যেদিন একটা হৃদয় ছিন্ন করা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সেদিনই কেকা প্রায় বোবা হয়ে গেল। ভোট শেষ হয়ে গেছিল, কিন্তু দেওয়াল লিখন মুছে যায়নি।

বাবা একদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এসে কেকার সামনে বললেন—ময়ূরীর নামের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে দিয়ে এলাম, সব টাকা তুলে কেকার অ্যাকাউন্টে জমা করে দিলাম। আমি আর কোনও চিহ্ন রাখব না। ময়ূরী কে? কেউ নয়।

—তুমি রাজনীতি না করলে আমাদের এত বদনাম হত না গো। বলে মামণি কেমন করে উঠলেন।

ময়ূরীদের বাড়িতে প্রবেশের সকল দ্বারই বোধহয় রঙ্গনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন সন্ধ্যাকাল, বাড়িতে ভেসে বেড়াচ্ছে ধূপের গন্ধ, শীত নেই বাতাসের ঘ্রাণে।

রঙ্গন এসে দাঁড়ায় সিঁড়ির মুখটার কাছে। বিদ্যুৎ চলে গেছে। একটা মোম হাতে করে কেকা সিঁড়ি ভেঙে নামছে, আশ্চর্য আলো পড়েছে ওর মুখে। শেষ ধাপে এসে চমকে ওঠে সে।

—তুমি! কথা বার হল না, কিন্তু এই এক তীব্র জিজ্ঞাসা দীর্ণ বেদনায় মথিত করে তোলে ওর চোখের দৃষ্টি। দু চোখের সন্ধিস্থলে নাকের উপরের ত্বকে সিরসির করে ওঠে ব্যথা এবং ঘৃণা। অথচ এ আমার প্রাপ্য ছিল না। মনে হচ্ছে ভয়ও পেয়েছে কেকা। এমন ভাবিনি। ভাবল রঙ্গন।

মোমবাতিটা কেকা হাত থেকে ফেলে দিল। সেটি সিঁড়ির কাছে মেঝেয় পড়ে গিয়েও নেবে না। রঙ্গন নীচু হয়ে সেটা হাতে করে তোলে। তারপর আলোটি কেকার চোখের সামনে খাড়া করে ধরে। দুজনের মধ্যবর্তী এ আলো বড়ই তমোঘ্ন ছিল, কিন্তু ওরা আলোর স্নিগ্ধতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিস্ময় এবং ঘৃণা আর বিস্ময় এবং ভয় কেকার চোখে প্লাবিত।

রঙ্গন ভাবে, আমি কী করেছি। আমি তো ময়ূরীর কাছে ফিরে এসেছি।

এবং সে মোমবাতি হাতে করে ময়ূরীর ঘরের দিকে যায়। যেতে চায়, পারে না। কেকা পথরোধ করে। দু হাত প্রসারিত করে, অস্ফুট বলে, 'না'।

এবার রঙ্গনের বুকের কাছের জামা এক হাতে চেপে আঁকড়ে ধরে কেকা। ওকে সিঁড়ির দিকে টেনে এনে দোতলায় তুলে আনে।

—অমন কেন করছ! ছেড়ে দাও আমাকে।

কথা শোনে না কেকা। টেনে আনে ঘরের ভিতর। বাড়িতে কেউ নেই, এতই গভীর পীড়াদায়ক নির্জনতা, এতই শূন্যতা চারিদিকে। বাবা নেই, মামণি নেই, লক্ষ্মীর মা নেই, রতন নেই।

বুকের কাছের জামা এবার ছেড়ে দেয় কেকা, তারপর খাটে বসে দু হাতে মুখ ঢাকে। একটু একটু করে ফোঁপাতে থাকে।

—কী হল! বলে অতিশয় অবাক হয়ে যায় রঙ্গন।

উত্তর মেলে না। ঠিক এই মুহূর্তেই যে কেকা প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিল, রঙ্গন কী করে জানবে। ওর গলা দিয়ে স্বর ফুটতে চাইছিল না।

কখন বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে দোতলায় উঠে এসেছিল লক্ষ্মীর মা, ওরা বুঝতে পারেনি। লক্ষ্মীর মা বলল—বলে দাও কেকা, ওর চাকরি নেই।

রঙ্গন চমকে উঠে পিছন ফেরে, এসব ঘটনা দুর্বোধ্য, লক্ষ্মীর মায়ের কথা অর্থহীন ঠেকে।

—ললিতাদি, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না!

—তোর চাকরি নেই বাছা। যার জন্য এসেছিস সে নেই, নীচে গিয়ে দ্যাখ। আয়, তোকে দেখাচ্ছি। বলে ডেকে ওঠে লক্ষ্মীর মা। হতভম্বের মতো রঙ্গন খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

আবার বাধা দিয়ে ওঠে কেকা, সকাতর দৃষ্টিতে রঙ্গনের হাত চেপে ধরে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রঙ্গন নীচে নামে।

দুয়ার বন্ধ ছিল, হাত দিয়ে ঠেলে লক্ষ্মীর মা পাল্লা উন্মুক্ত করে বলে—যা, বউ কোথায়, ঢুকে গিয়ে দ্যাখ, মেরে ফেলবি বলেই তো চলে গেছিলি। তবে মেরেছে কে সেটাই এখন কথা।

আমি দেখতে পাই, চেয়ারটা খালি পড়ে আছে, অনুচ্চ চৌকির বিছানা খালি।

লক্ষ্মীর মা বলে—রোজ কেকা পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে, তুই আসবি বলে। ওই উপরে চেয়ে দ্যাখ, ময়ূরী কী কাণ্ড বাধিয়ে রেখে গেছে। ওই ফটোটা, তোর বিয়ের ফটো, মেয়েটা বুকে করে মরল।

দেখতে দেখতে শরীর অবশ হয়ে আসে। বুদ্ধি কাজ করে না, বোধ কাজ করে না, চৈতন্য নির্বাক। আমি বিশ্বাস করি না ময়ূরী নেই। কিন্তু মন বলে আছে, দৃষ্টি বলে নাই।

আমি এক পঙ্কিল জটিল নির্মম জগৎ থেকে পবিত্র ভালবাসার আশ্রয়ে ফিরতে চেয়েছিলাম, যে সবচেয়ে অসহায় ছিল, সে-ই ছিল আমার ঠাঁই, সে ছিল আমার সবল আশ্রয়, শক্তিমান হৃদয়। আমার চাকরি নেই, কথাটি যে এমন নির্মম, এ মুহূর্তে অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ করতেও চায় না, অসাড় হয়ে যায় হাত-পা।

আমি চেয়ে রইলাম দেওয়ালে টাঙানো ফটোখানির দিকে।

—ডাক্তারবাবু ওই ফটো তুলেছে রঙ্গন! ডাক্তারের চেম্বারেও আর একখানা আছে। তুই ভরতপুরে গিয়ে কী দেখলি ভাই, গাঁ নেই, মানুষ নেই, কিচ্ছু নেই, সব জল!

ময়ূরীর দোরের কাছে দাঁড়িয়ে এই সব কথা বলে চলেছে লক্ষ্মীর মা। ঠিক ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেকা।

—অ্যাদ্দিন কোতায় ছিলি।

—পথে পথে ঘুরেছি, ভেবেছিলাম ভরতপুরের চেনা একজন মানুষকে পাব, তাই ভেবে এর-ওর-তার মুখের দিকে চাইতাম আর ঘুরে বেড়াতাম, কোথাও হয়ত দু-একজন বেঁচে আছে আমার মতো, দেখা হয়নি দিদি। শিবু বৈষ্ণব মরে যাওয়ার আগে বলে গেল, জীবন একটা মিথ্যা কথা। ও মরবার আগে বৈষ্ণবীকে ডাকল, ছেলেকে ডাকল, ধবলি বলে একটা গাই ছিল, তারে ডাকল, তারপর মরে গেল!

—তারপর?

—তারপর একদিন দুপুরবেলা একটা গাছের তলে বসে আছি, চারজন গুণ্ডা আমাকে খাসপুর ছেড়ে চলে যেতে বলেছে, ওরা একটা কুকুরকে গুলি করে মেরে ফেলল, কত কি ঘটে গেল দিদি! বসে আছি গাছের তলে, একা। কেউ আমাকে চেনে না, কাউকে আমি চিনি না। শিবু বৈষ্ণব যেমন করে ধবলি বলে গাইটাকে ডেকেছিল, অমনি করে ময়ূরী আমাকে ডাকল। 'মা' বলে ডাকল আমাকে দিদি। তখন মনে হল, জীবন তো মিছে না গো, আছে একজন আমার।

—নেই রঙ্গন। বলে উঠল লক্ষ্মীর মা।

—আমার এখন কী হবে দিদি, কোথায় যাব। ও যদি অমন করে না ডাকত

বুকের মধ্যে, আমি আসতাম না।

—অ্যাদ্দিন তোর মনে পড়েনি।

—পড়েছে। লজ্জা করত দিদি, লজ্জা।

—কিসের লজ্জা?

—চাকরের লজ্জা গো!

—থাক আর বলতে হবে না। বলে লক্ষ্মীর মা দোর ছেড়ে সরে যায়।

কেকা রঙ্গনকে লক্ষ করছিল, দুটি শান্ত বড় বড় চোখ মেলে চেয়েছিল, রঙ্গন এবার কি আর্তনাদ করবে? ফটোর দিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে কি ডুকরে কেঁদে উঠবে?

কেকা বলল—তবু তুমি এলে না। কিন্তু নিজেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল কেকা, ওর গলায় কোনও শব্দ হচ্ছে না। রঙ্গন আসার পর একবারই মাত্র সে কেঁদে উঠতে পেরেছে, তা-ও খুব আস্তে, খুবই অস্পষ্ট, স্বল্পস্ফুট গলায়। অবাক লাগছে, সে কোনও কথা বলতে পারছে না কেন? কাঁদতেও পারছে না। ঘৃণা সে করেছে, কিন্তু চোখে সেই ঘৃণার বহ্নি জ্বলে ওঠেনি। ভয় সে করেছে, ভয়ের অভিব্যক্তিও যথাযথ হয়নি।

রঙ্গন স্বগতোস্বরে বলল—এটা একটা গল্প। গল্পটা সত্যি হয়েছিল, সত্য হয়েছিল, সেটিও বড়জোর গল্পই ছিল, এখন সেটা ছবি হয়ে গেছে। এই ছবিটা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই, চেয়ারটা খালি। চৌকি খালি। ওই জানলাটার কাছে বসে আকাশ দেখত ময়ূরী। ঝড় দেখত, পাখি এবং সন্ধ্যা হওয়া দেখত। চাঁদ দেখত।

—তুমি কেন আবার ফিরে এলে রঙ্গন। জীবন তোমায় এমন করে মেরেছে, তবু মরনি, পাগল হয়ে যাওনি। এত তোমাকে অপমান করেছি, এত তীব্রভাবে বিঁধেছি। এত ছলনা করেছি, তবু তুমি 'মা' ডাক শুনে এভাবে ছুটে এলে। মনে মনে বলল কেকা, মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না।

ডাক্তার সামন্তর চেম্বার হঠাৎ সেদিন খুলেছিল, রঙ্গন সেখানে এসে উপস্থিত হয়। ডাকে—ডাক্তারবাবু!

রঙ্গনকে দেখে পরিমল সামন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন। কথা বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে যায়।

—তুমি চলে গিয়েছিলে, আমাকেও বলে গেলে না। খবরের কাগজ পড়ে ভেবেছিলাম ইউ উইল কাম ব্যাক। ইউ হ্যাভ টু কাম। ইউ হ্যাভ লস্ট ইওর ভিলেজ ফর এভার। পদ্মা স্ন্যাচড় এভরি থিং। তোমার সব লুট হয়ে গেছে।

খুব দুঃখ হচ্ছিল, ফিরে এসে কী দেখবে। অর্জুন তোমাকে খুঁজে পর্যন্ত এসেছে। মানুষ ভাগ্য মানে না, কিন্তু 'ফেট' বলে একটা জিনিস আছে রঙ্গন।

—পদ্মা আমার ময়ূরীকেও নিয়ে গেল ডাক্তারবাবু। বলেই রঙ্গন টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

—এই গল্পের শেষ কোথায় ডাক্তারবাবু। বলে যেন রঙ্গন কঁকিয়ে উঠল।

—এই ছবিটা দেখেছ? ফটোগ্রাফ। ওরা আমাকে তুলতে দেবে না, আমি জোর করে তুলেছি।

—ময়ূরী তো ছবি ছিল না ডাক্তারবাবু।

—না। আমি লোককে বলি, দ্যাখো মানুষ হয়ে যে একবার জন্মায় তার সব থাকে। একটা জড়পিণ্ডের মধ্যেও ভগবান বল, প্রকৃতি বল, ভালবাসা দান করেন। এই ফটোটা অনেক বাপ-মাকে উৎসাহ দেয়। মঙ্গল বেবিদের ফাদার-মাদার ভাবেন, এই ঘটনা কী করে ঘটল। আমি বলি, রঙ্গন এই জন্যে দায়ী।

—আমার কী উপকার তাতে। বলুন।

—তোমার কথা আমি ভেবেছি। সপ্তাহে দু দিন চেম্বার খোলা হয়, আপাতত সেই দু দিন তুমি এখানে থাকবে। চেম্বারটা ঝাড়াপোঁচা করবে, রোগী সামলাবে। পরে কলকাতায় একটি বাড়িতে তোমার চাকরির ব্যবস্থা হবে। ওরা লোক চায়।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, ওদের সন্তান ময়ূরীর মতো, কথা বলে না, শোনে না, উঠে দাঁড়াতে পারে না।

—না, ডাক্তারবাবু। সে আমি পারব না। আমি নিজে পঙ্গু হয়ে গেছি, আমি আর গল্পের খোরাক হতে চাই না, আমাকে জীবন দিন, একটা আস্ত জীবন আমার চাই।

পরিমল সামন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ রঙ্গন বলল—ভগবান কিছুই দান করে না ডাক্তারবাবু। ভগবানের নাম করে আমায় আর ঠকাবেন না। আমি ময়ূরীকে ভালবাসা দিয়েছিলাম, ও মরবার আগে, সেই ভালবাসার প্রতিদান দিয়েছে, ব্যস। কতক্ষণ হল এসেছি কেকাদের বাড়ি, কেকা একটাও কথা বলেনি। ওদের ওখানে আমার কোনও ঠাঁই নেই।

—কী করবে তা হলে ! পরিমল প্রশ্ন করেন ।

—চাকরবাকরের জীবন কি আর জীবন, ডাক্তারবাবু ! কিছু অর্থ সাহায্য পেলে আমি চায়ের দোকান করব । লজেন্স ফিরি করে খাব । আমি ময়ূরীকে ভুলে যেতে চাই ডাক্তারবাবু ! যারা নিজের সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে, তারা সব পারে ! ওরা চাইত, ময়ূরী মরে যাক । ভগবান জানেন, ওরা ময়ূরীর পরমায়ু চাইত না ।

—ওদের কষ্ট তুমি বোঝোনি রঙ্গন ।

—আমার কষ্ট কি বুঝেছে ওরা !

—না, তা-ও বোঝেনি ।

—আপনি ? আপনি আমাকে বানিয়েছিলেন । ঠিক যেভাবে লেখকেরা গল্প বানায় । আমি যা হতে চাইনি, আপনি আমাকে তাই করেছিলেন । গল্পেও আপনার সাধ মেটেনি, ব্যবসার সুবিধার জন্যে আপনি এখন ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন ।

—কী বলছ রঙ্গন, তোমাকে যে আমি চিনতে পারছি না ।

—আমরা স্বামী-স্ত্রী, তাই না ? কেকাকে জিজ্ঞেস করবেন, কথাটা কত বড় ধাপ্পা । বিয়ে তো হয়েছে, ওর আর আমার সঙ্গে, সেকথা জানেন ?

—কী বলছ, বুঝতে পারছি না । ঠিক করে বল ।

—আর সঠিক করে কিভাবে বলব ! আমি যখন বুঝলাম, ময়ূরী একটা পুতুল, তখন মনে হল, একটি পুতুলের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে, পুতুলের সঙ্গে তো সারাজীবন খেলা করা যায় না ডাক্তারবাবু । আপনি আমাকে বলেছেন কখনও ? কেকা বলেছিল, ময়ূরী ইজ লাইক এ ডল । সেই-ই বিয়ের দিন বলল, আমি যখন বিয়েতে রাজী নই, ও বললে, আসলে তোমাতে আমাতে বিয়ে রঙ্গন, তুমি রাজী হও । রাত্রে মা যখন ওকে শুধালে, কী করে রাজী করালি রঙ্গনকে ? ও বললে, এ ছাড়া পাগলটা রাজী হত না । এমন একটা চাকর তুমি কোথাও পাবে না । এত বড় ছলনা ওইটুকু মেয়ের মধ্যে, ওরা এখন আমাকে চিনতেও পারছে না !

—কী বলছ ।

—এই কথাগুলি লোককে বলেন আপনি ? বলেন না ! আপনি গল্প বানিয়েছেন, কিন্তু আমার জীবনটা বানানো নয় ডাক্তারবাবু ।

—রঙ্গন !

—আপনি অবাক হচ্ছেন ?

—আস্তে কথা বল !

—মনার কাছে আমি জীবন কী জেনেছি, একটা পাগলি মেয়ে আমাকে জীবনের কথা বলেছে, বোকা মা একটা। শিবু বৈষ্ণব সারকথা বলে গেছে। হরিমতীর ছেলেকে বাবুরা শেষ করে দিয়েছে। আমি ওই ফটোটাকে বিশ্বাস করি না ডাক্তারবাবু।

—তুমি চুপ কর রঙ্গন। এত চিৎকার করো না। ওই ফটোটা যদি ভুল হয়, তাহলে আমার ডাক্তারি ভুল। সব ভুল। কে ? কে ওখানে ?

রাত্রি হয়েছিল বলে চেম্বার নির্জন ছিল। আর তাছাড়া আজ সন্ধ্যায় চেম্বার খোলার ডেট ছিল না। পরিমল হঠাৎ কলকাতা থেকে এসে পড়েছেন। চেম্বারে একটু বসলে হয় ভেবে দোর খুলেছেন। রোগী দু-একটা হয়েছিল। এখন ফাঁকা। চেম্বারে যে কাজের ছেলেটা থাকে, তাকেও বাড়ি চলে যেতে বলেছেন সামন্ত। একটু বাদে তিনি নিজেই চেম্বার বন্ধ করে চাবি নিয়ে বাড়ি চলে যেতেন। এমন সময় রঙ্গন এসে উপস্থিত হয়েছে।

দরজাটা আধখানা ভেজানো ছিল, পর্দা ঝুলছিল, বাইরে আলো আছে। পর্দার তল দিয়ে একজোড়া মেয়েলি পা দেখা যায়।

—কে ওখানে ? চড়া গলায় বলে ওঠেন ডাক্তার।

দ্রুত পর্দা এবং পাল্লা ঠেলে বাইরে এসে দেখেন রাস্তায় নেমে চলে গেল কেকা।

—কেকা। বলে একবার সজোরে ডাকলেন পরিমল। কেকা শুনল না।

—তোমাকে খুঁজতে এসেছিল রঙ্গন। সবই শুনেছে। ডাক্তার বলে উঠলেন।

—আমি যাই।

—কোথায় যাবে ?

—স্টেশনে থাকব।

—না। চল আমার সঙ্গে। বলে চেম্বার বন্ধ করে ডাক্তার রঙ্গনকে সঙ্গে করে ময়ূরীদের বাড়ি আসেন।

॥ সাত ॥

অর্জুন বললেন—আমি খুনি। আমার কোনও দয়ামায়া নেই সামন্ত। আমি আগেই বলেছি, ওকে এক কড়ি দেব না।

—ময়ূরী থাকলে কী করতে? প্রশ্ন করেন পরিমল।

—ময়ূরী থাকলে, ও থাকত। ও আর কী কাজে লাগবে। চোখের সামনে ও থাকলে কেকার ক্ষতি হবে। আমি ঠিক করেছি, কলেজ শেষ হওয়ার আগেই কেকার বিয়ে দেব। ওই এক মেয়ে ছাড়া আমাদের আর কীই বা আছে। লক্ষ করছি, কেকা একদম কথা বলে না। ওর কী হয়েছে, বুঝতে পারছি না।

—কথা বলছে না?

—না।

—অ।

ডাক্তার দেবপ্রিয়ার মুখের দিকে চাইলেন। তারপর রঙ্গনের দিকে। এবং হঠাৎ বলে উঠলেন—রাজনীতি তোমার অনেক ক্ষতি করেছে অর্জুন। তোমার অপজিসন পার্টি ভোটের সময় পারুলকে ব্যবহার করেছিল, আমার কাছে খবর আছে। তোমাকে বলিনি।

—জানি।

—তুমি জানো!

—হ্যাঁ। আমার দলের কর্মীরা সব সংবাদ আমাকে দিয়েছে। স-ব। ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন করতে গিয়ে যে ঘটনা তাদের ফেস করতে হয়, তা গভীর লজ্জার কথা। আমি খুনি, কিন্তু সেই খুনের ইতিহাস সামান্য নয় ডাক্তার। তুমি কি জানো, প্রত্যেক পরিবারে রাত্রে পারুলকে নিয়ে গিয়ে ওরা কী কথা কবুল করিয়ে নেয়! জানো না।

—শুনেছি কিছুটা।

—পারুল বলেছে, ঠাণ্ডার রাতে আমি তেতলা থেকে চুপ করে নেমে আসি মাতাল অবস্থায়। বিষ খাওয়াতে না পেরে ঘরের বড় জানলাটাকে হাট করে খুলে দিই, যাতে চোখে দেখতে না হয় মেয়ে মরে যাচ্ছে। বিষের বদলে, কঠিন ঠাণ্ডা বিষ হাওয়া প্রয়োগ করে ময়ূরীকে মেরে ফেলি। জাস্ট ইউ থিঙ্ক, ভোটের জন্য মানুষ কতখানি মিথ্যাকে গল্পের মতো বানিয়ে নিয়ে প্রচারের গুণে বিশ্বাস করিয়ে দেয় মানুষকে। পারুলরা ছোটলোক, তারা কখনও ভাল হয় না

পরিমল।

আমার মনে হল বাবার দৃষ্টিটা ফলার মতো তীব্র হয়ে উঠল, ঘৃণার শলাকা আমারই বুকে এসে বিঁধে যেতে লাগল অস্ত্রের ধারে। কল্পনা করতে পারছিলাম ভোটের পরাজয় ঘটানোর জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ আশ্চর্য হীনভাবে পারুলকে ব্যবহার করেছে, সেই ব্যবহার বাবা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বাবা মনে মনে সিঁটিয়ে গেছেন, মানুষ সম্পর্কে তাঁর আর কোনও শ্রদ্ধা নেই।

ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা যায় না। অত্যন্ত সংকোচে আমি মাথা নীচু করি।

—জীবনের কোনও পরীক্ষায় আমি ফেল করিনি পরিমল। ভাবতে পারি না, ময়ূরী আমার লাইফটাকে কত দূর কুৎসিত করে রেখে গেল। গেলও শেষ পর্যন্ত, কিন্তু জড়পিণ্ডের এত ক্ষমতা আগে বুঝিনি। বলতে বলতে অত্যন্ত করুণ করে ঢোঁক গিললেন বাবা।

পরিমল বললেন—সবই বুঝি অর্জুন। কিন্তু এই হতভাগ্য ছেলেটার কথা তোমাকে ভাবতে হবে। একে যদি এখন তাড়িয়ে দাও, লোকে আরও প্রচারের সুবিধা পাবে। তাছাড়া রঙ্গনের মনের অবস্থাটা তোমাকে বুঝতে হবে।

অর্জুন বললেন—আমি আর কারও মন বুঝতে রাজী নই সামন্ত। চাকর জাতটাকে আমি বিশ্বাস করি না। রঙ্গন যে বিয়ের রাত পোয়াতে না পোয়াতে ময়ূরীকে ফেলে পালাল, যাই ঘটে থাক, আমায় কেন বলল না। খুনি আমি নই, ময়ূরীকে হত্যা রঙ্গনই করেছে। কোনও ঘাতককে, ওই মার্ডারারকে আমি বাড়িতে স্থান দেব না।

রঙ্গন হঠাৎ কেমন আশ্চর্য সাহসী হয়ে উঠেছিল। ফস্ করে বলে ফেলল—আমি থাকলাম না বলে জানলাটা খোলা রইল, কেউ একবার দেখলও না। ডাক্তারবাবু বলেছেন পশ্চিমের জানলাটা খোলা ছিল।

—পারুল বন্ধ করেনি। কেউ তো সে কথা বলছে না একবার। কেন বলছে না? কই, রাঙাবউ তো এত করে বলে, তার সেই বিবেক কোথায় গেল। আমি মানুষ নই, আমার মান সম্মান নেই। আমার কষ্ট হয় না।

—আপনি তো ক্যান্ডিডেট। অদ্ভুত স্বরে বলে ফেলে রঙ্গন।

মুহূর্তে অর্জুনের রক্ত তোলপাড় করে ওঠে, ক্রোধের সুতীব্র আগুন রক্তের প্রবাহে ছুটে যায়। মাথা এত গরম ওঠে যে, তিনি আর সংবরণ করতে না পেরে সোফা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, ভয়ংকর কাঁপতে কাঁপতে আমার কাছে তেড়ে এসে বলেন—কী বললি, ক্যান্ডিডেট। বলে ডাক্তারবাবুর সামনেই

উনি আমার গালে একটা চড় মেরে বসেন—হতভাগা, তুই আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস। ময়ূরীর জন্যে দর করতে এসেছিস এখানে। যা, চলে যা। বাঁদর, খুব মুখ পেয়েছ না ?

—অর্জুন। তুমি এ কী করলে, ওকে মারলে। মাস্টারকে তুমি মারলে। এ তোমার ঠিক হল না, কিছুতেই ঠিক হল না। ভোটে ফেল করেছ তুমি, আর ও মার খেল। ডাক্তার অসম্ভব আশ্চর্য বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তারপর গলায় বেদনার্ত সুর আরও নমনীয় করে বলেন—ডাক্তার হিসেবে আমি খুব কল্পনাপ্রবণ অর্জুন। আমি রঞ্জনকে সামান্য ভাবি না। ওর কে আছে। ওর গ্রাম নেই, মাটি নেই, মা নেই। ওর সমস্ত পরিশ্রমের দাম তোমাকে দিতে হবে। তুমি মারতে পার না।

এমন সময় দোরের কাছে ছায়া নড়ে ওঠে, বাইরে কোথাও ছাদের ওদিকে ছিল কেকা। এরা ভেবেছিলেন, কেকা এদিকে আসবে না। ছায়াটি মৃদু গলায় ফুঁপিয়ে উঠল। ওই কান্নায় কী ছিল ভগবান, ওই কান্নায় কী ছিল। আমার যে চোখে জল এসে পড়তে চাইছে। আমি যে মাস্টার, আমার কি কান্নাকাটি করা চলে। আমি ময়ূরীর বর, আমার কি কান্নাকাটি করা মানায় ? আমি কি এখানে আমাকে বেচতে এসেছি। ময়ূরী কি ভাবত আমাকে এই অবস্থায় দেখলে। খুব অহংকার হল আমার, প্রচুর অহংকার চাগিয়ে ওঠে অন্তরে। গ্রাম নেই আমার, মাটি নেই আমার, মা-বাপ নেই, ভাইবোন নেই, তেরোকাঠা জমি ছিল, তা-ও কীর্তিনাশা গ্রাস করে ফেলেছে। যে ছিল অসহায়, শুদ্ধ প্রেম, নিরুপায় মানবী, সে চলে গেছে। সম্পর্কশূন্য এই ধরণী আমাকে কেন তবে মারে। রানি আমাকে চারআনা পয়সা দিয়েছিল ডোল ডোল জল তোলার বিনিময়ে। ওর ছিল লম্বা কেশপাশ, নয়নবউয়ের মতন। নগ্ন মনা যেমন করে কেঁদে উঠেছিল, আমি কি তেমন করে কাঁদতে পারি।

গালে হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। ডাক্তারবাবু উঠে যান দোরের কাছে। বাইরের খোলা ড্রইংয়ের আলো থেকে কেকাকে ঘরের ভিতরের আলোয় হাত ধরে টেনে আনেন। কেকা এসে বসে খাটের উপর, পা দুখানি মেঝেয় স্থাপিত। পা, অতি নির্মল, দেবীদের মতন, সরস্বতীর মতন কোমল, রক্তআভাসিত সেই পায়ের সৌন্দর্য, আমি দেখি। চোখে ওর একফোঁটা জল নেই। শুকনো, অন্যমনস্ক, ব্যথার সূক্ষ্ম আলোড়ন দেখি না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, সে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। কান্না এবং সে এতই আলাদা।

বললাম—আমি এক কড়ি নেব না বাবু! দিলেও নেব না। কানাকড়িও

চাইব না। মামণি বলেছিল, ময়ূরীকে দেখলে ভগবান আমাকে দেখবে। আমি তাকে দেখিনি, ভগবানও আমায় দেখেনি। ময়ূরী থাকলে আমার সব থাকত ডাক্তারবাবু। ভগবানও থাকত। ময়ূরীর ঘরটায় আমায় শুতে দেবে মামণি। আমি আর কিচ্ছুটি চাইব না। বলতে বলতে আমি খাটে বসে থাকা মায়ের ঝুলন্ত পায়ের তলায় বসে পড়ি।

ডাক্তার পরম আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। রা হয় না তাঁর মুখে। মামণি আমার মাথায় হাত রেখে বলেন আজকের রাতটা থেকে যা বাছা। বলে ভয়ে ভয়ে স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন দেবপ্রিয়া।

ডাক্তারবাবু তন্ময় হয়ে দেখছিলেন রঙ্গনকে। ভাবছিলেন বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের কেষ্টা নতুন রূপে জন্মেছে দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষের বুকে। চলনে বলনে কেষ্টার শামিল। ছাড়াতে চাইলেও ছাড়তে চায় না। উনি ভাবছেন, কেকার মতন কেউ রঙ্গনকে চেনেনি। মুখে বললেও স্বাধীনতা চায় না রঙ্গন। ও জানে না, চাকর আর মনিব পরস্পরের সত্য সম্বন্ধটা কতখানি বিরোধাত্মক। পারুলকে রাজনীতি ব্যবহার করে শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে, তাতে রাজনীতির দোষ নেই। ভোটে আর যুদ্ধে কোনও নীতি, সুনীতি চলে না। ভোট হল ভারতবর্ষের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় ব্যাধি, ময়ূরীও তার পক্ষে ব্যবহার্য ইন্ধন।

ডাক্তারবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেকার সামনে চেয়ারটা উঠিয়ে নিয়ে যান এবং বসেন। তারপর বলেন—কথা বল কেকা। সবাই আমরা কথা বলছি, তুমি চুপ করে আছো কেন ?

কেকা স্থির চোখে কিছুক্ষণ ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর কোনও কথা না বলে খাট ছেড়ে নেমে পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। ডাক্তার সামন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, ওর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে।

—আমি ঠিক বুঝছি না, কী হল মেয়েটার। রঙ্গন চলে যাওয়ার পর ও আমার কাছে গেছে। রঙ্গন ফিরে আসবে কিনা জানতে চাইত। দিন যত যাচ্ছিল, ওর হতাশা তত বাড়ছিল। কথা বলা কমে যাচ্ছিল। ও কথা বলতে না চাইলে বেচারির মানসিক ক্ষতি হয়ে যাবে দেবপ্রিয়া, ওকে যা করে হোক কথা বলাতে হবে। শোন, দেবপ্রিয়া। বলে ডাক্তার চোখের ইশারা করে নীচে নেমে চলে আসেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে লোহার বড় গেটের কাছে এসে বলেন—রঙ্গন রইল। ও এখানেই থাকবে। ওকে তাড়িয়ে দিলে কেকার চিকিৎসা সম্ভব হবে কিনা বলতে পারছি না। আবার এমন হতে পারে, রঙ্গনকে দেখেই ও কথা বন্ধ করে দিয়েছে। তা যদি হয়, তা হলে রঙ্গনকে বাধ্য হয়েই

বিদায় করতে হবে। আমি কাল একবার আসব। অর্জুনকে বলবে, ও যেন রাজনীতির আলোচনা না করে।

কথাগুলি দোরের পাল্লার আড়াল থেকে শুনে ফেলে লক্ষ্মীর মা। রঙ্গন যখন রাত্রে শোয়ার জন্য ময়ূরীর ঘরে ঢোকে, লক্ষ্মীর মা কাছে এসে বলে—মেয়ে কথা বলছে না, এরা তোকে রাখবে ভাবিস। কখনও রাখবে না। ডাক্তার বলে গেল... থাক বাবা, কী শুনতে কী শুনেছি। ডাক্তারের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

একটা মানুষের জীবন কত অনিশ্চিত হতে পারে সেই রাত্রে বুঝতে পারি। ময়ূরী মরে গিয়ে আমাকেও যেন মারতে চাইছে। ওর ঘরে শুয়ে ঘুম আসে না। দেওয়ালের ফটোটা যেন শায়িত মুদ্রা ছেড়ে উঠে বসে। ওখান থেকে নেমে এসে ওর চেয়ারটায় বসে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে পাই। ওর চোখে জল দেখতে পাই।

—তুমি কাঁদছ ময়ূরী। এত ভালবেসেছিলে, এত মান দিয়েছিলে আমাকে। এরা যে সে কথা বুঝতে চাইছে না। আমি কি কানাকড়ির লোক, তুমিই বল। কেকা কথা বলছে না, তার জন্যও এরা আমাকেই অপরাধী করতে চাইছে, তোমার হত্যার দায় আমারই কাঁধে চাপাতে চাইবে। কে। কে ওখানে ?

দোরের কাছে ছায়া দেখে চমকে উঠি। দেখি, এত গভীর রাতে কেকা ময়ূরীর ঘরে এসে ঢুকল। সোজা চলে এল খোলা জানলাটার কাছে। আধখানা চাঁদ ভাসছিল আকাশে। সেদিকে চেয়েছিলাম। ও কপাট বন্ধ করে দেয় জানলার।

আমি অনুচ্চ চৌকিতে নয়, মেঝেয় শুয়েছিলাম, একটা বালিশ এ ঘরে ছিল, আর কোনও বিছানাপত্র ছিল না, খালি মেঝেয় শুয়েছিলাম। আমি আসার পর আগের সাজানো বিছানা এরা আর এ-ঘরে রাখেনি। উঠে গিয়ে বলি—চাঁদটা আমাকে দেখতে দাও কেকা, বন্ধ করো না।

—না। শুধুই এইটুকু উচ্চারণ কি শুনলাম। কেকার হাত চেপে ধরেছি আমি। ও জোর করে ঠেলে আমাকে সরিয়ে দিতে চায়। আমি পাল্লা দুটি খুলে রাখার জন্য সামান্য জোর করি। হঠাৎ কেমন চোখ পাকিয়ে তোলে কেকা, নিষ্প্রভ মৃদু বালবের রাত-আলোয় ওর চোখে ছায়া খেলে ওঠে। ঈষৎ অশ্রুর ছোঁয়ায় ওর চোখ চিকচিক করছে।

জোর করে ওকে পারি না। বলি—আবার শীত আসবে কেকা। এখান থেকে আমি নড়ব না। খুব ঠাণ্ডা পড়বে যেদিন, ওই জানলাটা আমি খুলে

দেব। ঠিক খুলে দেব, দেখে নিও।

এবার ভয়ে কেকার মুখ কেমন শুকিয়ে গেল, আমার মুখের উপর ওর নিবদ্ধ দৃষ্টি কেমন স্থির হয়ে রইল। ওর হাত শিথিল হয়ে গেল। ও ঘাড় নীচু করে চলে যাচ্ছিল ধীর পায়ে। দেখলাম, ওর চোখের তলে কেমন কালি পড়েছে, ভীষণ করুণ হয়ে রয়েছে ওর দৃষ্টি।

—তুমি কথা বলছ না, তা-ও কি আমারই দোষ কেকা। যদি বলি, এ সমস্তই তোমার অভিনয়, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ভান করে রয়েছ। এ কথা শুনে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কেকা, ঘুরে দাঁড়ায়। ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে পিছনে বাঁকা করে চেয়ে আমাকে দেখে। কথা বলে না। কেমন এক ধরনের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ওর, বুক ভরে শ্বাস টানার চেষ্টা করছে, পারছে না। সমস্ত দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। ও আর সামলাতে না পেরে দোরের কপাট আঁকড়ে ধরতে গিয়ে হাত পিছলে গেল, পারল না, পড়ে গেল।

খুব স্তম্ভিত করে দেয় কেকা। কপাল ঠুকে যায় কপাটে, তারপর ওখানেই গড়িয়ে পড়ে।

—কেকা! তোমার কী হয়েছে, অমন কেন করছ। বলতে বলতে ওকে খাড়া করে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারি কেকা উঠে দাঁড়াতে পারছে না। পায়ে কোনও বল পাচ্ছে না। আমার বুকের উপর ভেঙে পড়ে অত্যন্ত কষ্টে ডুকরে উঠল। তারপর ফের মেঝেয় পড়ে গেল আমার বুক থেকে ধসে পড়ার মতো।

পরের দিন সকালেই পরিমল সামন্ত এ বাড়ি আসেন। অনেকক্ষণ ধরে কেকাকে পরীক্ষা করেন। চোখেমুখে তাঁর অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে। কথা বলেন না দীর্ঘ সময়। স্টেথোর নল হাতের মুঠোয় ধরে চুপচাপ বসে থাকেন চেয়ারে। তারপর আমাকে ডাকেন।

—রাত্রে কেকা ময়ূরীর ঘরে নেমে গিয়েছিল, তাই না?

—আজ্ঞে।

—তারপর?

—জানলার পাল্লা ঠেলে বন্ধ করে দেয়।

—তুমি তখন কী কর?

—জানালাটা বন্ধ করতে মানা করি, বাধা দিই। ও শোনে না। জোর করে।

—তোমার সঙ্গে একটু ধস্তাধস্তি হয়।

—হ্যাঁ।

—কেকা পড়ে যায়।

—আজ্ঞে।

—ওঠাতে গেলে ওঠে না!

—পায়ে কোনও বল নেই মনে হল!

—তুমি ওকে কিছু বলেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কী বলেছিলে?

—বলেছি, একদিন শীত আসবে আবার। ওই জানালাটা আমি খুলে দেব তখন।

—ও!

ফের চুপ করে যান ডাক্তার। একবার তিনি অর্জুনকে দেখেন, একবার দেবপ্রিয়াকে। তাঁর চোখে যে উৎকণ্ঠা জেগে উঠেছিল, তা তিনি জোর করে সরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে হেসে ওঠেন।

—হুম্। বলে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলেন এবং আবার নীরবে হেসে আমার দিকে চোখ ফেরান। এবং কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠেন। হাসার চেষ্টা করেন, হাসি এসে ঠোঁট ছুঁয়েই মিলিয়ে যায়।

হঠাৎ করে তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন ডাক্তার সামন্ত। খাটে শায়িত কেকা। দুটি চোখ তার রুদ্ধ। ওর মাথার সমীপে, বালিশের কাছে ব'সে দেবপ্রিয়া। অর্জুন রয়েছেন খাট থেকে দূরবর্তী সোফায়। দেওয়ালের দিকে। পৃথিবীতে ভোরের আলো চম্পাকলিকার ন্যায় স্নিগ্ধ। সাধু ভাষার মতো প্রসন্ন গভীর সেই আলো, যেন বঙ্কিমচন্দ্রের ললাট থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। কিংবদন্তীর দেশ থেকে একটি হলুদ পাখি শিস দিচ্ছে, ওর ডানার তলে কালো পোঁচ। একটি লেজঝোলা এসে তার সঙ্গে ভেড়ে, ওর সাদা লম্বা ফর্দের মতো লেজটি ডালে জড়িয়ে গিয়ে ফরফর করে। ওড়ার চেষ্টা করে। পারে না। ও বুঝতে পারে না, অদ্ভুত সে জড়িয়ে গিয়েছে। মানুষের মস্তিষ্ক কি কখনও এ ভাবে জড়িয়ে যায়!

ডাক্তার ঝুঁকে পড়েন কেকার মুখের কাছে। খুব ঘনিষ্ঠ কাছে, কানের কাছে, প্রায় যেন মুখটা গুঁজে দিয়ে কথা বলেন—কেকা! তুমি ময়ূরীর ঘরে যাবে? তুমি নামবে নীচে? কথা বল!

দয়ায় আর্দ্র ডাক্তারের গলা। চোখ খুলে ফ্যালফ্যাল'করে ডাক্তারের মুখের

দিকে চেয়ে থাকে কেকা।

অর্জুন বলেন—বিয়েটা আমি দিয়ে ফেলতে চাই সামন্ত। আমি আর ওর উচ্চশিক্ষার কথা ভাবি না।

ডাক্তার এবার মুখে তুলে অর্জুনকে দেখেন, তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলেন—কথা বলুক মেয়ে, তারপর নিশ্চয় বিয়ে দেবে।

—ও, কথা বলছে না কেন ? একটু উত্তেজিত শোনায় অর্জুনের কণ্ঠস্বর।

—বলছে না কেন, সেটাই তো বুঝতে চাইছি অর্জুন। এখন বিয়ের চেষ্টা করলে বড্ড আহাম্মকি হবে। সবাই জেনে যাবে যে, তোমার মেয়ে বোবা হয়ে গেছে। পাত্রপক্ষ এই বিয়েতে রাজী হবে কেন ? আগে কেকার চিকিৎসা দরকার, ওকে কথা বলানো দরকার।

—ময়ূরী এইভাবে শোধ নেবে আমার ওপর ! কেকা কথা বলবে না ? ওর বিয়ে হবে না ? কী বলছ তুমি পরিমল ! কঁকানো গলায় বলে ওঠেন অর্জুন, চোখ থেকে চশমা নামিয়ে ফেলেন। রুমাল বার করে চোখদুটির কোণদুটি মোছার চেষ্টা করেন, হাত থেকে রুমাল মেঝেয় পড়ে যায়। কেমন বোকার মতন করেন তিনি।

ডাক্তার বলেন—তুমি সাততাড়াতাড়ি অনেক কিছু ভেবে নাও। ময়ূরী তোমার ওপর শোধ নিচ্ছে, একথার মানে কী ? কেকা কথা বলবে না, সেকথা কে বলেছে।

—তাহলে বলছে না কেন !

—বলবে ! রঙ্গন চেষ্টা করলে কেকা নিশ্চয় কথা বলবে।

—রঙ্গন চেষ্টা করলে মানে কি ? ওর জন্যই তো কথা বলছে না, পরিমল। তুমি কেমন ডাক্তার, বুঝতে পারছ না !

—ডাক্তার হিসেবে আমি অসম্ভব কল্পনাপ্রবণ। অনেকদিন একথা বলেছি।

—হ্যাঁ, বলেছ । তাতে কী হল ?

—আমি কল্পনা করি, আসছে শীতে খুব শৈত্যপ্রবাহ হবে। তাই না রঙ্গন ?

—হ্যাঁ। রঙ্গন সমর্থন করে।

—তারপর কী ঘটবে আমরা জানি না।

এবার হঠাৎ কেকা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল।

—যে শব্দ করে কাঁদতে পারে, সে কথা বলতেও পারে। কথা বল কেকা, আমাদের কষ্ট দিও না। কেন চুপ করে আছো ? বারংবার বলতে থাকেন ডাক্তার পরিমল সামন্ত।

—শীতকাল এলে রঙ্গন চলে যাবে। তাই তো রঙ্গন ?

—হ্যাঁ।

—একটা কানাকড়ি নেবে না।

—না।

—শুনলে কেকা ?

কেকা অশ্রুমাখা চোখ দু'টি থেকে দু'হাত সরিয়ে ফেলে।

—এসো দেবপ্রিয়া আমরা নীচে যাই। বলে ডাক্তার ডাক্তারি ব্যাগ এবং স্টেথো হাতে করে সিঁড়ির দিকে চলে যান। অর্জুনও নীচে নামেন। ঘরে থাকে রঙ্গন আর কেকা।

আবার চোখ বন্ধ করে কেকা। রঙ্গনকে দেখে না। ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে রঙ্গন তখন আলমারির তালা খুলে কেকার ডায়েরি বার করে ফেলে।

ছাদে চলে আসে। এই ডায়েরির কথা বাপমায়ের ঠিক জানা নেই, অথচ এই গোপন জায়গাটা রঙ্গন চেনে।

ময়ূরী লিখেছে। এক স্থানে। সাধু ভাষায়।

প্রকৃতি ময়ূরীকে মারে নাই। আমিই তাহাকে মারিয়াছি। ময়ূরীর কষ্ট দেখিয়া সহ্য হইত না। নগ্ন হইয়া ময়ূরী চেয়ার আঁকড়াইয়া কি দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দুই পা বাহিয়া ঋতুস্রাব হইতেছে, উত্তেজনায় কাঁপিতেছে অসহায় জীবটি, উহাকে দেখিবার কে আছে। পারুল পয়সা লইয়া কাজ করে, সেবা করিবার অথবা অবলাকে স্নেহ করিবার মন তাহার নাই। ময়ূরীর অস্তিত্ব সে মাঝে মাঝে, ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যায়। নিজেকে ভোলাইবার জন্য পারুল মন দিয়া বাংলাদেশ রেডিওর পল্লীগান, বাউল গান, মুর্শিদি, কোচবিহারী ভাওয়াইয়া, চাটগাঁঙী নানান গান শুনিয়া থাকে, পা নাচাইয়া থাকে। রক্ত মাখিয়া, মল মাখিয়া ময়ূরী পড়িয়া থাকে, চেয়ার এবং দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকে, কেহ তাহাকে দেখে না। রাত্রিতে গা হইতে লেপ সরিয়া গেলে গায়ে তুলিয়া দিয়া যত্ন করিবে, ময়ূরীকে শীতে উষ্ণতা দিবে এমন কে আছে। ময়ূরী আপনি মরিবে, তাহাকে এইভাবে কষ্ট না দিয়া মারিয়া ফেলিলে অধিক শুভ হইবে। উহার মঙ্গল যে চাহিবে, সে তাহাকে মারিতেই চাহিবে।

আমি মারিতে চাহিয়াছিলাম। বাবাকে মাকে যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলাম। সেই রাত্রিতে তাহার জানালার কপাট খোলা রইল, খোলাই রহিল। ভাবিলাম, নীচে নামিয়া পাল্লা বন্ধ করিয়া আসি, ভাবিলাম, কিন্তু করিলাম না। লেপের উষ্ণতা আমাকে টানিয়া ধরিল, শরীরের আরাম আমাকে

বাঁধিয়া রাখিল। বাবা যাহাকে ঘুমের বড়ি খাওয়াইয়া মারিতে চাহিলেন, পারিলেন না, অসহ্য কঠিন সুরে আর্তনাদ করিলেন, মত্ত মানুষটির সেই গুমরানো চিৎকার শুনিলে অবিশ্রান্ত কাঁদিতে ইচ্ছা করে, হৃদয় দম পায় না। নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করিয়াও বুঝি নাই, ময়ূরীকে মারিয়া ফেলিয়া আমার কী লাভ হইল।

রঙ্গনকে আমিই তাড়াইয়াছি, ময়ূরীকে মারিয়া বাপমাকে পাগল করিয়া দিয়াছি। কেন আমি নীচে নামিলাম না, আমি তো সকলই জানিতাম। তাহা হইলে কি এইরূপ ভাবিব যে বাপ এবং মেয়ে একত্রে মিলিয়া ময়ূরীর মৃত্যুর পরিকল্পনা করি। বাপ পারিলেন না, কিন্তু মেয়ে উহা অনায়াসে করিল। এইরূপ নিষ্ঠুর হৃদয় কি কাহাকেও ভালবাসিতে পারে! ময়ূরীকে বড়ি বা বিষ দিয়া মারিয়া দেওয়া অপেক্ষা ঠাণ্ডা বাতাস দিয়া হত্যা করা অধিক নিষ্ঠুর কাজ। তাহা যে কত নিষ্ঠুর হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে ডাক্তারকাকার তোলা ফটোখানির দিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে। মানুষকে মারিতে গিয়া আমি একটি ভালবাসাকে খুন করিয়াছি, কোথাও রক্ত ঝরে নাই, শুধু ময়ূরীর হৃদয় রক্তাক্ত হইয়াছে। সে আমার ভগিনী ছিল, আমি তাহার মতো ছিলাম। এ কথা মিথ্যা, ময়ূরীর মৃত্যুতে তাহার প্রমাণ রহিয়া গেল, জগৎ জানিল না। ডাক্তারকাকা কাহিনী তৈয়ারি করিতে পারেন, জীবন জানিতে পারেন না। ছবি তুলিতে পারেন, কিন্তু ছবির অর্থ করিতে হিমসিম খাইয়া বিস্তর বকিতে থাকেন, আসল ঘটনার নাগাল করা অসাধ্য হইয়া উঠে। আমি জানি, আমি না বলিলে উনি জানিতেও পারিবেন না। রঙ্গন ফিরিলে বলিব, আমি শেষ করিয়া দিয়াছি।

কেকা, অন্য দিন একস্থানে অন্য এক কথা লিখেছে।

ভোটার তালিকায় আমার নাম তুলিয়া দিয়াছেন সরকার বাহাদুর। বাবা ভোটে প্রার্থী হইলে আমি মনে মনে এতই অপ্রসন্ন হইয়াছিলাম যে বলিতে পারি না। বিরুদ্ধ পক্ষ বাবাকে খুনি বানাইয়া বাবার ভোট কাড়িয়া লইল এবং যে উপায়ে তাহা করিল তাহা ভাবিতে বসিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কলেজ হইতে ফিরিবার পথে হিদুদার চায়ের দোকানের দেওয়ালে চোখ পড়িতেই মন কেমন বিষণ্ণ হইয়া গেল। বাবার নামে দেওয়াল লিখন হইয়াছে, পোস্টার পড়িয়াছে। খুনি অর্জুনকে এক ভোটও নয়। গলিতে গলিতে স্লোগান শোনা গেল, 'নিজের মেয়ে মারে কে, অর্জুন মাস্টার আবার কে' —একথা বিশ্বাস করাইতে তাহারা পারুলকে সাক্ষী করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাইতে লাগিল। সেই দিন রাত্রির কথা মনে হইলে এখনও প্রাণ ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

আমার কলেজ যাইতে আর ভাল লাগে না। ভোট শেষ হইয়া গিয়াছে। বিপুল ভোটে মানুষ জিতিয়াছে, ময়ূরী বাবাকে মৃত্যুর পরও ছাড়িল না। বাবা ফেল করিয়া এতই মুষড়াইয়া পড়িল যে, চাহিয়া দেখিতে ভয় হইত। কলেজ যাইবার পথে, ফিরিবার পথে বাসি পোস্টারে, বাসি লিখনে চোখ পড়ে, পোস্টার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দেওয়াললিপি মুছিয়া যাই নাই। বাবা এখনও খুনি হইয়া রহিয়াছে। ওই ভাগ্যলিপি চুন দিয়া লেপিয়া দিতে পারিত রঙ্গন, কে এখন তাহাকে পাইবে। ওই পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে প্রতিদিন আমার মন খারাপ হইয়া যায়।

ওই ধূর্ত, ভয়ংকর লিপিগুলি আজও আমার বুকের মধ্যে কুৎসিত স্লোগান জাগাইয়া তোলে, মনে করাইয়া দেয়, বাবা এক রাত্রে ময়ূরীকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, পারে নাই। তাহার সেই পিতৃহৃদয়ের কথা কেহ জানিবে না। পারুল বাবাকে এমন এক ঘৃণার জগতে ছুঁড়িয়া দিয়াছে যে, মানুষের প্রতি বাবার বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, অথচ বাবা রাজনীতিকে ঘৃণা করিতে পারিত। এত ব্যর্থতার পরও বাবা রাজনীতি ছাড়ে নাই, বুঝিয়া পাই না, রাজনীতি কি কোনও এক ধরনের ধর্মান্ধতা ? ময়ূরী বাবাকে ছাড়িয়া গেল, বাবাকে রাজনীতি ছাড়িল না। ভগবান মানুষের অশেষ দুর্গতি ঘটাইলেও মানুষ যেমন ভগবানকে ছাড়িতে পারে না। রাজনীতিও বিশেষ এক ধরনের ভয়ংকর লোকের, কঠিন লোকের কাজ, তাহারা গুণ্ডা-বদমাশ অপেক্ষা ধারালো এবং নিষ্ঠুর আর লোভী। আমি গান্ধীজী, নেতাজী, মার্কসের রাজনীতি পুস্তকে, ইতিহাসে পড়িয়াছি, তাহার সহিত ময়ূরীর রাজনীতির সম্বন্ধ বুঝিয়া পাই নাই। বাবা সন্তানশোক বুকে করিয়া ভোট চাহিয়া ফিরিল, খুনি হইয়া গেল, তথাপি মুখ ফিরাইতে পারিল না—শুধু সেই কথা ভাবিয়া শেষ কাঁদিতে পারি না, দেওয়াল লিখনে চোখ পড়ে, রঙ্গন আসিলে হইত।

অন্যত্র কেকার দিনলিপি নিম্নরূপ

বোনটি চলিয়া গেল, জড়পিণ্ডেরও প্রাণ ছিল, হৃদয় ছিল তাহা সে বুঝাইয়া ছাড়িল। ময়ূরী আমার জন্য তাহার চেয়ারটি খালি রাখিয়া গিয়াছে।

আর নেই। এখানেই ডায়েরি থেমে গেছে। ক্রমাগত ওই বাক্যটি রঙ্গনের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, শরীরে নেশার মতো প্রবেশ করে, কী শব্দ সে পাঠ করল।

ময়ূরী আমার জন্য তাহার চেয়ারটি খালি রাখিয়া গিয়াছে।

এ অসহনীয় প্রস্তাব কেকা! এ তুমি কী লিখে রেখেছ! ওই বাক্যটির

প্রতিটি অক্ষর ফলার মতো বিঁধে যায় রঙ্গনের বুকের মধ্যে। ছুঁচ যেভাবে, কাঁটা যেভাবে বেঁধাতে থাকে, হৃদয় সেভাবে বিদ্ধ হয়। অক্ষরগুলি মাথায় গুঞ্জন তুলে ফিরতে থাকে। ডানার মতো ঝাপটাতে থাকে।

লক্ষ্মীর মা প্রশ্ন করে—কেকা কি আর কথা বলবে না রঙ্গন ?

রঙ্গন বলে—জানি না দিদি।

আবার লক্ষ্মীর মা জানতে চায়—ডাক্তার কী বলে গেল তোকে ?

রঙ্গন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে, ওর মাথার মধ্যে ওই একমাত্র বাক্যটি ঘুণ পোকার মতো শব্দ করে যায়। অজস্র প্রজাপতি উড়তে থাকে মস্তিষ্কের আকাশে। ওই শব্দ এবং এমন রঙ পরস্পর বিপরীত দ্বন্দ্ব তৈরি করে। রঙ্গন দিশেহারার মতো করতে থাকে।

স্থানীয় কলেজের এক তরুণ লেকচারার এ বাড়িতে আসে। মামণির তরফের দূর সম্পর্কে এক আত্মীয়। বাবার ফরমাশ এবং তদ্বিরে অনন্যের ওই চাকরি। ফলে এ বাড়ির প্রতি অনন্যের এক ধরনের নিবিড় কৃতজ্ঞতা আছে। বিবাহের প্রস্তাব করেছেন মামণি। অনন্য কেকার রূপমুগ্ধও বটে। একদিন অনন্য রঙ্গনকে শুধালে —কেকা কেন কথা বলে না রঙ্গন ? আমি ওর সঙ্গে প্রেম করব কী করে ? অ্যাই দ্যাখো, লজ্জা পাচ্ছ খালি !

অনন্য প্রথম বাক্যেই বুঝিয়ে দেয়, সে একটা তরল স্বভাবের রোমান্তিক যুবক।

—প্রেম না করে বিয়ে করা যায়। কথা ছাড়া প্রেম হয় ? কিছুই হয় না। একথা শুনে রঙ্গনের মনটা অতন্ত খারাপ হয়ে যায়। অনন্য রসিকজন, প্রেমের জন্য ভয়ানক রোখ, কিন্তু ভাষাহীন অন্ধকার নারীতে তার আগ্রহ নেই। ওর ধারণা, বউ কথা না বললে সে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়বে। অনন্য কাব্য জানে, কলেজে পড়ায়, বাংলা ভাষা-সাহিত্য ওর সাবজেক্ট।

বলল—ভাষা হল ভালবাসার চক্ষুস্বরূপ।

চক্ষুস্বরূপ কথাটি এতই সাধু যে, রঙ্গন অনন্যর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মাস্টাররা ওই রকম তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন, ওই বাক্যটি মাস্টারি গন্ধে মদির শোনায়।

রঙ্গন বলল—যে-মেয়ের মুখে ভাষা আছে, চোখে নেই, তাকে আপনার ভাল লাগে !

—ইস। তুমি দেখছি দারুণ !

দারুণ বলাটা অনন্যর মুদ্রাদোষ। একদিন বলল— লেখাপড়াটা শিখলে

পারতে !

রঙ্গন বলল—কে বলল শিখিনি ।

—ও, আচ্ছা ! দারুণ তো ! কথা পড়তে দাও না । তোমাকে কিন্তু ভাই ভৃত্য বলে মনে হয় না । বলেই একটা লাফ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সটান দোতলায় উঠে যায় । এইভাবেই লাফ দিয়ে সে কেকাকে অধিকার করতে চায়, সে মনে করে না, কাজটা অসম্ভব ।

বাড়িতে বাবা মা নেই, বাবা মার সামনেই অবশ্য অনন্য কেকাকে স্পর্শ করে এবং আশ্চর্য সব কথা বলে ।

যথা : তুমি কথা বল কেকা ! আমি তোমার কথা শুনব বলেই তো এসেছি ! কথা না হলে আমার চলবে না । আমি তোমার মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে চাই ।

বাবা শুনতে শুনতে বলেন—তুমিই ওকে কথা বলাতে পার অনন্য । ওই ক্ষমতা সামন্তরও নেই ।

—আজ্ঞে আমি আসব, আপনি চিন্তা করবেন না । বলে অনন্য কেকার ঘন চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে দেয় বাপ মায়ের সামনেই । ওর হাওয়াই শার্টের বুক খোলা, রোমশ, একটি রুপার লকেট ঝোলে বুকের মাঝখানে, খুব আধুনিক ছেলে ।

আজ সে এসেছে । কলেজ ছুটি । বাবার স্কুল খোলা, মা ব্যাঙ্কের চাকুরিতে গেছেন । নীচে লক্ষ্মীর মা আর রতন ।

আমি ওদের দেখব বলে উপরে নিঃশব্দে উঠে আসি । খাটে চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে কেকা ।

দেখি, কেকার শরীরের পাশে বসে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে অনন্য । চুলে আঙুল ডুবিয়ে চুলের অন্ধকারে নাসিকা ডুবিয়ে দিয়ে কেকার শরীরের ঘ্রাণ নিচ্ছে । কেকা কিছুই বলছে না ।

কথা যে বলে না, তার সঙ্গে কি প্রেম হয় না । এই অপূর্ব দৃশ্য তো ভারি চমৎকার । সিনেমায় দেখা যায় । কেকা কথা বলতে পারে না, কথা না বলা মেয়েটি কি কথার অভাবেই অনন্যকে বেশি প্রশ্রয় দেয় ?

দেখি, চোখ খুলে গেছে কেকার । তার চোখে কিছু বিস্ময় এবং ভয়ও । কেকার চোখে দুর্বোধ্য ছায়া । অনন্যকে হাত দিয়ে সামান্য ঠেলে উঠে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে ।

—কে ? ও, রঙ্গন ! বলে ওঠে অনন্য । তারপর বলে—এসো ।

—আপনারা রয়েছেন, আমি যাই । চাকরবাকরের সবই দেখতে নেই

স্যর। আমার এই কথায় চোখের উপর থেকে জোড়া হাত সরিয়ে ফেলে কেকা। তারপর মেঝেয় নামতে গিয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে ফেলে অনন্য।

বলে— একটু হাঁটাচলা করবে?

এবার কেকা তার সমস্ত দেহ মেঝের উপর ছেড়ে দিয়ে অনন্যর হাত থেকে খসে পড়ে অত্যন্ত কাতর গলায় ডুকরে উঠল। এমনই সেই অশ্রু-ব্যথিত টুকরো কান্না যে, অনন্য একটু কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

—তুমি ওকে ধরো রঙ্গন।

—না, স্যর! আমার হুকুম নাই। এই কথায় আরও ডুকরে ওঠে কেকা।

—তুমি তো ময়ূরীকে ধরতে, কেকাকে পার না? হাঁটাতে? আমার বউটা খোঁড়া হবে নাকি! তা হয় না। ওঠো কেকা, উঠে দাঁড়াও। ওঠো! বলে শাসন করে ওঠে অনন্য। কেকা কান্না থামিয়ে কঠিন চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

রঙ্গন বলে—ময়ূরীর গায়ের গন্ধ ছিল শিশুর মতো স্যর। ও খুব পবিত্র ছিল।

একথা বলে আমি নীচে নেমে চলে আসি। আমার অনন্যকে অদ্ভুতও ঠেকে। ও কেকাকে তুলতে বলল, হাঁটাতে বলল। এ উদার মন আমাকে অবাক করে দেয়।

কিন্তু ভুল ছিল ভাবনায়। আর একদিন এমনই নির্জন ঘরে ও আসে। কিন্তু তার আগে আমি কেকাকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখি, ও খাট থেকে নেমে পড়ে গিয়েছে। কেমন মায়ায় বুকটা ভরে ওঠে। ছুটে গিয়ে ওকে তুলে খাড়া করি, ওর হাত পা কাঁপছে, বহু কষ্টে সে দাঁড়াতে এবং হাঁটতে পারে। কেকা আমার কাঁধের উপর হাত ফেলে জড়িয়ে দেহের ভার ফেলে ঘরের বাইরে আসতে চায়। ছাদের দিকে।

ঠিক এই দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে অনন্য। তারপর চোখ সরু করে আমাকে দেখে, ওই দৃষ্টি দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই।

—নাও, ছাড়ো। তোমাকে আর হাঁটা শেখাতে হবে না, ওটা আমার কাজ। চাকর চাকরের মতো থাকবে। কেকা কিন্তু ময়ূরী নয় রঙ্গন। বলে অনন্য আমার কাঁধ থেকে কেকাকে টেনে নেয়। বলে —কেকা হাঁটবে, কথা বলবে। ওর সঙ্গে চোখে চোখে আমার কথা হয়ে গেছে। যাও, তুমি আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

রঙ্গন মাথা নীচু করে নীচে নেমে চলে আসে। এক গভীর প্রত্যূষে আশ্চর্য ছবি দেখা যায়। ঘুম থেকে চোখ মেলে চেয়ারটায় চোখ পড়তেই রঙ্গন চমকে ওঠে। চেয়ারে ও কে বসে রয়েছে! বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে রঙ্গনের। রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ধসমস করে মেঝের বিছানায় উঠে বসে রঙ্গন। কত কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছে বেচারি।

—মামণি! বলে উচ্চ দীর্ণ আর্তনাদ করে ওঠে রঙ্গন।

দেবপ্রিয়া উপর থেকে ছুটে নামেন নীচে। মেয়েকে দেখে পাগলের মতন ব'লে ওঠেন—তুমি আবার ফিরে এলে মা! এ তুই কী করলি কেকা! রঙ্গন! কেকা যে কথা বলছে না! ওকে বল, ওকে বল্। ওকে বল বাবা।

রঙ্গন ডেকে ওঠে—ময়ূরী। তারপরই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে গিয়ে দেখে বুকটা আঁকড়ে ধরেছে মূক একটা ব্যথা। ভীষণ চাপে রঙ্গন ছটফট করে ওঠে। ও কেন কেকাকে ময়ূরী বলে ডাকল।

॥ আট ॥

কেকা বসে রয়েছে ময়ূরীর চেয়ারে। মুখে ওর ভাষা নেই, চোখের চাউনি বিহ্বল। 'আবার তুমি ফিরে এলে মা!' এই একটি ভয়ার্ত বেদনাচ্ছিন্ন আকুল আর্তনাদ শুনে আমার অন্তর মোচড়াতে থাকে, মামণির নিরাশ্রয় কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে অন্ধ পাখির মতো ডানা ঝাপটে ফেরে। মামণির মুখের দিকে আমি চাইতে পারি না।

মনে হচ্ছিল, কেকা যে ময়ূরী হয়ে গেছে, এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য আমিও কি অপরাধী! আমিই কি তাকে ময়ূরী বানালাম! আমি কি কানে কানে কেকাকে বলেছি, 'কেকা! তুমি ময়ূরী হও!'

মামণি হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু ভগবান জানেন, আমি এ বাড়ির এত বড় ক্ষতি, এমন ভয়ঙ্কর সর্বনাশ কখনও চাইনি। ময়ূরীকে আমি ভুলতে পারি না, তাই বলে কেকা ময়ূরী হয়ে ওই চেয়ারটায় বসবে এমন আত্মসুখ কল্পনা করিনি কখনও।

'ময়ূরী আমার জন্য তার চেয়ারখানি খালি রেখে গেছে।' একথার এই মানে, তা কে জানত।

—কথা বলছে না কেন, ওরে কথা বলছে না কেন! বলে মামণি কেমন যে করে ওঠেন, কী শূন্য, কী নিঃস্ব, কী অসহায় তাঁর আর্তস্বর বিদীর্ণ করে যায়।

আমি সরে যাই কেকার কাছে। আর কী আশ্চর্য আমার মন। মনে হয়, এ সত্যিই ময়ূরী।

ওকে ডাকি—ময়ূরী।

মামণি এবার চমকে উঠলেন। আঁতকে উঠে প্রায় নিরুদ্ধস্বরে বললেন, কী বললি। ওকে তুই ময়ূরী বলে ডাকলি।

—তুমিই তো বললে মামণি।

—কী বললাম। বল্, কী বললাম আমি।

—ওই যে বললে, আবার তুমি ফিরে এলে মা। তাইতেই আমার ভুল হয়ে গেল মামণি!

—তুই তো তাই-ই চেয়েছিস। তুই কখনও আমাদের ভাল চাসনি। সব খেয়েছিস, সংসার, মা-বাবা, ভাইবোন, তাবৎ গাঁ, কিচ্ছু রাখিসনি। আমার সুন্দর মেয়েকে তুই নষ্ট করে দিলি। এতখানি শত্রুতা করলি রঞ্জন।

তাই তো। আমি তো সবই খেয়েছি। কিচ্ছু রাখিনি। ঠিকই বলছেন মামণি। আমারই কারণে কেকা ময়ূরী হয়ে গেল।

কেকা সহসা আমার বুকের জামা খামচে ধরে, যেভাবে ময়ূরী ধরত। আমি বলি—ছেড়ে দাও আমাকে। আমি চলে যাব, আমি আর থাকব না।

—চলে যা হতভাগা, চলে যা। আছিস কেন! পাগলের মতো করেন দেবপ্রিয়া।

হঠাৎ বলি—না, যাব না। কেন যাব।

—যাবি না! ঠাণ্ডা গলায় এবার প্রশ্ন করেন দেবপ্রিয়া। আঁচলের প্রান্তে চোখ মুছে ফেলেন। এবং বলেন—যাবি না তা হলে?

—না।

—ছেড়ে দাও কেকা, ওর জামা ছেড়ে দাও। ওকে ধরে আছো কেন। অতি স্নেহে মামণির গলা আর্দ্র শোনায়।

কেকা আমার জামা আরও আঁকড়ে ধরে। সহসা বলে উঠি—আমি তো চলে গেছিলাম মামণি! তাতে তোমার ভাল হয়েছে।

এই কথায় দেবপ্রিয়ার সমস্ত মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় মুহূর্তে। তিনি থ হয়ে বসে থাকেন মেঝেয়, ময়ূরীর দোরের কাছে। তারপর দ্রুত ছুটে এসে কেকার হাতের মুঠি ছাড়িয়ে দেবার জন্য পাগলেরই মতন কসরত করতে থাকেন। ভাবি, সন্তানের জন্য মানুষ কেমন করেন। সমস্ত দিশা হারিয়ে ফেলেছেন দেবপ্রিয়া।

—ছাড়ো। ছেড়ে দাও। লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি এমন কেন করবে। তুমি সব সময় বলেছ, তুমি কেকা। ময়ূরীর সঙ্গে তুলনা করলে তুমি রেগে যেতে, মনে নেই? তোমার বুদ্ধি ভাল। তুমি অনেক সুন্দর। কখনও তোমার চেহারা খারাপ হবে না। যত দিন যাবে, তুমি তত সুন্দরী হবে। অনন্যর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। চাকরকে ছেড়ে দাও কেকা। ও চলে যাক।

বলতে বলতে দেবপ্রিয়া কঠিন হাতে কেকার হাত ছাড়িয়ে দিতে চান। কেকা ছাড়ে না। এক সময় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—আমাদের আর কে আছে মা। তুই ছাড়া। তুই কেন অমন করবি। বাপের কথাটাও ভাববি না। খুনি লোকটার কথা ভাববি না। লোকে এখন বলবে, সত্যি সত্যি খুন না করলে এমন কেন হবে। রাঙাবউ বলবে না একথা? পোড়ারমুখি। বলতে বলতে কেকার গালে ছোট্ট করে চড় বসিয়ে দিলেন দেবপ্রিয়া। তারপর চড় মারা হাতখানি দাঁতে কামড়ে ধরে নিজেই কেমন ডুকরে উঠলেন।

আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম—তুমি মামণি বিয়ের দিনও ময়ূরীকে মেরেছিলে, তোমার মনে আছে। ডাক্তারবাবু এলে বলছি সমস্ত কথা।

—কী বলছিস রঙ্গন। আমার মেয়েকে আমি মারব না। ও কেন তোকে ছাড়ছে না। কথা বলছে না, এ ওর বদমাইশি। এবার আমি ডাক্তার নয়, ওঝা ডেকে আনব। ছাড়, ছেড়ে দে। বলে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠেন দেবপ্রিয়া।

বুঝতে পারছিলাম শত সর্বনাশের মধ্যেও মামণি মনে রেখেছেন, আমি একটা চাকরমাত্র। এবং কেকা যে কিছুতেই ময়ূরী নয়, অনন্য ওর পাণিপ্রার্থী। সবই সহ্য করতে হবে আমাকে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি চলে গেলে, কেকাও হয়ত মরে যাবে। ভয়ঙ্কর এক শৈত্যপ্রবাহে কেকার মৃত্যু হবে। কিন্তু একথা চাকর হয়ে কোন্ সাহসে বলি সবার সামনে।

বলি—ছেড়ে দাও কেকা। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

দেখি, সত্যিই ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত হয়েছেন। অর্জুনবাবু নেমে এলেন নীচে। রাঙাবউ এসে জুটে পড়েছে। লক্ষ্মীর মা চোখ বিস্ফারিত করে আঁচলধরা রতনকে নিয়ে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডাক্তারবাবুকে দেখে জামা ছেড়ে দিল কেকা। ওর চোখের জল লেগে আছে গালে। ডাক্তার সামন্ত কেকার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ স্থির চোখে দেখলেন বেচারিকে। তারপর ঝুঁকে পড়লেন মুখের কাছে।

—তুমি কে মা। তুমি ময়ূরী। বাঃ। তুমি তো সত্যিই ময়ূরী। ভুল করে এরা সবাই তোমাকে কেকা বলে ডাকছে। ওদের কথায় তুমি কিছু মনে করো না। কেকা তো শান্তিনিকেতনে রয়েছে, তাই না। চলো হে, ওপরে চলো। ওকে একা থাকতে দাও। রঙ্গন কোথা। দেখো, ময়ূরীকে কথা বলাতে পার কিনা। একটা একটা করে সবকিছু শেখাতে হবে তোমাকে।

বলতে বলতে ডাক্তার সামন্ত আমার একটা হাত চেপে ধরলেন। তারপর সকলকে চোখের ইশারা করে দোতলায় দ্রুত উঠে যান। আমাকে সঙ্গে করে টেনে আনেন উপরে।

—শোন! তোমাকেই বলি রঙ্গন। কেকা যে ময়ূরী নয় একথা সত্য। কিন্তু আজ সে ময়ূরী। কেকা বলে কেউ এখানে নেই। যতই অদ্ভুত শোনাক, তুমি মনে রাখবে ময়ূরীর মৃত্যু হয়নি।

—একথা মিথ্যা। বানানো। গল্পটা এভাবে তৈরি করতে চাইছ কেন সামন্ত! বলে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন বাবা।

ডাক্তারবাবু একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলেন—কেকা নেই একথা যদি প্রমাণিত না হয় তা হলে কেকা কখনও কথা বলতে চাইবে না। ঝাড়ফুঁক করে এ ব্যাধি সারবে না দেবপ্রিয়া। তোমার কথা আমি শুনেছি। স্পষ্ট শুনে রাখো, কেকার কথা বলার সত্যিই সাধ্য নেই। কোনও মানুষ কখনও বদমাইশি করে এভাবে নিজেকে শেষ করে দেয় না! ভয় পেও না, ওকে কথা বলাতে হলে রঙ্গনের সাহায্য লাগবে।

একটু থেমে সামন্ত ফের বললেন—কেকা নিজেকে ময়ূরী ভাবছে, তাই-ই ভাবতে দাও, বাধা দিও না।

—বাধা দেব না। কী বলছ আমাকে। তুমি কি মানুষের মতো কথা বলছ সামন্ত! আমাদের অবস্থা তুমি এ কী করলে! বলতে বলতে দেবপ্রিয়া কঁকিয়ে উঠলেন—হা ঈশ্বর। হায় ঠাকুর!

—শোন! শীতের রাতে ওই জানলাটা কে খুলে রেখেছিল! আমার সন্দেহ, এ কাজ কেকা করেছিল! বলে ওঠেন ডাক্তার।

—না। ঠিক নয় ডাক্তারবাবু। বলে ফেলি আমি।

—তুমি কী করে জানলে।

—ডায়েরিতে সব লিখেছে কেকা।

—কেকা নয়, ময়ূরী। ময়ূরী বল।

—না, কেকাই লিখেছে, জানলাটা খোলা ছিল, তা জেনেও সে বন্ধ করে

দেয়নি। একমাত্র সে-ই জানত যে, জানলাটা পারুল বন্ধ করেনি। রাত এবং ঠাণ্ডা দুই-ই বেড়েছে, ও লেপ ছেড়ে নীচে নামেনি। উষ্ণতার লোভ ওকে নামতে দেয়নি।

—ডায়েরি কোথায় ?

—আছে।

—নিয়ে এসো আর তুমি আমার সঙ্গে চল। বলে পরিমল সামন্ত উঠে দাঁড়ালেন।

—বিয়ে কি হবে না তা হলে সামন্ত। অনন্যার বাপ-মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত কথা হয়েছে। বললেন বাবা। অত্যন্ত বিমর্ষ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।

কেন যেন তাঁকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—কেকা বাড়িতে নেই, এখান থেকে গল্পটা আজ শুরু হচ্ছে অর্জুন। এবং মনে রাখবে ময়ূরীর সঙ্গে এখনও রঙ্গনের বিয়ে হয়নি।

—বিয়ে হয়নি! কার বিয়ে হয়নি! অবাক হয়ে বলে ওঠেন বাবা। তিনি যেন ঠিক বুঝতেও পারছেন না আর। হতাশায় তাঁর সমস্ত মুখ থমথম করছে।

ডাক্তার বললেন—দাও। ডায়েরিটা পড়ে দেখি।

আমি ডায়েরিটা ডাক্তারবাবুর হাতে তুলে দিলাম। তিনি পাতা উল্টে অনেকক্ষণ যাবৎ পড়ে গেলেন একমনে। তারপর আচ্ছন্নের মতো চোখ তুললেন। বললেন—গল্পটা ঠিকই। গল্পের নিয়ম যাই হোক। ডাক্তারির নিয়মে কোনও ভুল করিনি আমরা। তুমি ঠিক বুঝবে না দেবপ্রিয়, কিন্তু কেকা যে কাহিনীটা তৈরি করে নিয়েছে নিজের জন্যে, আমরা ডাক্তাররা সেটাকে অনুসরণ করতে বাধ্য। ও ময়ূরী এবং নিঃসন্দেহে ময়ূরী। ওর এখনও বিয়ে হয়নি। একটু মন দিয়ে শুনবে সকলে, বিচলিত হবে না। ওর বিয়ে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থা। তুমি করে দাও সামন্ত। আমাকে বাঁচাও ডাক্তার! আমি তোমার বন্ধু! এতকাল তুমি আমাকে রক্ষা করেছ! আমার মান-সম্মান, প্রেস্টিজ! আমি খুনি নই পরিমল!

—জানি। খুনি তা হলে কেকা।

—নাহ্, না! ভয়ে প্রায় শিউরে উঠলেন অর্জুন। বললেন—ও কথা বলো না! ও সামান্য, এতটুকু! ওর দোষ নেই। ওকে ছেড়ে দাও। আমার সুন্দর মেয়েকে তুমি নষ্ট করে দিও না। তুমি লেখকদের মতো নিষ্ঠুর হবে না। তুমি

ডাক্তার। তোমার অনেক দয়া। গল্পটা তুমি সহজ করে দাও।

—লেখকরা নিষ্ঠুর কে বলেছে তোমাকে। তুমি ভোটে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরতা করনি? ডাক্তারের হাতে রুগী মরে না? গল্পটা তো আমি গড়িনি অর্জুন। ওই জানলাটা তো আমি খুলে রাখিনি।

—পারুল করেছে।

—ওর মনে ছিল না।

—ওকে ব্যবহার করেছে পার্টি।

—সবই ঠিক।

—তুমিই ডাক্তার ময়ূরীর সঙ্গে রঙ্গনের বিয়ে দিয়েছিলে। তুমি না বললে, আমার সাহস হত না।

—আবার দেব। ডাক্তারিশাস্ত্র আমাকে যতখানি নিষ্ঠুর হতে বলে, আমি তাই হব।

—তাই দাও, অনন্যর সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দাও। কেকাকে বাঁচাও, ও তোমার মেয়ের মতো। তুমি ওর ডাক্তারকাকা। অনন্যকে বোঝাও, কেকা কথা বলবে। ও অভিমান করেছে।

—হ্যাঁ। বলব। রঙ্গনের সঙ্গে ময়ূরীর বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর কেকার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। এই শর্তে যদি অনন্য রাজি থাকে, শুধু তাহলে অনন্যকে বলা যায় যে, কেকা আর তার বিয়ে সম্ভব।

—ও! বলে অর্জুন বিস্ময়-বিদ্ধ মূক হয়ে গেলেন। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সোফায় বসে পড়লেন।

আমার ঘৃণা হল। আমার মধ্যে মার্ক্সবাদের জন্ম হল। আমার মধ্যে হিউম্যানিস্ট রজার বেকনের জন্ম হল। লিঙ্কনের জন্ম হল। মহাত্মা গান্ধীর মমতা ছলছল করতে থাকল। হরিজনের চৈতন্য হল। আম্বেদকরের অনুভূতি হল। আমি সি. পি. এম. হয়ে গেলাম। নকশাল হয়ে গেলাম। অথচ আমি কারও সঙ্গে অসহযোগ করতে পারলাম না। কেননা পদ্মা আমার সর্বস্ব মুছে নিয়ে চলে গেছে। কেকা আমার সম্মুখে ময়ূরীর মতন এক নির্বাক মহাপ্রকৃতি হয়ে সেজে উঠেছে। পদ্মারই মতো বিপুল তার আকর্ষণ। ওর দু চোখে পদ্মার দুকূলপ্লাবী কীর্তিনাশা স্রোত। ও আমাকে গিলে নেবে ভালবাসার ক্ষুধায়।

চেয়ারে বসে এক ভোরে কেকা আমার হাত দুটি ধরে তার কোমল, স্ফীত, বলিষ্ঠ বুকে চেপে ধরল। ময়ূরী এভাবে করেছিল। দেখলাম, কোনও পার্থক্য নেই, কোনওই আলাদা নয় এরা। ওর চোখে সেই অসহায়তা, সেই করুণাঘন

কামনা, সেই দীপ্র অগ্নি, সেই বাসনার শিখা, শরীরে তার ঝড় বয়ে গেল।

কিন্তু অনন্য কেন রাজি হবে। ডাক্তার অনন্যর সামনে আমাকে বললেন—কেকা কথা বলত, ময়ূরী বলত না। তোমার সঙ্গে ময়ূরীর বিয়ে দিচ্ছি আমরা। তাই তো অনন্য! তাই হবে তো? বিয়েটা রঙ্গনের সঙ্গে হোক।

অনন্য বলল—এ বড়ই কঠিন শর্ত ডাক্তারবাবু। আমার বাপ-মা শুনলে ভাববে কি বলুন তো। আর যাই হোক, একটা বোবা মেয়েকে ঘরের বউ করতে রাজি হবে কেন।

—সেইজন্যই তো রঙ্গনের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি। কেকা ভাবছে, ও ময়ূরী। এই একটা আচ্ছন্ন অবস্থা অনন্য। তুমি যদি কেকার মুখে কথা চাও, তা হলে....

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু। কথা যে বলবে তার গ্যারাণ্টি কি আছে।

—আমরা চেষ্টা করতে পারি নাকি।

—আপনার মতলব আমি বুঝতে পারছি না।

—দ্যাখো, বিয়ের পর ময়ূরীর মৃত্যু হয় অনন্য।

—জানি।

—জানলা খোলা ছিল। শীতের রাত।

—আজ্ঞে।

—এই দৃশ্যটা থেকে কেকা ওর মন সরাতে পারছে না। আমার ধারণা, ওই রকম একটা অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে কেকাকে ফেলে দিলে কী ঘটে না ঘটে, আমরা পরীক্ষা করব।

—আপনি করুন। আমাকে আর জড়াবেন না।

—কেকা যদি কখনও কথা বলে....

—বিয়েটা তো রঙ্গনের সঙ্গে দেবেন।

—হ্যাঁ, দেব।

—তা হলে।

—তা হলে কি। বিয়ে মানে একটা সাজানো আয়োজন। তুমি দেখছি ঘাবড়ে গিয়েছ। আরে ভাই, ওটা সাজানো ব্যাপার, সত্যিই তো নয় হে। দাঁড়াও, দাঁড়াও,. তুমি তো দেখছি অদ্ভুত।

—ঠিক আছে। খুব অসহায় শোনায় অনন্যর গলা। শুনতে শুনতে আমার শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তারপরের ঘটনা আমি ভাবতে পারিনি। অনন্য কী সাংঘাতিক জীব!

একদিন আমাকে বলল—কেকাকে তো তুমি টাচ করেছ। কেমন করে করেছ ?

—তার মানে।

—মানে বোঝো না। খুব কঠিন করে বলে উঠল অনন্য। ওর চোখে ক্রোধ। চাপা একটা বিদ্বেষও।

কী যে হল আমার, বললাম—টাচ ওকে করিনি দাদা। যা করেছি, ময়ূরীকেই করেছি!

—ও রে বাস্, তোমার তো ডায়ালগ আছে দেখছি। খুব ভণিতে।

—আপনি কলেজে পড়ান, আপনার এমন ভাষা ভাবতে পারি না।

—তা কেন পারবে, তোমার কি ন্যাকামির শেষ আছে। কেকা আমার বাগদত্তা জানো না।

—ওসব পুরনো নিয়ম খুব বুঝি স্যার।

—তবে কেকা কথা বলছে না কেন, বল্। তুই মানা করেছিস। বলে আমার একটা হাত এমন করে চেপে ধরল অনন্য এবং সেই দৃশ্য কেকাও চেয়ে দেখল যে, আমি ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। আমিই কেকাকে অতি কষ্টে দোতলায় তুলে এনেছি। খাটে শুয়ে এই দৃশ্য দেখে উঠে বসল ধীরে ধীরে। অনন্য তখন আমার হাতটা ছেড়ে দিল। খুব লজ্জায় আমি ছাদে সরে আসি। অপমানে আমার চোখে জল এসে পড়ে। আমি কী করব এখন। এই কদর্য আঘাতও আমার ভাগ্যে ছিল।

একদিন ডাক্তার সামন্ত তাঁর চেম্বারে ডেকে আমাকে বললেন—কেকা যে নিজেকে ময়ূরী ভাবছে, একথা তুমি কতখানি বুঝেছ। ব্যাপারটা ষোলআনা অন্তত তোমাকে বুঝতে হবে।

—এইভাবে আপনি ময়ূরীর কথাও বুঝিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু।

—হ্যাঁ। কিন্তু আজ আমার উপায় নেই রঞ্জন। ও ময়ূরী এবং ময়ূরী এবং ময়ূরী। ও আর কেউ নয়।

ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে আমি সম্মোহিত হয়ে পড়ি। কী মোহ সেই কথার অন্তরে।

বলি—আমার চেয়ে কেউ জানে না সেকথা! কেউ জানে না!

ডাক্তার বললেন—ও নিজেকে ভাবে, ওই দৃশ্যটার মধ্যে ; জানলা খোলা, শীতের কঠিন হাওয়া ঢুকছে ঘরে। রাত অনেক। ওর ডায়েরি পড়লে একথা বোঝা যায়। লেপের তলে শুয়ে রইল কেকা। ভাবল নেমে গিয়ে পাল্লা বন্ধ

করে দেবে। ও লিখেছে, ভাবিলাম, কিন্তু করিলাম না। কেন ? এই অপরাধ ওকে ময়ূরী করেছে রঙ্গন। ওকে তুমি বাঁচাও। কথা বলতে দাও।

আমিই কি তা হলে কেকার মুখের কথা আটকে রেখেছি ! স্বপ্নবৎ এ জীবন, সবই স্বপ্ন-ধূসরতা, সব ছায়াবাজি। মিথ্যা জীবন। আমাকে খেয়েছে পদ্মা, আমাকে খেয়েছে ভালবাসা। অনন্যকে দেখলেই আমার মধ্যে ভয় জাগে, হিংসেও বুঝি হয়। ওর চোখেমুখে ধূর্ত ছায়া দেখি, চাপা লোভ দেখি। সপ্তাহে তিনদিন ওর তিন-চারটে ক্লাস, বাকি দিনগুলিতে ওর নিরর্থক অবকাশ। বাবা মা বাড়ি থাকেন না, দুপুরে থাকে গভীর নির্জনতা—তখন সিধে সে কেকার সন্নিধে চলে আসে। বোবা মেয়েটির সঙ্গে গায়ে হাত রেখে কথা বলে। ওই দৃশ্য চোখে পড়ে, কিন্তু অনন্য কিছুই মনে করে না।

অনন্য আমাকে একদম সহ্য করতে পারে না, বুঝি। ডাক্তারবাবু আমাকে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছেন। চমৎকার এ ধরিত্রী, এখানে মানুষের কাহিনী কী বিচিত্র ! আমি শেষে অমন একজন সমর্থ যুবকের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেলাম। একদা ময়ূরীর সঙ্গে আমার বিবাহ ছিল অতিশয় অদ্ভুত। ফের আর এক নিষ্ঠুর প্রহসনের জন্য জীবন আমার প্রস্তুত হচ্ছে। বলতেও পারছি না, কেন আমাকে ওভাবে সাজাবেন ডাক্তারবাবু। আমাকে কেন অমনটি করবেন আপনারা।

—গ্রামোফোন রেকর্ডে পিন আটকে গেলে যেমন হয়।

—আজ্ঞে।

—বুঝতে পারছ না রঙ্গন। কেকা ঠিক সেভাবে আটকে গিয়েছে। পিনটা একই প্যাঁচের মধ্যে ঘুরছে, ঘষটাচ্ছে, সরতে পারছে না। ওর মস্তিষ্কে অলটাইম একটা ঠাণ্ডা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওর কষ্ট ও ছাড়া কেউ জানে না।

ডাক্তারবাবু আমাকে এভাবে বলেছেন। তারপর মনটাই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছে আমার।

—তোমাকেই সব করতে হবে রঙ্গন।

—কীভাবে পারব ডাক্তারবাবু।

—তুমি ময়ূরীকে ভালবেসেছিলে, সেই জন্যেই তোমাকে পারতে হবে।

এই কথায় আমার অন্তর কেমন আলোড়িত হয়ে ওঠে। কেকার মুখের দিকে চাইতে পারি না। মামণির তীব্র বেদনা প্রতিদণ্ডে আমাকে স্পর্শ করে যায়।

আমি এবং ডাক্তারবাবু শীতকালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ঘটনাকে ঘটিয়ে তুলতে হবে। সেই সময় আমাদের বিয়ে হবে।

—তোমাতে আমাতে বিয়ে তো হয়েছে কেকা ! অবশ্য সেটা মুখের কথা। তোমার চেয়ে সুন্দর অভিনেত্রী আমি কখনও দেখিনি। এবার কিন্তু আমারও অভিনয়ের পালা। বিয়ে করব, কিন্তু তোমার বর হব না। কেমন জব্দ করব তোমাকে। বলতে বলতে কেকার চোখে চেয়ে দেখি। ওর কপাল ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ও চেষ্টা করছে আমার কথাগুলি বোঝার, কিন্তু পারছে না। বড় বড় চোখ দুটিতে চিন্তার ছায়া কালো হয়ে উঠেছে।

কেকা বসে রয়েছে খাটের উপর। পা দুখানি ঝুলে আছে নীচে। দুপুর এখন। কেউ নেই কোথাও। নীচে লক্ষ্মীর মা রতনকে আঁচলে নিয়ে ফুলস্পীডে পাখা চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেকার পায়ের কাছে বসে পড়ি আমি। সুন্দর একটি ছোট্ট রুপার বাটিতে আলতা ঢেলে নিই। পায়ে পরিয়ে দিতে থাকি। আলতা তো মাখানো হয়, কিন্তু কথাটি কেন 'আলতা পরানো'—বুঝি না। ধীরে ধীরে কেকার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ওমা। মেয়েটা হাসে গো। ময়ূরী অমন করেই হাসত। চোখ বড় বড় করে আলতা পরানো দেখছে কেকা।

—দেখো ময়ূরী, কথা তোমাকে বলতেই হবে। আমার মুখের দিকে তাকাও, কত ভালবাসি তুমি কি বোঝ না ! তোমার জন্যে আবার আমি ফিরে এসেছি। এবার তোমার আঙুল রাঙিয়ে দেব। কপালে লাল টিপ পরিয়ে দেব। নজরুলের সেই গানটা তোমার মনে নেই ? রামধনু হতে লাল রঙ ছানি, আলতা পরাবো পায়। দেবো খোঁপায় তারার ফুল। মনে নেই। সব মনে আছে তোমার। আমি বিনোদখোঁপাও বাঁধতে পারি ময়ূরী।

স্বর্ণকলিকার মতো আঙুলগুলি। তর্জনীটা ধরি, কেকার শরীর একটুখানি শিহরিত হয়।

—দেখো, এত সুন্দর তুমি। এতে যদি মানুষের লোভ না হয় তো কিসে হবে বল। তোমাকে আমি সাজিয়ে দিচ্ছি, অনন্য আসবে। রূপ দিয়ে ওকে বেঁধেছ তুমি। কথা বলতে পার না, কিন্তু অনন্য তবু ছাড়তে পারছে না। তোমাকে কি ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে ? পারবে না। 'সই, ভাল করে বিনোদবেণী বাঁধিয়া দে', গানটা তো তোমার মনেই আছে। তাই না ?

হঠাৎ দেখি কেকার চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরে পড়ল কোলের উপর।

বললাম—এই চোখের জল, একে কী বলে জানো ? দৃষ্টিবকুল। অশ্রুর ফোঁটা বকুলের ফুল। এবার একটু হেসে ওঠো। ব্যস। এই তো। এবারে কী

হল, বল তো। অশ্রু আর হাসি মিলে ফুলগুলি আরও পবিত্র হয়ে গেল। স্নিগ্ধ হয়ে গেল। এর পর শুধু কথা ; তা হলেই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর অনন্যর হাতে তোমাকে আমি তুলে দিতে পারব। আমার ময়ূরী কথা বলে উঠবে। কেউ তো জানে না, আমার কত কাজ।

সহসা কেকা আমার মাথার চুলে আঙুল ডুবিয়ে খামচে ধরে ওর কোলের দিকে টানে।

—অমন করে না ময়ূরী ! অনন্য রাগ করবে। ছেড়ে দাও আমাকে। বলি বটে, কিন্তু কেকা ময়ূরীর মতোই আমাকে ছাড়তে চায় না। ঠিক এই অবস্থায় অনন্য আমাদের দেখে ফেলে। অবশ হৃদয় আর পারে না তখন। কেকার কোলে আমি মুখ গুঁজে দিয়েছি।

অনন্যকে দেখে আমার প্রাণটাই যেন কোথায় উবে যায় মুহূর্তে। ও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার মাথার চুল ধরে টেনে তোলে।

—তুমি টাচ কর না, তাই না ?

—করি, ময়ূরীকে।

—এ তবে কে ?

—ময়ূরী।

—ও। তাই নাকি ! শালার এই কাবলিটাকে এখন আমি কী করব।

—দেখুন স্যার !

—চোপ্ ! তোমার চরিত্র আমার বোঝা শেষ হয়ে গেছে। তুমি যে আচরণ ময়ূরীর সঙ্গে করেছ, কেকার সঙ্গে তা সাজে না। তোমার এঁটো জিনিস আমি কী করে নেব ? সামন্ত কি বোঝেন না এইসব ?

—আপনিই বোঝেন না। নিশ্চয় বোঝেন না। এ সবই অভিনয়, এ মিথ্যা। ধাপ্পা। আমি কেকাকে কত ঘৃণা করি আপনার জানা নেই।

—ধেত্তিরি। ওসব আমি শুনব না। তুমি কখনও আর ওকে স্পর্শ করবে না। নির্লজ্জ কোথাকার ! বেহায়া। ইউ জাস্ট লাইক এ পেট-ডগ। পোষা কুত্তা।

আর পারি না মাগো। হরিমতীর ছেলে আমি, আর সইতে পারি না। আমার চোখে অসহায় কুকুরের দৃষ্টি। লজ্জায়, অপমানে প্রাণ যেন বধির হয়ে গেছে। অনন্য আধুনিক সমাজের কলেজ-শিক্ষক, ওর গলায় একটা রুপোর চিকন চেন ঝুলছে, ও পার্টটাইম লেকচারার। কেকাকে বিয়ে করলে ওর চাকরি পাকা হয়ে যাবে, এমন একটা টোপ ওর চোখের উপর ঝুলিয়ে রেখেছেন

অর্জুন।

আমি সভয়ে নীচে নেমে চলে আসি। ভয় করছিল, অনন্য আমাকে মারতে পারে। যৌন-মানুষ ভারি হিংস্র হয়। পশুটশু মানুষের কাছে লাগে না। একটা রুশভাষার বাংলা অনূদিত নভেলে একটা দৃশ্য ছিল অথবা ওটা ফরাসি নভেলা, তাতে ছিল অনেক উদার দয়ালু এক অধ্যাপক, ছাত্রীর প্রেমে পড়ে, একতরফা ভালবাসা, ছাত্রীটি অধ্যাপকেরই এক ছাত্রকে প্রণয় করত, তো যৌন-হিংসায় ওই দয়ার্দ্র প্রফেসর ছাত্রটিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন, তারপর প্রফেসরের একটা উন্মাদ রোগ হয়। মনে পড়ছে না, ওটা প্রফেসর নয়, কোনও ডিউকের গল্প হয়ত। অনেক মানুষকে সর্বত্র সুন্দর এবং মহৎ দেখি, কাম যার অন্তরে অসূয়া ঢালে, সে সেখানে তার আসল চেহারা প্রকাশ করে, তখন সব মহত্ত্ব তার ঘুচে যায়। খুব ভাল, খুব ভাল, কামে মানুষ দাঁতালো।

ভয় করছিল, শরৎচন্দ্রের 'বড় প্রেম কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে', শ্রীকান্তের সেই জীবনোপলব্ধি সে এক কালের রোমান্টিকতা, ভবঘুরের দৃষ্টিমাত্র, মনাকে শরৎবাবু চিনতেন না। রাস্তার পাগলিটাকে শরৎবাবু দেখেও দেখেননি। ভয়ে পালিয়ে আসি আমি।

তারপর দোতলায় গভীর নির্জনে কেকার উপর বলাৎকার করে অনন্য। ওর ধারণা হয়েছিল, কেকাকে এঁটো করে রাখলে আমি আর তাকে স্পর্শ করব না। বা ওই ঘটনা অন্য কিছু, আমার জানা নেই। দরজা আমারই মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছিল অনন্য। কেকার কঁকানো ভেজা গলা কানে আসে।

—দরজাটা খুলে দিন অনন্য! কী করছেন! চাপা গলায় কয়েকবার ডাকলাম আমি। দরজা খুলল না। তবে কেকা খুব জোরে চিৎকার করেনি। পাগলিটাও চিৎকার করতে জানত না।

আমার কষ্ট হচ্ছিল। তীব্র কষ্ট। মস্তানরা গুলি করে মেরে দিল কুকুরটাকে গলির মধ্যে, মায়াময় প্লুতস্বরে ঘেউ করে উঠল, উচ্চচকিত কান্নাটি ঊর্ধ্বাকাশে জ্যোৎস্না ধোওয়া আলোর প্লাবনে মিলিয়ে গেল। কাত হয়ে পড়ে রইল ড্রেনের নোংরা জলের মধ্যে। ওই সেই হিংসার সামনে আমি দাঁড়াতে পারিনি; পাগলিটার একজন মাথাটা চেপে ধরেছে, তখনও ওর মুখে জ্যোৎস্নামাখা লালা ঝরে পড়ছে, উরুসন্ধি নগ্ন, রোমের অন্ধকারে আদিম মোহকুঞ্চন, কালো জলের মায়া জড়ানো যৌন-প্রত্যঙ্গ-প্রদেশে, ছাদের ছায়া লেগেছে মেয়েটির দেহের নিম্নভাগে, ওখানে পশুবৎ মানুষ প্রহার করে চলেছে পুরুষাঙ্গের আঘাতে, পুরুষাঙ্গ একটি মাগুর বা গড়াই মাছের মতো ছিদ্রান্বেষী,

অলস, ঠাণ্ডা এবং জিওলের মতো বিষাক্ত। পুরুষাঙ্গ ধূর্ত এবং বোকা। এই জিনিস রোমের কুঞ্চিত অন্ধকারে নারীর যৌন-কিস্তিতে, যার বাংলা তরণী, সভ্যতাকে বীজরূপে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে আসলে আত্মসুখ ছাড়া কোথাও কোনও লক্ষ্য অবশেষ রাখে না ; শুধু ভোগ তার মূল, মূলে সে ওই মোহ্-সুন্দর তৃণভূমিতে, জলাশয়ে কাদাখোচা পাখি, মুকুতায় তার লোভ নাই, কেননা সে অবগাহন জানে না, পুরুষাঙ্গ কখনও স্নান জানে না, নারী যাদ্দ্বারা প্রসব করেন, ওই অঙ্গ পুরুষের বিষ রাখবার মৃত্তিকা—সেখানে বলাৎকার এক সুন্দর অভ্যাস।

অনন্য কেকার ফিতেঅলা ম্যাক্সির দিকে হাত বাড়ায়, কেকার বাহুমূলে বৃদ্ধাঙ্গুলি চাপে এবং অন্য অঙ্গুলি দিয়ে জাপটে ধরে, খামচায় এবং চিৎ করে খাটে। খাট থেকে মেঝেয় ফেলে দেয়, কেননা কেকা অনন্যর জবরদস্তিকে বাধা দেয়। ওই সেই পাগলিটা যেন বাধা দেয়। হা ঈশ্বর, তবু কেকা কথা বলতে পারে না। ওর লালা ঝরতে থাকে, জিভ বার হয়ে পড়ে। কেশ আকর্ষণ করে অনন্য ওরফে দুঃশাসন, স্তনবৃন্তে নখের আঘাত করে হবু স্বামী, কিন্তু কেকা এখনও কিশোরী, তার যৌন অঙ্গ এখনও অনাঘ্রাত, সেখানে ছিল কোমল পুষ্পের বিহ্বলতা, সে হয়ে উঠেছিল ময়ূরী, মূক ভালবাসা সমুদ্রের মতন রোদন করছিল তার স্তনসন্ধির কাছে ঘুমন্ত জরুলে, তার রঙ নীল।

হৃদয় যদি একটা শততন্ত্রীর সেতার হত, তা হলে তার মীড়ে মীড়ে কেঁদে ওঠা যেত। আমি ভয়ে দুয়ারে জোরে করাঘাত করতেও পারি না। চাপাসুরে ডাকি—কেকাকে ছেড়ে দিন অনন্যবাবু। স্যার, ও ময়ূরী। ও জানে না, আপনি ওর কী সর্বনাশ করছেন। বলতে বলতে ও জানে না থেকে সর্বনাশ বলা পর্যন্ত বাক্যটি জিভের তলে জড়িয়ে যায়। ভয়ে, লক্ষ্মীর মাকেও ডাকতে পারি না।

অনন্য লজ্জা পায় না, কিঞ্চিৎ ভয় পায়। কপালে হাতের ডোঙা করে চোখ আড়াল করেছে, এভাবে সিঁড়ি ভেঙে নামে। কারও চোখে যাতে চোখ না পড়ে। চলে যায় অনন্য। ভয় পেয়েছে, তবে লজ্জাও হয়ত ছিল। কী ছিল, চোখে তো দেখিনি।

লক্ষ্মীর মা বলল—অমন ঢঙ করছে কেন রে। যেন আকাশের গ্রহণ দেখছে সুয্যির। আলো সহ্য হচ্ছে না। কেন রে ? আমরা কী করেছি ? ওভাবে নেমে পালাল কেন ? কেকার কিছু করে গেল না তো ! দ্যাখ না উপরে গিয়ে।

—যাই করুক, তোমার তাতে কী ললিতাদি ! আছো, থাকো। বেশি কথা বলো না।

—কথা কোথায় বললাম ভাই। চোখে দেখব, বলব না।

—তুমি চোখে কিছু দ্যাখোনি।

—দেখিনি?

—না।

—তো, তুই দেখলেই তো পারিস। কী করে না করে, অমনি করে আসছে যাচ্ছে, শেষে যদি বিয়ে না করে। ময়ূরী সেজে বসেছে কেকা। কথা যদি না ফোটে কখনও?

আমি কিছু আর বলি না লক্ষ্মীর মায়ের কথায়, চুপ করে থাকি। একটু আগে বন্ধ দুয়ারে মৃদু মৃদু ঘা দিয়ে ডেকেছি অনন্যকে, তারপর বিচলিত আমি নীচে চলে আসি। একটু আগে জেগে উঠেছে লক্ষ্মীর মা।

অনন্য চলে গেল। লক্ষ্মীর মা বলছে উপরে যেতে। কী অবস্থায় কেকাকে দেখব বুঝতে পারি না। তবু দোতলায় উঠি। কেকার শরীরের ঊর্ধ্বভাগে কাঁধের উপর ম্যাক্সির ফিতে, সেটির একটি, হাত ছাড়িয়ে খসে নেমেছে, মাথার চুলগুলি ঝাঁপিয়ে নেমেছে মুখের উপর। দু হাতে ভর রেখেছে মেঝেয় এবং উঠে বসেছে, একটু একটু করে কাতর গুমরানো স্বর গলা দিয়ে ঠেলে ঠেলে আসছে তার।

মনে হল, ময়ূরীকে যৌন-নিগ্রহ করে ফেলে রেখে চলে গেছে অনন্য। আমি ছুটে গিয়ে ওকে নাড়া দিয়ে ডাকতেই সে আমার বুকে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ে ডেকে উঠল—মা!

এই প্রথম কথা বলল কেকা। অন্তর আমার দুরদুর করে কেঁপে উঠল প্রবল মমতায়।

ডাক্তারবাবুর কাছে আমি কতকিছু বলব বলে ছুটে আসি। কিছুই পারি না।

—কিছু বলবে রঙ্গন?

—না, ডাক্তারবাবু! আমার কথা শেষ হয়ে গেছে। শিবু বৈষ্ণব যা বলে গেছে, সব সত্য। এই সংসারে আর আমার ভাল লাগে না। আমি চলে যেতে চাই।

—কোথায় যাবে! ময়ূরীকে ফেলে চলে যাবে! শোন, আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে অনন্য। শীতকাল কবে আসবে ডাক্তারবাবু, সত্যিই কি কথা বলবে কেকা! আমি কেকাকে না পেলে আত্মহত্যা করব। বাবা-মা শুনছেন না, নইলে আমি বোবা মেয়েকেই বিয়ে করতাম!

শুনতে শুনতে আমি চমকে উঠলাম।

ডাক্তারবাবু বললেন—অনন্যর কষ্টের শেষ নেই। তুমি ভেবে দেখো।

আমার ক্রোধ হচ্ছিল মনে মনে। সবার কষ্টের জন্যই কেন আমাকে ভাবতে হবে। কেউ কেন আমার কথা একটুও ভাববে না। সবার দুঃখ আছে, আমার কেন নেই! কেকা যে আমাকে 'মা' বলে ডেকেছে, সেকথা আমি আর কাকে বোঝাব।

কোন কথা বলতে আর ইচ্ছে হল না। রাস্তায় আসতে আসতে হঠাৎ দেখি, সেই নয়নবউ রাস্তা দিয়ে চলেছে। এ কী সত্য। এখানে নয়নবউ কোথায় এসেছিল!

—কোথায় যাচ্ছ নয়নবউ? আমাকে চিনতে পার।

—কে তুমি বাছা।

—আমি রঙ্গন।

—ও। তুমি হরিমতীর ছেলে রঙ্গন। বেঁচে আছিস ভাই।

—হ্যাঁ গো বউ, আমি মরিনি।

অবাক চোখে আমাকে দেখতে থাকে নয়ন।

—এই টাউনে গঙ্গাপারের কলোনিতে আমার ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। বাচ্চা বিয়োতে মারা পড়ে, তো তাই একবার এসেছিলাম। চিতা হয়ে গেছে। আমি বেঁচে আছি, তা এরা কী করে জানবে! বানের রাতে আমি ছিলাম বড়দহে, মেজো মেয়ের ওখানে। তুমি তো মা-বাবা পাও নাই জাদুধন। পাও নাই।

—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল নয়নবউ।

—আমার যে দ্যাশ-দেহাজ নাই বাছা। আমি ভিখিরি।

নিজেকে ভিখিরি বলা মাত্র নয়নবউয়ের মাথার কাপড় তার পিছনের কাঁধে খসে পড়ল আর আমি আঁতকে উঠলাম। সেই সুদীর্ঘ ঘনিল কেশপাশ কোথায়, কিছুই নেই। চুল বলতে কিছুই নেই, মুঠোয় ধরলে এতটুকু লেজমাত্র, বউকে দেখায় বজ্রাহত খাঁ খাঁ তালগাছ, আকাশে গলা তুলে দাঁড়ানো শূন্যতা। সে চলে গেল।

ভাবতে পারি না, একদিন ওর দীর্ঘ মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বেঁচে উঠেছিলাম নদীজলের টান থেকে। ডুবে যেতে যেতে বেঁচে উঠেছিলাম। ওর খেতখামার ছিল, পাঁচ বিঘা জমি ছিল ওদের, ও ছিল গঞ্জের সবজিওলী। ওকে দেখে আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করল না। মনে হল, কোথাও আর যাওয়ার নেই ওই নিঃস্ব মানুষ কোথাও আমায় পৌঁছে দেবে না। মনে হল,

আমারও বুঝি জীবনের প্রয়োজন শেষ হয়ে এসেছে।

চোখ পড়ে দেওয়ালটার দিকে। 'খুনি অর্জুনকে এক ভোটও নয়।' আমি কখনও জীবনে প্রতিবাদ করতে পারিনি। জীবনের কোনও মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে পারিনি। কেকা চোখের উপর ধর্ষিত হয়, কী আশ্চর্য, মনে হচ্ছিল, আমার ময়ূরীকে যৌনগ্রাসে বিক্ষত করছে অনন্য, অথচ সেকথা মুখে একবার উচ্চারণ করেও বলতে পারলাম না। লক্ষ্মীর মা আমাকে উত্যক্ত করতে চেয়েছিল, প্রতিবাদী করতে চেয়েছিল, আমিই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছি, 'তুমি কিছুই দেখোনি ললিতাদি।' এভাবে বলিনি, পাগলিটার অমন সর্বনাশ করছ কেন তোমরা ! কুকুরটাকে মেরে ফেলল চোখের উপর, কাত হয়ে মরে পড়ে রইল ড্রেনে, খুব জ্যোৎস্না ছিল সেই রাতে। আমি কোনও প্রতিবাদ করিনি। ওরা আমাকে খাসপুর ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল, আমি চলে আসি। পদ্মা এত ভীতু করেছে যে, আমি শত অন্যায় চোখের উপর দেখেও চুপ করে থাকি। হরিমতীর ছেলে কখনও প্রতিবাদ করে না। সেবাদাস, বাঁধা চাকর আমি। আমার কি কোনও নিজস্ব জীবন আছে। আমাকে মানুষ সহজেই গল্পের খোরাক করে নেয়।

আজ মনে হল, একবার অন্তত জীবনে প্রতিবাদ করি। 'খুনি' কথাটা মুছে দিই। চায়ের স্টলটা ওদের, ওই বিরুদ্ধ পক্ষের। ওখানে দু তিনজন বসে চাটকি দিচ্ছে, মস্তানগোছের ক্যাডার, স্লোগান দেয়। থাক ওরা, আমি আমার কাজ করে যাব। একটি ভেজা ভেজা ধরনের নরম ইটের সিকিভাগ হাতে তুলে নিই, খুনি কথাটির উপর ঘষতে থাকি দ্রুত হাতে। ওরা হঠাৎ আমাকে দেখতে পায়। দেওয়ালে ওদের দলের নামে বাৎসরিক সাইট ফর করা আছে, যেন লিজ নিয়েছে। এই দেওয়ালও ওদের খাস তালুক। তিনজন খ্যাঁক খ্যাঁক করতে করতে ছুটে এল কাছে।

—অ্যাই শালা, কী করছিস এখানে ?

—দেখছই তো, বাবার নামটা মুছে দিচ্ছি।

—কে তোর বাবা ! এই ছোঁড়া অর্জুনকে বাবা বলছে রে।

—চোপা ভেঙে দে ঘন্টে। বাবা ডাকা সেঁধিয়ে দে, শালা পানতোয়া। একটু কড়কে দে ভাল করে। ওঠা, হাত ওঠা !

—না।

—ওরে। না বলছে রে ! একেবারে বেলডাঙার মনোহরা।

—বাবা খুনি নয় দাদা !

—বাবা, দাদা ! শালা চাকরের ভাষা কি মুখে ! অর্জুন তোর বাপ ?

আমি ভয়ে দেওয়ালে সেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করি। এই দেওয়াল স্লোগানের জন্য, মানুষের জন্য নয়। একজন কোঁৎ করে লাথি মারে আমাকে। মনে হল, একখানা হাড় বেঁকে গেল।

—ওঠ্ শালা, উঠে পড় !

—না।

আর একজন গলায় হাত বাড়িয়ে চেপে ধরে বলল— তুই জানিস, অর্জুন খুনি কিনা ! পঙ্গু মেয়েটাকে মেরে ফেলেনি ?

—না।

—তুই কী করে জানলি, কোথায় ছিলি তুই ?

—ছেড়ে দাও আমাকে !

—দেব, আগে বল্। তুই দেখেছিস ! পারুল দেখেছে।

—ভুল। মিথ্যে কথা। পারুল নিজেই মেরেছে ময়ূরীকে।

—তাই নাকি ! অর্জুন তা হলে এই কুত্তাকে ফিট করেছে নরুদা।

—খাস্তা বানা, আর কথা কিসের !

চোয়াড়ে ছেলেটা এবার হাত চালাতে লাগল। মাথা ঠুকে দিলে দেওয়ালে। মুখে ঘুষি চালিয়ে দিলে। আমি জিভে লবণের স্বাদ পাই।

আধমরা করে দেওয়ালে ঠেলে বসিয়ে দিয়ে ওরা চলে যাওয়ার সময় বলল—এই শহর ছেড়ে চলে যাস। নইলে মুখবুজে থাকিস ! শালা উল্টো ক্যাম্পেন করতে নেমেছে, ডোবাবে দেখছি।

—এই হল অর্জুনের কায়দা, বুঝলি ! চ। দাওয়াই পড়েছে, হাতটা আর একটু মুচড়ে দে, যাতে ওয়ালিং মুছতে না পারে।

—এরই সঙ্গে পঙ্গু মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিল, জানিস তো ! ফার্স।

—চ, চ !

ওরা আমাকে আবার লাথি মারে। বাঁ হাতখানা এমন করে মোচড়ায় যে, ওটা বেঁকে যায়। ঠোঁটে রক্ত, কপালে ভুমো। হাত বাঁকা। বুকে পর্যন্ত লাথি মেরেছে, তখন আমার হৃদয় মা মা করে কেঁদে উঠেছিল।

ডাক্তার পরিমল সামন্তের চেম্বার এই দেওয়াল থেকে অদূরবর্তী ছিল। তার চেম্বারের ফরমাশখাটা ছেলেটা ঘটনাটি দেখতে পায়। ডাক্তারবাবু ছুটে আসেন।

রিকশা করে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়। লজ্জা, লজ্জা ! চোখ খুলে

চাইতে পারি না আমি। এই পৃথিবী আমার কোনও প্রতিবাদই সহ্য করবে না। রাস্তায় নামতে পর্যন্ত ভয় করবে আমার। ওরা যদি আবার আমাকে মারে! হরিমতীর ছেলে আমি, আমার কি প্রাণের মায়া থাকতে নেই!

সমস্ত শরীরে ব্যথা, এ বাড়ির বাবু কথা বলছেন ডাক্তারের সঙ্গে। রাঙাবউ এসেছে দোতলা পর্যন্ত। এই প্রথম আমি মামণির খাটটিতে শুতে পেয়েছি। ফ্যানের হাওয়া লাগছে গায়ে। আমার বাঁ হাতে কি ব্যান্ডেজ করে দিলেন ডাক্তারবাবু। ঠোঁটে গরমজল আর ওষুধের গন্ধ পাচ্ছি। মুখ হাঁ করা দুঃসাধ্য, একটুখানি ফাঁক হয়। জলের সঙ্গে একটা বড়ি পেটে গেল। আমার এখন ঘুম আসতে চায়। একটা ইনজেকশন কি হল কোথাও শরীরে? না, আরও দুটি ট্যাবলেট ঢুকল পেটে। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

বিকেল হলে আমি জেগে উঠি। বাঁ হাতে সত্যিই ব্যান্ডেজ হয়েছে। আমাকে কেমন দেখাচ্ছে জানি না। ঠোঁট, কপাল কি এখনও ফুলে আছে? চোখ খুলে আমি লক্ষ্মীর মাকে দেখতে পাই। ও এককাপ গরম কফি এগিয়ে দেয় আমার দিকে। ভাল বিস্কুট দেয় খেতে, সঙ্গে কিছুটা দামী কেক।

ওটুকু খেয়ে আবার শুয়ে পড়ি আমি। চোখ বন্ধ করি। ঠিক তখন শীতল হাতের ছোঁয়া লাগে আমার কপালে। চোখ মেলে দেখি কেকা। খাটের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে একটু একটু কাঁপতে কাঁপতে সামনে সরে এল। দুটি চোখে তার নিবিড় মমতা সূক্ষ্ম আলোক-কণিকার মতো গহন আকাশ থেকে ঝিলমিল করছে। লক্ষ্মীর মা নীচে চলে গেছে।

সামনে এসে বসেছে কেকা। আমি উঠে বসেছি। ডান হাতখানি দিয়ে ওর কোমল হাতের মুঠিটা খাটের চাদরের উপর চেপে ধরি। ও তখন আমার এই স্পর্শভঙ্গিমা দেখে, দুটি হাতের বদ্ধমিলন দেখে, চোখ দুটি তার জলে ভরে যায়।

আমি দিশেহারা বালকের মতো দেখি, ওঁরা এসেছেন। মামণি, বাবা, অনন্য এবং ডাক্তারবাবু।

কেকার হাতের মুঠি ছেড়ে দিই না তখনও। বলি—তুমি কখনও কথা বলবে না ময়ূরী কখনও বলবে না। সব চেষ্টা ব্যর্থ কর, সমস্ত নিষ্ফল করে দাও। তুমি কথা বললে এরা আমাকে থাকতে দেবে না।

—কী বলছ রঙ্গন! এ কী বলছ তুমি! বলে প্রায় তেড়ে আসে অনন্য।

ডাক্তারবাবু বললেন—ওকে কিছু বলো না অনন্য।

—আমার কী হবে ডাক্তারবাবু! বলে হাহাকার করে ওঠে অনন্যর স্বর।

ডাক্তার বলেন—গল্প আরও জটিল হয়ে গেল দেবপ্রিয়া। অনেক জটিল হয়ে গেল। কেস ইস ভেরি ইনট্রিকেট, জট শক্ত হয়ে গেছে। বলে পরিমল সামন্ত সোফার উপর বসে পড়লেন কিঞ্চিৎ হতাশভঙ্গিতে।

সহসা অনন্য কেকার কাঁধে হাত রেখে বলে— একবার কথা বল কেকা।

—নাহ্, না। না। বলে গুমরে উঠল কেকা, ওর কাঁধ থেকে অনন্যর হাত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর দু চোখ ব্যাপে ছাপিয়ে এল জল। তীব্রভাবে জ্বলে উঠল অশ্রু। দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকল কেকা।

ডাক্তার সামন্ত সোফা ছেড়ে লাফিয়ে খাড়া হয়ে বললেন, প্রায় আর্তনাদের মতো, অদ্ভুত ক্রোধে ফেটে পড়লেন—এখানে কেউ কেকা নয় অনন্য। কেকা এখানে নেই! তুমি ময়ূরীর গায়ে হাত দাও কেন? স্টুপিড। কলেজে পড়াও, তোমার বুদ্ধি নেই, শালীনতা বোঝো না। খুব মডার্ন হয়ে গেছ, তাই না? অথচ রঙ্গনকে সহ্য করতে পার না। স্কাউন্ড্রেল। চলে যাও!

—আমাদের কি তা হলে বিয়ে হবে না বলছেন।

—এই অবস্থায় তুমি ময়ূরীকে বিয়ে করতে পারবে?

—আমি কোনও ময়ূরীকে বিয়ে করব এমন কথনও বলিনি।

—ও ময়ূরী, তুমি জানো না? ওই মেয়েটা ওভাবে কাঁদে কেন, তুমি কী করেছ ওর? গায়ে হাত দাও কেন? অসভ্য।

—এইভাবে বাজে কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু।

—আমি কোনও বাজে কথা বলিনি, তুমি চলে যাও এখান থেকে। যেদিন কথা বলবে ও, সেদিন বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে আসবে। তুমি থাকলে, আমি বলছি,...

অর্জুন বললেন—চুপ করে সামন্ত, চুপ কর। আমি অনন্যর বাপমায়ের সঙ্গে গত পরশু পাকা কথা বলে এসেছি। ওঁরা এই অবস্থাতেই বিয়ে দিতে চান। বউমার ট্রিটমেন্ট ওঁরা কলকাতায় করাবেন, নার্সিংহোমে রাখবেন দরকার হলে।

—ব্যস! হয়ে গেল অর্জুন। ও কোনওকালে মুখ খুলবে না। এটা নার্সিংহোমের কেস নয় দেবপ্রিয়া। এটা টাকা ঢেলে ভাল করা যায় না।

—ওর সামনেই এভাবে বলছ কেন পরিমল। বলে ওঠেন অর্জুন।

—ময়ূরী আমাদের কোনও কথা বোঝে না। ও শুনতে পাচ্ছে না। ও রয়েছে একটি শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে। ওর একটি জানলা বন্ধ করে দিতে হবে এবং তারপর ঠিক উল্টোদিকের দরজাটা খুলে দিতে হবে। একটা পাপ, পাপের ফিলিং ওকে গ্রাস করেছে। এখন যদি অনন্যর ছোঁয়া লেগে ও নিজেকে

অপবিত্র ভাবে, তা হলে আর কী করবে তখন ?....অনন্য চলে যাক, নইলে আমিই চলে যাচ্ছি। বলে ডাক্তার পরিমল সামন্ত প্রায় লাফ দিয়ে যেন দরজার কাছে চলে যান।

তারপর ক্ষিপ্রভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন—একটা কিশোরী ভালবাসায় পবিত্র হয়, ওই রকম কাঁধে হাত রাখলেই ভালবাসা হয় না। ওই অনন্য মেয়েদের ছুঁতে জানে না। চলি। বলেই সিঁড়িতে নেমে যান ডাক্তার সামন্ত।

—এই ডাক্তারটা খুব কনজারভেটিভ জামাইবাবু। খুব বুড়ো! বলে উঠল অনন্য, কী একটা হিসেব মতো, দূর আত্মীয়তায় অর্জুনকে সে জামাইবাবু ডাকে। শোনা যায় আরও একটু নিকট হয়ে ডাকলে, মেসো ডাকতে হবে।

তারপর আর কিছুদিন এ বাড়িতে আসে না অনন্য। কিন্তু কেকার রক্ত ওকে দুর্বার আকর্ষণে নেশার মতো টানছে বুঝতে পারি। একবার সে স্বাদ পেয়েছে, আবার সে চায়। এখন মনে হচ্ছে, কেকার সবল বাহু, দৃঢ় পা, বলিষ্ঠ দেহ এবং ধারালো মুখের ভাষা ছাড়া এই উদাসীন গৃহে সে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ও রাস্তার পাগলি নয়, ও তার সন্তানকে কোলে করে আটার বিস্কুট গুঁজে দেবে না মুখে। ওর পাপ থেকে, ওর অপবিত্রতা থেকে ওকে আমি মুক্ত করে যাব।

পৃথিবীর এ কেমন নিয়ম, যে সবচেয়ে অসহায় সে-ই কিনা অসহায়কে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে চায়। ভালবাসা মানুষকে পবিত্র করে, এই একটা কথা আমাকে সাহসী করে।

কিন্তু এক রাত্রিতে মদ খেয়ে অর্জুন নেমে আসেন ময়ূরীর ঘরে। যে-ঘরে আজকাল আমি শুই। আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। ওঁর চোখমুখে ঘাতকের দৃষ্টি, ঘর্মাক্ত মুখে হিংসা এবং ঘৃণা।

—কবে যাবি এখান থেকে ?

—চলে যাব বাবু!

—কবে ?

—কেকা কথা বললেই চলে যাব!

—কথা ঠিক থাকবে তো!

—আজ্ঞে!

—কথা বলা তা হলে!

—বলবে বাবু, বলবে। হরিমতীর ছেলে আপনাকে মিথ্যে বলছে না।

—ওরা, তোকে খুব মেরেছে, তাই না রে!

—আজ্ঞে। আমি তো পঙ্গু হয়ে গেছি। তখন দেখলাম, নয়নবউ ভিখিরি

হয়ে গেছে। কী কষ্ট বাবু।

—চলে যাস তা হলে।

—যাব। আপনার কোনও ক্ষতি করব না। নুন খেয়েছি।

—চালাকির কথা রাখ। কেকা কথা না বললে আমি জীবনের মতো পড়ে যাব রঙ্গন। দাঁড়াতে পারব না।

—আজ্ঞে।

॥ নয় ॥

জাঁকিয়ে শীত পড়ল তারপর। কেকার মুখমণ্ডল চন্দন-চর্চিত। পরনে বেনারসী। ওর নাকে টিকলি। মাথায় টায়রা। গায়ের নীল জামা ঝলমল করছে। পায়ে টকটকে আলতা, কপালের সিঁথিতে সিঁদুর। আমার সামনে এনে বসানো হল তাকে। এই সেই ময়ূরী, যাকে আমি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।

আমি পরেছি সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। কিন্তু এ কোনও বিয়ের পোশাক নয়। কেকাকে সম্পূর্ণ কনের রূপে ময়ূরী করে তোলাই ডাক্তারের উদ্দেশ্য। তবু মনে হল, যেন সত্যিই আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। অথচ ওর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছেন এয়োস্ত্রী অনন্যর মা, কেননা কেকা ওদের বউ। ভয়, ঈশ্বর। অভিনয়কেও এরা ভয় পায়। ডাক্তার সামন্ত সবই লক্ষ্য করেছেন। একটিও কথা না বলে চুপ করে রয়েছেন। বাইরে প্রবল ঠাণ্ডা এবং এলোমেলো হাওয়া।

রাত্রি হয়েছে। জীবন আমার অদ্ভুত। বর আমি। অথচ বর নই। যাকে ময়ূরী ভাবি, সে ময়ূরী নয়। এখন কেকা কথা বলে উঠলেই আমার ছুটি। অনন্যর বাপ-মা এসে বউ আগলাচ্ছেন, বউ কথা বলবে।

—ডাক্তারবাবু, বলবে তো। আকুল প্রশ্ন করেন ওঁরা।

সামন্ত বললেন—চেষ্টামাত্র। আমি বলতে পারব না। মেয়েকে আমাকে দিন, দোহায় আপনাদের, কাজ করতে দিন। কেউ আমার সঙ্গে আসবেন না। এসো মা। বলে তিনি দোতলার বড় ঘরটির কাছে এনে কেকাকে বলেন—এই তোমার খাট, তুমি শুয়ে পড়। রাত হয়েছে। তুমি কে বল তো মা।

হু হু করছে হাওয়া, পুরনো শতাব্দীর ভাঙা আকাশে ঘোলানো শীতের ছায়া হাওয়ায় ভাসমান। বরফের মতো ঠাণ্ডা চাঁদ, আলো পাণ্ডুর। সকলকে

অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার। এ ঘরের **একটি** জানলার অর্ধাংশ খুলে রেখেছেন। আলো নিবিয়ে দিয়ে, নীল ক্ষুদ্র বাল্বটি জ্বেলে দিয়ে বললেন—লেপটা গায়ে দিয়ে শোও। মনে আছে, নীচের জানলাটা খোলা। পারুল বন্ধ করেনি। তুমি কে গো মামণি ?

লেপটা গা থেকে ফেলে দিয়ে উঠে বসল কেকা।

—কে ?

স্পষ্ট এই একটা কথা বার হল কেকার মুখ দিয়ে। ডাক্তার আনন্দে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন।

—পারুল। পারুল বন্ধ করেনি। চলো আমরা নীচে যাই। ওটা বন্ধ করে দিতে হবে। জানলাটা। মনে পড়ে না ?

সমস্ত স্মৃতি কেকাকে অত্যন্ত সবলে ঘিরে ধরেছে, ও খাট ছেড়ে অত্যন্ত দৃঢ় পায়ে মেঝেয় দাঁড়িয়ে পড়ে। ও যেন স্থির করতে পারছে না, সত্যিই সে কে। ময়ূরী নাকি কেকা! সেই দ্বিধা তার চোখে, সেই আলোড়ন ধরতে পারেন ডাক্তার। প্রথমে তিনি তাকে ময়ূরীরূপে এবং ময়ূরী হৃদয়ে, ময়ূরী মুদ্রায় স্থাপন করেন, অতঃপর তাকে কেকায় বদলে দিতে চান। এই হিমনিশি, সর্পিল হাওয়া এবং বিষ, এমনকি এই রাতেই বাবা মেয়েকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে মারতে চেয়েছিলেন। ময়ূরীর বিছানার কিনারে দুই চারিটি সাদা বড়ি পড়েছিল ছড়িয়ে, বাবার মুঠো থেকে। নতুন করে আবার ময়ূরীর বিছানা পাতা হয়েছে।

—তুমি ইচ্ছে করলেই ময়ূরী হতে পার—পার না ? তুমি কে তবে ? কে ? তুমিই তো ময়ূরী। বলে উঠলেন ডাক্তার। এই সব ঘটনা যখন ইচ্ছে, কেউ তখন আমাকে মনে রাখেনি। কোথায় আমি কেউ জানে না। আমি বর নই, রঙ্গন নই, চাকর নই, কেউ নই, কিচ্ছু নই আমি। কোনওই অস্তিত্ব নেই কোনওখানে।

কেকা সিঁড়ির কাছে চলে আসে একা। তার আগে একবার তেতলায় উঠে যায়, বাবা তা হলে ময়ূরীর ঘরে। তারপর আর দেরি করে না। ছুটে আসে ময়ূরীর দোরের কাছে। ধাক্কা দেয়। দরজা বন্ধ।

—খুলছে না কেন! বলে ওঠে কেকার হৃদয়। ও পাগলের মতো ঘনঘন করাঘাত করতে থাকে। বাবা কি ময়ূরীকে ঘুমের বড়ি খেতে দিলেন! আমি কে তবে ?

ডাক্তারবাবু অর্জুনকে ডেকে বলেন—ঘুমের বড়িগুলো কোথায়! দু-একটি মেঝেয় ছড়িয়ে রেখেছ তো।

—হ্যাঁ, সামন্ত। গোটা কতক দিয়েছি।

—ক'টা।

—গুনিনি।

—তবু বল।

—মনে নেই।

—সর্বনাশ হয়ে গেল দেবপ্রিয়া।

কেকা এবার দরজায় কপাল ঠুকে কেঁদে উঠল—নাহ্।

ওর হাতের মুঠিতে সিঁদুরের কৌটো, সেটি ঠুকতে থাকল দরজায়। শরীরে সমস্ত বল তার ফিরে এসেছে। জিভে কি সব ভাষা ফেরেনি এখনও।

আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। আমি ময়ূরীর নীচু চৌকিতে শুয়ে রয়েছি। সেই রাত্রি এসেছে পৃথিবীতে। শরীর দিয়ে আমি এখন ময়ূরীকে অনুভব করতে পারছি। ময়ূরী পাখির মতো মুখ হাঁ করল, বাবা ঘুমের বড়ি দিতে গিয়ে পারলেন না।

ওঁরা আমাকে নাম ধরে ধরে ডাকছেন। সমস্বরে ডেকে চলেছে পৃথিবী। আমার ভয়ানক ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। অথচ আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। প্রবল তেষ্টা। বাবা ভয় করেছেন। বেশি বড়িও ফেলে রাখতে পারেননি। মানুষটা অমন নিষ্ঠুর, তবু তিনি পারেননি। এই রাতে তারও ভয়ানক স্মৃতি জেগে উঠেছে। ঘুম আসছে, এখন হাওয়া যদি আমাকে মারে! এত শৈত্যেও কি আমার মৃত্যু হবে না?

—ক'টা ছড়িয়েছ মনে করতে পার না কেন? মদ খেয়েছ? ইস্। এইভাবে শেষ হয়ে যাবে নাকি সব! গভীর আর্তনাদ শুনি ডাক্তারের মুখে।

ঠাণ্ডার হৃদয়ে আরও ঘুম আছে। আমি এবার বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ি মেঝেয়। ময়ূরী কিভাবে খাড়া হয়ে উঠেছিল! আমি উঠব।

এবার তা হলে আমাকে খুলতে হবে। কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না।

—দরজা খোলো রঙ্গন। কেকাকে জানলাটা বন্ধ করতে দাও! পরিমল সামন্ত সজোরে বলে উঠলেন।

এই কথা শুনে বাইরে নিশ্চয়ই কেকা চমকে উঠল। কে তবে সে? তার এই পোশাক কেন? বাবা কি ময়ূরীকে বড়ি খাইয়ে দিয়েছেন। কেকা ভাবে, আমি কী করছি এখানে! দরজা বন্ধ রয়েছে কেন? আমি ময়ূরী? না, আমি ময়ূরী নই। তীব্র দ্বন্দ্বে শরীর ঘেমে নেয়ে ওঠে কেকার। সে কপাটে মাথা

ঢুকে বলে ওঠে—খোলো।

আমি সব বুঝতে পারছি। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াই আমি। ডাক্তারবাবু বার বার কেন ঘুমের বড়ির কথা বলছেন। উনি এতই বুদ্ধিমান যে, আমাকে সন্দেহ করছেন, উচ্চারণ করে বলতে পারছেন না, আমি এই ঘরে ঢুকে দোর এঁটে সত্যিই কী করেছি। এভাবে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ডাক্তার সামন্ত কল্পনাও করেননি। অথচ এখন তিনি ভয় পেয়েছেন।

ময়ূরী যা পারে, জীবনের প্রবল তৃষ্ণা আমাকে তা হতে দেয় না। বহুকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন এই দেহে লুক্কাইত প্রাণকে বলি— এত বাঁচার নেশা! এতই জোর তোমার! হায় ঈশ্বর, কেকা কথা বলে উঠল। ছটফট করছে প্রাণের আকৃতি, বেঁচে উঠতে চাইছে এই মূক হৃদয়।

দরজা খুলে দিলাম। নীল ছায়াচ্ছন্ন ঘোর আলোয় সিধে কেকা জানলার কাছে ছুটে গেল। খোলা জানলার পাল্লা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর মেঝেয় পড়ে থাকা আমাকে দেখতে পেল।

কেকার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রথমাবধি ছিল, ইচ্ছে করলেই সে ময়ূরী হতে পারে এবং প্রবলভাবে সে কেকা, কখনই ময়ূরী নয়—এই নিহিত অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্বকে ডাক্তারিবিদ্যার আলোয় কাজে লাগালেন ডাক্তার পরিমল সামন্ত। যখন কেকা ময়ূরীর বেশে শৈত্যবাহিত হাওয়াকে স্তব্ধ করে ময়ূরীর ঘরে ঢুকে জানলার কপাট রুদ্ধ করে ঘুরে দাঁড়ায় তখনই সে সম্পূর্ণ কেকা হয়ে ওঠে, তার জিহ্বায় কথা বলার সাহস সঞ্চারিত হয়ে যায়।

—তুমি কখন এলে রঙ্গন, এত বুঝি দেরি করে। বলে ওঠার চেষ্টা করে কেকা, ঝুঁকে নামে রঙ্গনের দেহের কাছে। তার আগেই ডাক্তার সামন্ত রঙ্গনের দেহকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিলেন দুই বাহুর উপর।

ডাকলেন—এসো কেকা। দেখো তো, এ ঘরে কোথাও ঘুমের বড়ি পড়ে আছে কিনা।

এ ঘরে কিছুই পড়ে ছিল না। ডাক্তার রঙ্গনকে দোতলায় তুলে এনে খাটে শুইয়ে দিলেন। কেকা দ্রুতই ঢুকে আসে সেখানে। ডাক্তার বললেন—দরজাটা বন্ধ করে দাও। কাউকে ঢুকতে দিও না।

অর্জুন এবং দেবপ্রিয়া তবু ঢুকে পড়লেন।

—আমরা চলে যাব? শুধালেন অর্জুন।

—আমরা থাকব না। বললেন দেবপ্রিয়া।

ডাক্তার কোনও জবাব না দিয়ে নিজেই ছুটে এসে দরজা এঁটে দিলেন।

তারপর ছুটে আসেন রঙ্গনের কাছে। ও চোখ খুলছে না। তার দেহে একটা পাতলা জামা ছাড়া কিছু নেই। শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যুর খবর খবরের কাগজে পর পর তিনদিন ছেপেছে। ওর মুখের কাছে সবাই ঝুঁকে আসেন। ঘরের রুডলাইট জ্বেলে দেন ডাক্তার। হঠাৎ দেখেন রঙ্গনের দু হাতে মুঠি বাঁধা।

ডাক্তার বললেন—ঠিক করে মনে কর অর্জুন ক'টা বড়ি....

—তিনটে চারটে।

—এক রকম বল। দু রকম বলবে না!

—চারটে।

ডাক্তার এবার রঙ্গনের হাতের মুঠি খুলে দিতেই তিনটি বড়ি পড়ে যায় মেঝেয়। ঠিক তখনই ওই বড়িগুলি দেখে কেকা রুদ্ধ আবেগে ফেটে কেঁদে ওঠে।

অর্জুন বলেন—তিনটিই ছিল সামন্ত। তার বেশি ছিল না। তোর মনে আছে কেকা, ক'টা বড়ি ময়ূরীর বিছানার কাছে আমার মুঠো থেকে খসে পড়েছিল ? তিনটে বোধহয়।

কেকা এবার ফুঁপিয়ে ওঠে তীব্র আবেগে। অর্জুন বলেন—তুই বলেছিলি! ক'টা ?

কেকা বলল—দুটো বড়ি নেই কেন ডাক্তারকাকা। ও খেয়েছে নিশ্চয়।

ডাক্তার বললেন—চুষে খেতে পারে। জল ছিল না ঘরে। অথবা পড়ে আছে নীচে।

—কোথাও নেই ডাক্তারকাকা, আমি দেখেছি।

—তিনটির বেশি ছিল না সামন্ত, আমাকে অত নিষ্ঠুর ভেব না। রঙ্গন খেত, সুযোগ পায়নি। বললেন অর্জুন।

সামন্ত বললেন—চলো, ওঠা যাক।

—কেকা ? অর্জুন প্রশ্ন করেন।

—ও থাকবে এখানে, যতক্ষণ না জেগে ওঠে রঙ্গন। ঠাণ্ডায় জুড়িয়ে গেছে ছেলেটা। সারারাত চোখ মেলে চাইতে পারবে না। এভাবে বেহুলা রাত্রি জেগেছিল দেবপ্রিয়া। সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দাও মামণি!

—অনন্যকে কী বলবে ? ওদের চলে যেতে বলি! খুব সরল গলায় বলে উঠলেন অর্জুন।

ওঁরা বার হয়ে যান। দেবপ্রিয়া ফিরে এসে বলেন—রঙ্গনের মুখে স্টোভে ফুটিয়ে গরম দুধ দিও, সব আছে, ওকে জাগিয়ে তুলবে। ভয় করো না। লেপ

দিয়ে ঢেকে, খুব ভাল করে ঢেকে শোবে। ময়ূরীকে রঙ্গন যেমন করত।

দেবপ্রিয়া বেরিয়ে যান তারপর। দরজা বন্ধ করে কেকা। লেপ দিয়ে চেপে সুন্দর করে ঘুমন্ত রঙ্গনকে জড়িয়ে রাখে। ওর কপালে উষ্ণ ঠোঁট দিয়ে একটু একটু বুলিয়ে দিতে থাকে কেকা। নাকে উষ্ণতা দেয়, গলায় দেয়, বুকে মুখ ডুবিয়ে বলে—আমি পাপ করেছি। আমি অপবিত্র হয়েছি। তুমি আমার বর। কারও কি দুবার বিয়ে হয় বুঝি। বোঝো না।

একটু বাদে কেকা রঙ্গনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকে—জাগবে না।

লেপ ছেড়ে কেকা কী মনে করে খাট থেকে নামে। অধিক উজ্জ্বল আলো জ্বালে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আয়নায় প্রতিফলিত হয় ময়ূরী। সেই বিম্ব দেখে কেকা পাগলের মতো হেসে ওঠে।

একটু একটু নড়ে ওঠে রঙ্গনের দেহ। হাসির শব্দ তার আচ্ছন্ন চেতনায় পৌঁছায়। হঠাৎ চোখ খুলে যায় তার। লজ্জা পায় সে। বড়লোকের ঘরে এভাবে শুয়ে আছে সে। মরে যেতে পারেনি। মুঠোয় ধরেছিল মৃত্যুকে, কিন্তু সে তো প্রাণকেই আড়াল করতে।

শিবু বৈষ্ণব কী করে মরেছিল।

এত মধুর উষ্ণতায় কি মরা যায়, এত প্রেমে কি মৃত্যু প্রাসঙ্গিক ? বউটা যে পাগলের মতো করছে ! ওগো, হাসছ কেন ?

আরও নড়ে ওঠে রঙ্গন। এবার সেই দিকে চোখ পড়ে কেকার।

—এত দেরি করে বুঝি ! কোথায় ছিলে ? বলে উঠল কেকা।

রঙ্গন উঠে বসল খাটের উপর। দ্রুত ছুটে এল কনেদি।

—ওরা মারবে আমাকে !

—কারা ? বল, কারা মারবে।

—ওই দেওয়ালটা....ওখানে....কী করেছি আমি ?

—অমন করলে আমি একটুও কথা বলব না।

—না বলে পারবে ?

—ময়ূরী পারত, আমি পারব না ? আমি কে ? বলে দাও, আমি কে ?

—তুমি সত্যি কে গো।

দুরন্ত পাগল কিশোরী, যৌবন-উন্মুখ দেহের তৃষিত রোমকূপ, যা ময়ূরীর দেহে দেখেছিল রঙ্গন, প্রতিটি ছিদ্রে এখন কোলাহল, কত গান, কত তরঙ্গ বহে, আকুল হয়, প্রতিরোধ নেই, তীব্র ঢেউ হয়ে যায় দেহ, রঙ্গনের বুকে এসে ঝাঁপ

দেয়।

—আমাকে দেখেছ তুমি। সব। মনে মনে বলে ওঠে কেকা। স্পর্শে মনে হয়, ময়ূরী এমনই ছিল।

—বলবে না!

এমনই গন্ধ ছিল গায়ে। বিয়ের গন্ধ। শিশুঘ্রাণ এবং যৌবনের সৌগন্ধ।

রঙ্গন বলতে পারে না, তার বুকে কে আশ্রয় নিয়েছে। ভাবতে পারে না, এখনও সে কীভাবে বেঁচে আছে। ওর ভয় করে, ওর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না জীবনকে। বুকেরই মধ্যে আশ্রিতা বধূটি ঘন নিঃশ্বাসে মদির হয়ে আসে। স্টোভ জ্বেলে দুধ গরম করে দেয় রঙ্গনকে কেকা।

—গরিব সহজে মরে না কেকা!

—ও কথা বলো না গো।

—অনন্য কোথায়? ও কেন দেবে?

—কী?

—তোমাকে! আমার জন্যে।

—আমি যে তার হইনি রঙ্গন। ময়ূরী কখনও অন্যের হয় না।

—তাকে পাপ স্পর্শ করে না কেকা। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

—তুমি চলে যাবে না?

—না।

কেকা এবার রঙ্গনের বুকেরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম এসে যায় রঙ্গনের চোখে। ভোররাতে জেগে ওঠে রঙ্গন। তার বুকের কাছে কেকাকে খুঁজে পায় না। এই সুযোগে জামাপ্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নেয় রঙ্গন।

—এবার যেতে হবে। বাবু। আপনার মেয়ে কথা বলেছে, এবার আমাকে ছুটি দিন।

—কে?

—আমি রঙ্গন। চলে যাচ্ছি বাবা।

তেতলার জানলার কাছে এসে মুখ তুলে বলে উঠল রঙ্গন।

—মাকে বলে যা।

—আজ্ঞে।

—মামণি! আমার সময় হল।

—সত্যি চলে যাবি বাবা! তোর কী করে চলবে। আমি তোকে টাকা দেব। নিবি?

—না, মামণি। এককড়ি নেব না। তোমার কেকার কোনও ক্ষতি করিনি মা। যেতে দাও আমাকে।

॥দশ ॥

[কেকার কথা]

রঙ্গন আমাকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছে। ময়ূরীর ভালবাসা তাহাকে এই বাড়িতে থাকিতে দিল না। আমাকে বলিয়াছিল, আমি যেন কথা না বলি। এত চেষ্টা করিয়াও আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথা আসিয়া পড়িল। আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। কেন কথা আসিয়া জুটিল। হৃদয় কেন ভালবাসার অপরূপ নৈঃশব্দ্য সহ্য করিল না। হৃদয় তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সে আমাকে পবিত্র করিয়াছে এবং হৃদয় দিয়া ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে। রঙ্গনকে সকল নারী বুঝিবে না। কেন সে সকলই ছাড়িয়া যাইতে পারে। হাতে পাইয়াও কেন সে মুঠি খুলিয়া দেয়।

সে কোনও কালেও চাকর ছিল না। কোথাও সে চাকুরি করে নাই। ভালবাসিয়া সে মরিয়াছিল। তাহার সেই ভালবাসার তীব্র শক্তি কথায় লিখিয়া মানুষকে বুঝাইতে পারি না। মুদ্রা দিয়া তাহাকে খরিদ করিতে কাহারও সাধ্য হয় না, বাবা তাহাকে সহস্ররূপে ছোট করিয়াছে, কিন্তু রঙ্গন সকলই লঙ্ঘন করিল।

জীবন থামিয়া থাকে না, যে সামান্য কিশোরী, তাহারও বয়স হয়। কিন্তু একবার যে রঙ্গনকে বুকে ধরিয়াছিল, তাহার বয়স কিছুতেই বাড়িতে চাহে না, জীবন তাহার স্থির হইয়া যায়। শত অনন্য আসিয়া তাহাকে ভুলাইতে চাহে, রক্তাক্ত করিতে চাহে, নারীঅঙ্গ ছিন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু মন পায় না।

অনন্যর সহিত আমার বিচ্ছেদ হইতে সময় লাগে নাই। বিবাহ হইয়াছিল, বাঁধন কাটিয়াছি। পুরুষকে ঘৃণা করিব এমন সাহস আমার নাই, কিন্তু বুকে টানিব কী করিয়া, রঙ্গন এমনই ছিল যে, তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেও সাড়া দিত। শতরূপে শোষণ করিয়াও তাহাকে শেষ করা যাইত না, সে পূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠিত। সে ভারি লজ্জা পাইয়াছিল, বলে নাই কী সেই লজ্জা, রঙ্গন চলিয়া গিয়াছে। ময়ূরীর চেয়ারে আমি বসিয়া আছি, আর কিছু বলিতে চাহি না। রঙ্গন যদি দেখিত, এই খুনিকে সে খুন করিয়া গিয়াছে, তাহাকে ভাষা দিয়া

কথা কাড়িয়া লইয়াছে। তাহা হইলে আর একটি গল্প লেখা হইত। হয় না, ইহাই গল্প।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডাঃ অরুণপ্রকাশ মণ্ডল
